বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামি শরিয়াহ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড)

ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম

ইসলামি শরিয়াহ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড)

ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম

অনুবাদ

প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

ইসলামি শরিয়াহ্ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড)

মূল : ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম

অনুবাদ : প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

ISBN : 978-984-8471-34-0

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা - ১২৩০

ফোন : ০২-৮৯১৭৫০৯, ০২-৮৯২৪২৫৬

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com

Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর : ২০১৪

আশ্বিন : ১৪২১

জিলহজ : ১৪৩৫

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র US $ 12

Islami Shariyh : Lakkha O Uddeshsha (Volulme -I) (Al-Maqased Al-Ammah Lish Shariatil Islamiah) originally written by Dr. Yousuf Hamid Al-Alim. Translated by Professor Muhammad Mozammel Hoque. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka - 1230. Phone : 02-8917509, 02-8924256. E-mail : *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, Website : *www.iiitbd.org*, Price : BDT 250.00, US $ 12.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

অপরিচ্ছন্নতা ও পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে মানব সমাজকে নিস্কৃতি দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবন-যাপন করে ইহকালীন ও পরকালীন অনাবিল শান্তি লাভে সহায়তা দান করাই ইসলামি শরিয়াহর মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালার বিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে মানুষের জীবন পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ, সার্থক ও কল্যাণময় হতে বাধ্য। তবে ইসলামি শরিয়াহর বিধানসমূহ সঠিকভাবে জেনে সেই বিধানের ছত্রছায়ায় জীবন-যাপন করা এবং জীবন পদ্ধতি সুশৃঙ্খল করা - শরিয়াহ প্রদত্ত বিধানকে সঠিক তাৎপর্যের নিরীখে বিশ্লেষণ করার উপর নির্ভরশীল।

মুসলিম মিল্লাতের দীর্ঘ সময়ের নিস্ক্রীয়তা, বিপুল অংশের মানসিক জড়তা ও হীনমন্যতা এবং চিন্তার বৈকল্য তাদের অনেকের মনে ইসলামি শরিয়াহর গভীর তত্ত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছে। কেউ কেউ আধুনিক মানুষের প্রয়োজন পূরণ এবং তার নিত্য নতুন ও পরিবর্তিত সমস্যাবলীর সমাধান করতে ইসলামি শরিয়াহ অক্ষম বলে মনে করতে শুরু করেছেন। আবার কোনো কোনো অসচেতন লোক বলতে শুরু করেছেন যে, ইসলাম ও ইসলামি শরিয়াহর কার্যকারিতা কেবলমাত্র পারলৌকিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, ইহলৌকিক জীবনে এর তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা নেই। ইহজগতে মানব জীবনকে সুসংগঠিত করাই যে ইসলামি শরিয়াহর লক্ষ্য একথা তারা ভুলে গেছেন কিংবা ইচ্ছা করেই ভুলতে বসেছেন। আসলে এরা ইসলামি শরিয়াহর ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা, সর্বজনীনতা, পূর্ণতা ও কল্যাণকামিতা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ অথবা জেনেশুনে অজ্ঞতার ভান করে এগুলো অস্বীকার করেছেন।

এ বিষয়গুলো সামনে রেখেই ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম 'আল-মাকাসিদ আল-আম্মাহ লিস-শরিয়াহতিল ইসলামিয়াহ' শীর্ষক এ আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থটি আরবিতে পেশ করছেন। গ্রন্থটি 'ইসলামি শরিয়াহ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড)' নামে বাংলায় অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত পণ্ডিত পাবনা ইসলামিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির গবেষণার দুয়ার উন্মচিত করবে। আলেমদেরকে গবেষণা ও ইজতিহাদে উৎসাহিত করবে। এমনকি একজন সাধারণ পাঠককেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিষয়বস্তুর ওপর অভিজ্ঞতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে তাকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলবে।

পাঠকের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে বিআইআইটি কর্তৃপক্ষ সত্যিই আনন্দিত। বইটির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রয়াস কবুল করুন। আমিন॥

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

সূচি

ভূমিকা ০১
পূর্বকথা ১১
এ পদ্ধতি অবলম্বন করলাম কেন? ১৬
তথ্য সূত্রের প্রকৃতি ১৭

প্রথম আলোচ্য বিষয় ২১-৫২
বিষয় পরিচিতি, শরিয়াহ্ বিধানের সংজ্ঞা এবং শরিয়াহ্ বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বর্ণনা ২১
শরিয়াহর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ২৩
শরিয়াহর কতিপয় বিধানের মধ্যে বিরোধ সহকারে সমগ্র দ্বীনী ব্যবস্থার ঐক্য ২৬
শরিয়াহ বিধানের সংজ্ঞা ২৯
রচিত শরিয়াহ বিধানের বিভিন্ন প্রকরণ ৩১
শরিয়াহ প্রতিবন্ধক তিন প্রকারের ৩৬
সঠিক ও বাতিল ৩৬
আযীমাত ও রুখ্সাতের ক্ষেত্রে হুকুমের বিভিন্নতা ৩৮
শরিয়াহর উৎসসমূহ বা আহকাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী ৪০
প্রথম বিষয় ৪০
দ্বিতীয় বিষয় ৪২
তৃতীয় বিষয় ৪৮

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় ৫৩-৬৪
ইসলামি শরিয়াহর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ৫৩
১ম বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর ব্যাপকতা ৫৩
২য় বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর বিধানসমূহ স্থবিরতা ও নমনীয়তার মাঝামাঝি অবস্থান করে ৫৬
৩য় বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর বিধানসমূহ সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে ও কল্যাণার্থে সুবিধা প্রদান করে ৫৮
চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : দ্বীনের প্রতিবন্ধকের সাথে আচরণবিধি নির্ণয় করা ৬০
৫ম বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর উৎসকে বিকৃতি ও পরিবর্তন মুক্ত রাখা ৬১

www.pathagar.com

তৃতীয় আলোচ্য বিষয় ৬৫-৯৫
ইসলামি শরিয়াহর উৎসসমূহ অথবা বিধানাবলীর যুক্তির ভিত্তি ৬৫
প্রথম দলিল : আল কিতাব ৭১
কুরআনে বিধৃত আহকাম ৭৩
দ্বিতীয় দলিল : সুন্নাত ৭৩
সুন্নাতের প্রামাণিক ক্ষমতা ৭৫
শরিয়াহর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের মর্যাদা ৭৭
কুরআনের সাথে সুন্নাতের সম্পর্ক ৭৮
তাদের বক্তব্যের সারাংশ ৮০
তৃতীয় দলিল : ইজ্‌মা ৮১
ইজ্‌মার সম্ভাবনা ও তার অনুষ্ঠান ৮২
ইজমার প্রামাণিকতা ৮৫
চতুর্থ দলিল : কিয়াস ৮৯
কিয়াসের রূপরেখা ৯১
কিয়াসের প্রামাণিকতা ৯২

প্রথম অধ্যায় ৯৭-১০০
লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ ৯৭
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৯৭

প্রথম অনুচ্ছেদ ১০১-১৬৪
লক্ষ্যসমূহ ১০১
প্রথম বিষয় : লক্ষ্যের আভিধানিক ও শারয়ী সংজ্ঞা ১০১
লক্ষ্য ১০১
শরিয়াহ প্রণেতার আইনগত উদ্দেশ্যাবলী ১০৫
সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যাবলী ১০৫
আইনগত উদ্দেশ্যাবলী ১০৭
শরিয়াহর উদ্দেশ্যাবলী প্রমাণিত হওয়ার দলিল ১০৯
আহকামের উৎস অনুসন্ধান ১১১
প্রথমত : কুরআনভিত্তিক ১১১
দ্বিতীয়ত : সুন্নাত বা হাদিস ১১৫
তৃতীয়ত : ইজ্‌মা তথা সর্বসম্মতিক্রমে শরিয়াহ রীতিনীতির দলিল গ্রহণ করা ১১৭

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিষয় : শরিয়াহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী কাজ বাতিল ১২৪
উপরিউক্ত বক্তব্যের উদাহরণ ১৩১
উদ্দেশ্য দু'ভাগে বিভক্ত : মৌলিক ও সহায়ক ১৩৫
তৃতীয় বিষয় : মুজতাহিদের জন্য শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যসমূহের পরিচয় লাভ করার প্রয়োজনীয়তা এবং তার পন্থা ১৪২
মুজতাহিদগণ শরীয়তে পাঁচ প্রকারের সংযোজন করেন ১৪৩
শরিয়াহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায় ১৪৬
দালালাতুন নুসুস (দলিল ভিত্তিক সুস্পষ্ট নির্দেশ) দুই প্রকার ১৪৮
প্রথম পদ্ধতি : কারণভিত্তিক সুস্পষ্ট দলিল ১৪৯
দ্বিতীয় পদ্ধতি : শরিয়াহ প্রণেতার রীতি ও হস্তক্ষেপ অনুসন্ধান করা ১৫৫
তৃতীয় পদ্ধতি : শরিয়াহ বুঝার ব্যাপারে সাহাবাদের দিকদর্শন ১৬০
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে বলা হয়েছে ১৬১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ১৬৫-১৯৬
প্রথম আলোচ্য বিষয় : মাসলিহাত বা কল্যাণ ১৬৫
আহকামের কার্যকারণ ১৬৫
উপরোক্ত চার ধরনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা ১৭১
প্রথম বৈশিষ্ট ১৭৭
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ১৮৮
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ১৯১
চর্তুথ বৈশিষ্ট্য ১৯৩

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় : বিভিন্নতার আলোকে কল্যাণের প্রকারভেদ ১৯৭-২১৬
প্রথম প্রকার ১৯৭
ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর অভিমত ১৯৭
ইমাম শাতবীর র. অভিমত ১৯৯
দ্বিতীয় প্রকার : স্থায়ীত্ব ও পরিবর্তনের আলোকে কল্যাণ কামনা ২০১
তৃতীয় প্রকার : শক্তি বিশ্বের প্রয়োজনের পরিমাণ এবং গ্রহণের সামর্থরূপে কল্যাণকামিতা ২০২
আল্লামা শাতবী র. ২০৫
প্রথম প্রকার : মৌলিক লক্ষ্যসমূহ ২০৬

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকার : প্রয়োজনসমূহ ২০৮
তৃতীয় প্রকার : অনুমোদিত বা শোভনীয় ২০৯
৪র্থ প্রকার : সামষ্টিক ও আংশিকরূপে কল্যাণের প্রকারভেদ ২১৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ২১৭-২৩৬
কতিপয় প্রকার বিন্যাস সম্পর্কিত বর্ণনা ২১৭
কল্যাণের পরিবর্তনে আহ্‌কামের পরিবর্তন ২১৭
পরিবর্তনীয় অভ্যাস পাঁচ প্রকার ২২২
কল্যাণের পরিবর্তনে আহ্‌কাম পরিবর্তিত হওয়ার দলিল ২২৩
দু'টি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যায় ২৩০
কল্যাণসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং গুরুত্বের দিকে থেকে এই তারতম্যের মাপকাঠি ২৩১
গুরুত্বের দিক থেকে কল্যাণসমূহের তারতম্যের মাপকাঠি ২৩৩
অধিকার প্রয়োগে অস্পষ্টতা কিংবা অধিকারে অনিষ্টতা ২৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৩৭-২৪৪
কল্যাণের বিস্তৃত ক্ষেত্র ২৩৭
দ্বীনের কল্যাণের হেফাজত ২৩৭
প্রথম বিষয়টির আলোচনা ২৩৭
দ্বীনের আভিধানিক অর্থ ২৩৭
শরিয়াহর আলেমগণের দৃষ্টিতে দ্বীন এর সংজ্ঞা ২৩৯

দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনা ২৪৫-২৬৯
পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের তাৎপর্য ও স্বরূপ, আল্লাহ তায়ালার কাছে এটিই একমাত্র দ্বীন এবং মানুষের জন্য এর প্রয়োজন ২৪৫
পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ২৪৫
শরিয়াহ প্রয়োগের দৃষ্টিতে ২৪৬
পূর্বের আলোচনার সারবস্তু ২৫৪
মানুষের প্রয়োজন আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনের ২৫৬
দ্বীনের এখানে তিনটি অর্থ করা যায় ২৫৬
মুমিনের বিপদ মোকাবিলার প্রস্তুতি ২৬০
আলোচনার সারসংক্ষেপ ২৬৯

তৃতীয় বিষয়টির আলোচনা ২৭১-৩০৪
দ্বীনের কল্যাণ সংরক্ষণের ধনাত্মক পদ্ধতি ২৭১

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ইমান ২৭১
আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের সাথে কিভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায় ২৭২
প্রথম পথ হচ্ছে ২৭২
দ্বিতীয় পথ হচ্ছে ২৭২
বিশ্বাসের জগতে মানুষকে সত্যপথ দেখাবার কুরআনী পদ্ধতি ২৭৩
এ বিশ্বে মানুষের অবস্থান এবং তার সাথে সম্পর্ক ২৮০
মানুষের দ্বিতীয় অবস্থান ফরয ইবাদত ২৮৫
প্রথম বুনিয়াদ - সালাত ২৯০
দ্বিতীয় বুনিয়াদ - জাকাত ২৯৬
তৃতীয় বুনিয়াদ - সওম ২৯৮
চতুর্থ বুনিয়াদ - হজ ২৯৯
দ্বীনের কল্যাণের তৃতীয় অবস্থান ৩০৩

চতুর্থ বিষয়টির আলোচনা ৩০৫-৩৩৬
দ্বীনের কল্যাণ সংরক্ষণের ঋণাত্মক পদ্ধতি ৩০৫
প্রথম পদ্ধতি : জিহাদের শরিয়াহী বিধান ৩০৫
জিহাদের অর্থ ৩০৯
জিহাদ ফরজে কিফায়া ৩১১
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব হবার কারণ : কুফরী অথবা যুদ্ধবাজিতা ৩১৩
কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অধিকাংশ ফকীহর প্রমাণ সংগ্রহ ৩১৩
কাফেরদের সাথে যুদ্ধের উদ্যোক্তা ও যুদ্ধকারী ৩১৯
দ্বিতীয় পদ্ধতি : মুরতাদ ও যিনদীকদের হত্যার শরিয়াহী বিধান ৩২১
তৃতীয় পদ্ধতি : দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং বিদআতী ও যাদুকরদেরকে শাস্তি দেয়া ৩৩০
নতুন উদ্ভাবন বা বিদ'আতের কারণ ৩৩২
চতুর্থ পদ্ধতি : গুনাহকে হারাম করা এবং শরিয়াহর দণ্ডবিধি অনুযায়ী গুনাহকারীকে শাস্তি দেওয়া ৩৩৫

প্রমাণপঞ্জি ৩৩৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রভু ও মালিক। সালাত ও সালাম আমাদের নেতা শেষ নবি মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের প্রতি আর যারা তাঁর মত ও পথ অনুসরণ করে চলেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নির্দেশিত পথে চলবেন তাদের প্রতি।

কয়েক মাস আগে আন্তর্জাতিক ইসলামি গবেষণা সংস্থা- প্রাচ্যের কার্যালয় থেকে প্রফেসর আহমদ রাইসুনী লিখিত উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কিত ইমাম শাতবীর মতবাদ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে আমরা ব্যাপকভাবে পুস্তক প্রকাশ পরিকল্পনার শুভ সূচনা করি। এবার আমরা ইসলামি শরিয়াহ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নামে গ্রন্থ প্রকাশ করছি। গ্রন্থটির লেখক অধ্যাপক ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম। তিনি ছিলেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান (আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতে বুলন্দ দরজা দান করুন)। মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। সুদানে ফেরার পরে অত্যন্ত ব্যস্ততার কারণে তাঁর এ রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আলেম, ফকীহ, বিদগ্ধ জনগোষ্ঠী ও ছাত্র সমাজকে এ অমূল্য গ্রন্থটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদেরকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করতে আমরা আগ্রহী হই। গ্রন্থটির মধ্যে এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যা ইতোপূর্বে ফকীহ ও উসূলবিদগণের আলোচনায় আসেনি। অথচ বর্তমান অবস্থায় এগুলোর প্রয়োজন অনেক বেশি। যেমন শরিয়াহ ইল্‌ম লিপিবদ্ধ ও বিন্যস্ত করার সময় কিছু ইল্‌মকে প্রযুক্তিগত এবং কিছুকে বুদ্ধিগত পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। জাতিকে তার মূল ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে, আলেম সমাজকে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর চিন্তা-বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করতে, শরিয়াহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে, ইসলামি শরিয়াহর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে, সৃষ্টির কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ রোধে অন্যান্য বিধানের তুলনায় ইসলামি বিধানের অধিকতর কার্যকর হওয়া এবং আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি এবং মানুষকে একাকী ছেড়ে

www.pathagar.com

দেননি-এ শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে শরিয়াহর প্রত্যেকটি হুকুমের মধ্যে নিহিত কার্যকারণ, প্রজ্ঞা ও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সংস্থা গ্রন্থটি প্রকাশ করতে মনস্থ করে।

মুসলিম মিল্লাতের দীর্ঘ সময়ের নিস্ক্রীয়তা, বিপুল অংশের মানসিক জড়তা ও হীনমন্যতা এবং চিন্তার বৈকল্য তাদের অনেকের মনে শরিয়াহ বিধানের গভীর তত্ত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছে। বরং কেউ কেউ আধুনিক মানুষের প্রয়োজন পূরণ এবং তার নিত্য নতুন ও পরিবর্তিত সমস্যাবলীর সমাধান করতে ইসলামি শরিয়াহ অক্ষম বলে মনে করতে শুরু করেছেন। আসলে এরা ইসলামি শরিয়াহর ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা, সর্বজনীনতা, পূর্ণতা ও কল্যাণকামিতা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ অথবা জেনেশুনে অজ্ঞতার ভান করে এগুলো অস্বীকার করেছেন।

আবার কোনো কোনো অসচেতন লোক বলতে শুরু করেছেন যে, ইসলাম ও ইসলামি শরিয়াহর কার্যকারিতা কেবলমাত্র পারলৌকিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, ইহলৌকিক জীবনে এর তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা নেই। ইহজগতে মানব জীবনকে সুসংগঠিত করাই যে ইসলামি শরিয়াহর লক্ষ্য একথা তারা ভুলে গেছেন কিংবা ইচ্ছা করেই ভুলতে বসেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

> আমি আমার রসুলদেরকে পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সহ এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে[১]।

এ আয়াতে জাগতিক জীবনের কর্মতৎপরতার কথা বলা হয়েছে, আখিরাতের নয়। আখিরাত তো প্রতিদানের ক্ষেত্র, কাজের ক্ষেত্র নয়।

ইসলামি শরিয়াহ ও ইসলামি বিধান মানুষের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ ও অমঙ্গল প্রতিরোধের নিমিত্তেই প্রবর্তিত হয়েছে। অপরিচ্ছন্নতা ও পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে তাকে নিস্কৃতি দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবন-যাপন করে ইহকালীন ও পরকালীন অনাবিল শান্তি লাভে সহায়তা দান করাই শরিয়াহর বিধানের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামি বিধানকে সঠিকভাবে জানা, শরিয়াহর বিধানের ছত্রছায়ায় জীবন-

---

১ সুরা হাদীদ-২৫ আয়াত।

www.pathagar.com

যাপন করা এবং জীবন পদ্ধতি সুশৃঙ্খল করা শরিয়াহ প্রবর্তকের বিধানকে সঠিক তাৎপর্যের নিরীখে বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালার বিধানের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে মানুষের জীবন পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ, সার্থক ও কল্যাণময় হতে বাধ্য। যে ক্ষেত্রে জড় পদার্থ বিধানদাতা আল্লাহ তায়ালার নিয়মের তাৎপর্য অনুধাবন করে তাঁর মহিমা ও গুণকীর্তন করে থাকে, সে ক্ষেত্রে মানুষের জন্য তার বিধানের কল্যাণময়তা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

> এমন কোনো জিনিস নেই যে প্রশংসা সহকারে আল্লাহ তায়ালার গুণকীর্তন করে না[২]।

ইসলামি আদর্শে দীক্ষিত একজন মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তি এ কথা উপলব্ধি করে যে, এ সৃষ্টি জগতের বস্তু নিচয়ই মানুষের জীবন-যাপন ও জীবন সংজ্ঞানের প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়। বরং প্রত্যেকটি বস্তুর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে গভীর তত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও কার্যকারণ। কাজেই এগুলোর উপকারিতা, কার্যকারিতা ও অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। বরং ইসলাম পদ্ধতি, আইন-কানুন ও কার্যকারণ এবং সেগুলোর ফলাফলের সম্পৃক্ততার প্রতি বিশ্বাস এবং একক স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলির প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে এটি অভিনব ভারসাম্যের ভিত্তিতে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। আল্লাহ তায়ালাই সমস্ত পদ্ধতি ও কার্যকারণ এবং তাদের ফলাফল ও কার্যকারিতার স্রষ্টা এবং তাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি যখনই ইচ্ছা এগুলোর মধ্যে ভাঙা গড়া করতে পারেন।

এ সকল বিষয় একজন মুসলমানের মনোজগতে সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান। কারণ ও আদিকারণ, কার্যকারণ ও কারণ সূচক, অবতরণিকা ও উপসংহার ইত্যাকার বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। তিনি মহীয়ান, গরীয়ান। তিনি ইচ্ছা করলে নিয়ম-নীতির আওতায় কোনো কিছু তৈরি করতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে কারণ ছাড়াও সৃষ্টি করতে পারেন। তবে তিনি এতই মহীয়ান যে, তাঁর সৃষ্ট কোনো কিছুই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এহেন সৃষ্টি কৌশলের ফলে মানুষের আল্লাহ তায়ালার ওপর প্রমাণ পেশ করার কোনো সুযোগই থাকে না।

---

২ সূরা ইস্‌রা- ৪৪ আয়াত।

www.pathagar.com

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে প্রকাশ্য কারণ ও যুক্তিসংগত কারণ সম্বলিত বহু আয়াত গ্রন্থিত হয়েছে। এসব আয়াত শরিয়াহ প্রণেতা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। কতিপয় আয়াতে তো হুকুম, কারণ ও কার্যকারণের প্রতি সরাসরি জোর দেয়া হয়েছে। যেমন মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নির্দেশ করে বলা হয়েছে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি করিনি[৩]।

নবি-রসুল পাঠানো এবং আসমানী কিতাব কুরআন মজীদ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

আমি আমার রসুলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শন সহকারে এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মীযান, যাতে মানুষ ইনসাফ কায়েম করে[৪]।

নবি পাঠাবার বিশেষ কারণ মানবতার সংস্কার সাধন সম্পর্কে হযরত শু'আইব আলাইহিস সালামের মুখ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ

আমি কেবল সংস্কার সাধন করতে চাই, যতটুকু আমি পারি[৫]।

সৃষ্ট জীবের ওপর দলিল প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রসুলদেরকে পাঠিয়েছি, যাতে ঐ রসুলদের পরে লোকদের জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রতি অপবাদ আরোপ করার কোনো অবকাশ না থাকে[৬]।

---

৩ সুরা যারিয়াত- ৫৬ আয়াত।

৪ সুরা হাদীদ- ২৫ আয়াত।

৫ সুরা হূদ- ৮৮১ আয়াত।

৬ সুরা আন নিসা ১৬৫।

www.pathagar.com

আল্লাহর শরিয়তে এমন জিনিস খুব কমই আছে যেখানে কার্যকারণের পক্ষে নস্ (কুরআন-হাদিসের দৃষ্টান্ত বা দলিল) পেশ করা হয়নি কিংবা যা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য সতর্কীকরণ পন্থার প্রতি ইঙ্গিতবহ নয়। এর ফলে মানুষ আল্লাহ তায়ালার বিধানের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে, তার সংশোধন ও নিরাপত্তা বিধানের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং এ জন্য নিজের মন-মানসিকতাকে প্রস্তুত করতে আর সেই অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হবে।

নবি সা.-এর হাদিসে এবং তাঁর সুন্নাতে উদ্দেশ্যাবলী ও কার্যকারণগুলো সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবাগণ ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে আচার-আচরণ ও লেনদেনের ব্যাপারে প্রত্যেকটি আদেশের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। কোনো নির্দেশের বিশেষ উদ্দেশ্য জ্ঞাত না থাকলে নির্দেশটিকে সাধারণ উদ্দেশ্য ও প্রকাশ্য কারণের উপর ভিত্তি করে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

উদ্দেশ্য ও কর্মের সূক্ষ্ম পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ ধরনের ইসলামি অনুভূতি এক প্রকার বিশ্বাসের জন্ম দেয়। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিহীন কাজ নিরর্থক হয়। অনুরূপভাবে কার্যকারণ ও প্রসঙ্গবিহীন কাজের অনুষ্ঠানই সম্ভব নয়। কাজেই কাজ বাস্তবায়িত হয় সূচনা, কার্যকারণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে। অনুরূপভাবে উদ্দেশ্য ও পরিণতির ভিত্তিতে কাজের চরিত্র নির্ধারিত হয়।

মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সরাসরি কারণ এবং ইলাহী আইন-কানুনের আওতার ওপর নির্ভরশীল। আর ইলাহী কানুন জীবের অস্তিত্বের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং অস্তিত্বের পরিণাম ও পরিণতি অনুসন্ধান করে। মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা ও হায়াত-মউতের মহান সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী সুসংগঠিত জীবন-যাপন এবং নিখিল বিশ্বকে আবাদ করার মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করা এবং খিলাফতের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা জীবের অস্তিত্বের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছেন সে সময়টি এভাবেই অতিবাহিত দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্মের উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টির উপর সেই কর্মকে প্রয়োগ করার অনিবার্য কার্যকারণ জানার নামান্তরই মাত্র। এসব মৌলিক উপাদান একজন সচেতন মুসলিমের মস্তিষ্কে কয়েকটি মৌলিক অংশে বিভক্ত হয়ে ধরা দেয়।

আল্লাহ তায়ালা যে শক্তি ও সামর্থ প্রদান করেছেন সেগুলোকে পুরোপুরি ও যথাযথ ব্যবহার করলে একজন মুসলিমের বুদ্ধিবৃত্তি অবশ্যই পরিশীলিত ও কল্যাণকর হবে। সে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এ শক্তি দিয়ে কার্যকারণ যাচাই, বিভিন্ন পন্থা আয়ত্ব এবং

www.pathagar.com

নিজের কর্মের সঠিক লক্ষ্য নির্ণয় করে বাস্তবতার নিরীখে কার্যক্ষেত্রে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। কাজেই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কৌশল, কার্যকারণ, আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও পদ্ধতি একজন মুসলিমের বুদ্ধিবৃত্তির বোধগম্যতার সাথে সম্পৃক্ত। তার এই জ্ঞান অন্য মানবীয় উত্তরাধিকারীতে সঞ্চারিত হওয়ার পরও বিভক্ত হয় না এবং ভেঙ্গে পড়ে না। আর এই সঞ্চারণ প্রক্রিয়াটি এমন যা সংঘাত যন্ত্রণায় উচ্চকিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হবার পরও অপর একটি দলকে সাহায্য করার অভিপ্রায় তার সাথে লেগেই থাকে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অহেতুক প্রশ্ন করে বিষয়টিকে জটিল করা এবং বিবাদে লিপ্ত হওয়ার বাসনা তাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। তবে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে কার্যকারণের সংযোগ সম্পর্কে। অর্থাৎ কারণের প্রতিক্রিয়া কি তার নিজস্ব অথবা পরাগত? কার্যকারণের সাথে ফলাফলের সম্পর্কটা কি নিছক একটা চলমান সম্পর্ক অথবা সম্পর্কটা একান্ত অপরিহার্য? এভাবে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপনের ফলে ফকীহ ও কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একথা সবাই জানেন, মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করার নিয়ম-পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণের নাম ফিক্হ। কার্যকারণ ও কাজের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা করার প্রবণতা যখন মানুষের মধ্যে লোপ পায় অথবা কারণকে ছোট করে দেখা হয় কিংবা শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য এবং শরিয়াহর দায়িত্ব যাদের ওপর বর্তেছে তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে যায় তখন বুঝতে হবে বাস্তবে শরিয়াহ ব্যাহত হচ্ছে এবং শরিয়াহর জন্য এগুলো অশনি সংকেত। অথচ জীবনধারা সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাকার বিভিন্ন উপাদানের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যদিও এগুলোর ক্রিয়া ও প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে বিকাশমান নয়। তবে দেরিতে হলেও মানব সভ্যতার বিকাশ ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব অনস্বীকার্য।

একজন মুসলিমের মানস জগতে যখন শরিয়াহর বিধান উদ্দেশ্যবিহীন হিসেবে চিত্রিত হয় এবং সে এর সপক্ষে এ যুক্তি খাড়া করে যে, এগুলো নিছক ইবাদত সম্পর্কীয় অথবা এগুলোর উদ্দেশ্য আলোচনায় তেমন কোনো ফায়দা নেই, নিছক নিজের মতলব হাসিল করাই উদ্দেশ্য কিংবা বিধান ও উদ্দেশ্য অবিচ্ছেদ্য হবার ব্যাপারে আলোচনায় কোনো আহ্বান নেই, তখন বুঝতে হবে, মুসলিমের কর্মে ও চিন্তা-চেতনায় ধ্বস নেমেছে এবং শীঘ্রই সে অস্থিরতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার শিকার হবে।

অবশ্য এ ধরনের চিন্তা কিংবা মৃতবৎ ধ্যান-ধারণার প্রসারে সহায়করূপে কাজ করেছে ফিক্হী বিষয়ে অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে ইজতিহাদ

www.pathagar.com

কর্ম পরিচালনার প্রতি অনাসক্তি। একথাগুলো বলেছেন মালিক ইবনে নবি। তিনি আরো বলেছেন : তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণের দিকে আহ্বান করা ইজতিহাদী গবেষণামূলক কষ্টসাধ্য কর্মকাণ্ড থেকে বের করে দেয়ার নামান্তর। যার ফলে শরিয়াহর আহ্কাম কেবলমাত্র উপাসনা-আরাধনা ও ইবাদত-বন্দেগী করার অর্থেই প্রসার লাভ করে এবং এ ধারণা ইবাদতের ক্ষেত্র থেকে লেনদেন ইত্যাদির ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পরবর্তীতে অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যার ফলে একথা বলার মতো পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় যে, এটা ইবাদতমূলক বিধান, এর মধ্যে কার্যকারণ খোঁজার কোনো অবকাশ নেই এবং বিপুল সংখ্যক ফকীহগণের মধ্যে এতদসংক্রান্ত যে সকল কথার প্রচলন আছে সেগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো আলোচনাই করা যাবে না। ফলে জনগণের কাছে ইবাদতমূলক আহ্কাম আমর বা নির্দেশের রূপ পরিগ্রহ করে এবং হুকুম ও উদ্দেশ্যের কারণ সম্পর্কে জানার অব্যাহত প্রচেষ্টা থেকে অনুসন্ধিৎসু লোকটি অব্যাহতি পেয়ে যায়। এ কারণে এ কিভাবে (مقاصد الشريعة) ফিক্‌হের অন্যান্য উসূল সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করা হয়নি।

একথা সত্য, অধিকাংশ আলেম কিয়াস দলিল হওয়ার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আহ্কামের কার্যকারণ নির্ধারণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সম্পাদনের পক্ষে তারা অভিমত দিয়েছেন। তবে তাঁরা এগুলো কিয়াস অধ্যায়ের আওতায় উপস্থাপন করেছেন। কোনো কোনো উসূলবিদ এগুলো পেশ করেছেন মাসালেহ অধ্যায়ে। ইমাম গাজ্জালী রহ. (মৃত্যু ৫০৫ হিজরি, ১১১১ইং) এগুলোকে المقاصد এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। বিশেষ করে তাঁর (شفاء الغليل في بيان الشبه المخيل ومسالك التعليل) কিতাবে এগুলো আলোচনা করেছেন। ফিকহী দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা এবং আহ্কামের সাথে উদ্দেশ্যের সংযোগ থাকা জরুরি হওয়ার কথা তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সঙ্গতিপূর্ণ অথবা যথাযথ তাৎপর্য যে উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে সে কথাও তিনি বলেছেন। উদ্দেশ্য দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় প্রকারের হতে পারে। এদের প্রত্যেকে আবার অর্জিত ও স্থায়ী দু'ভাগে বিভক্ত। যেসব নির্দেশ উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন সেগুলো বিবেচ্য হিসেবে গণ্য নয়। উদ্দেশ্যের স্তরসমূহে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে এবং এগুলোর ইতিবাচক পদ্ধতি সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে।

ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর احياء علوم الدين গ্রন্থে আহ্কামের সাথে সম্পর্কিত অনেক কার্যকারণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তিনি এগুলো বর্ণনা করেছেন কোথাও সংক্ষিপ্ত আকারে আবার কোথাও ইশারা ইংগিতে। পরবর্তীকালের গবেষকগণ এগুলোর

www.pathagar.com

ভিত্তিতে তাদের গবেষণাকর্ম চালিয়ে যান। ইমাম ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম রহ. (মৃত্যু ৬৬০ হিজরি) তাঁর قواعد الكبرى কিতাবটি এরই ওপর ভিত্তি করে রচনা করেন। كشف الظنون কিতাবের লেখক গ্রন্থটির প্রশংসা করে বলেন : এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। এরপর তিনি লেখেন قواعد الصغرى নামে একটি বিরাট গ্রন্থ। বর্তমানে قواعد الاحكام في مصالح الانام নামে বইটি কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছে। তিনি কল্যাণকারিতার দিক দিয়ে সমস্ত আহকামের কার্যকারণ এ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ব্যতিক্রমগুলোর তালিকা দিয়েছেন। এই কার্যকারণগুলোর দিকে পৌঁছার পদ্ধতি কী? এগুলোর বিপরীতে কী আছে, কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? এ দুয়ের স্তর ও প্রকার কতটা এবং কী কী? আহকামের সাথে কার্যকারণকে কিভাবে সামঞ্জস্যশীল করা যায়, কারণ রহিত হলে আহকামও রহিত হয়ে যায়, ইত্যাকার বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি তাঁর এ গ্রন্থে। এ কাওয়ায়েদুল কুব্‌রা ও কাওয়ায়েদুস সুগরা গ্রন্থ দু'টি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও বিশেষ উপকারী।

অনুরূপভাবে ইমাম ইবরাহীম ইবনে মূসা আল লাখামী আল গরনাতী শাত্‌বী (মৃত ৭৯০ হিজরি) الموافقات في اصول الشريعة নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণভাবে এটিকে উদ্দেশ্যাবলী সংক্রান্ত আলোচনামূলক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে তিনি গ্রন্থটিকে শরিয়াহ প্রণেতা ও শরিয়াহ গ্রহীতা উভয়ের উদ্দেশ্যাবলীর দৃষ্টিতে কয়েকটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করেছেন। শরিয়াহ প্রণেতার লক্ষ্যগুলোকে তিনি ৪টি আলোচনার ভাগ করেছেন।

এক. প্রাথমিক পর্যায়ে শরিয়াহ প্রণয়নের দৃষ্টিতে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলী।

দুই. উপলব্ধি করার জন্য শরিয়াহ প্রণয়নের উদ্দেশ্যাবলী।

তিন. শরিয়াহ গ্রহীতার জন্য শরিয়াহ প্রণয়নের উদ্দেশ্যাবলী।

চার. আনুগত্য করার জন্য শরিয়াহ প্রণয়নের উদ্দেশ্যাবলী।

বিষয়বস্তুর সাথে আলোচ্য বিভাগগুলোর গুরুত্ব, সহজেই অনুমান করা যায়। এ কারণে আল মাওয়াফিকাত গ্রন্থটি তখন থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত উদ্দেশ্য অথবা বিরল বিষয়ের আলোচনাকারী গ্রন্থরাজির মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে আছে। নিকট অতীতের উসূলবিদগণ এর ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা

www.pathagar.com

করেননি। এমনকি শায়খ মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশূর (মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরি - ১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর مقاصد الشريعة الاسلاميه গ্রন্থে এগুলোকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি একটি বিরাট গ্রন্থ। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে এ গ্রন্থটির কথা বার বার বলতেন।

এমনিভাবে অধ্যাপক ইলাল আল-ফাসী (মৃত্যু ১৩৯৩ হি. ১৯৭৪ খ্রি.) র. এ বিষয়ের উপর مقاصد الشريعة الاسلامية و مكانتها নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থে বলা হয়েছে : শরিয়াহর বিধান মানব কল্যাণমূলক, অকল্যাণের লেশমাত্র এখানে নেই।

শরিয়াহর বিধানের কল্যাণকামিতা সম্পর্কে আরো যারা লিখেছেন তারা হচ্ছেন : ড. মুস্তফা যাইদ, তাঁর গ্রন্থের নাম হচ্ছে : المصلحة فى التشريع الاسلامى ; মুস্তফা শালাবী, তাঁর গ্রন্থের নাম : تعليل الأحكام; মুহাম্মদ সাইদ রামাদান আলবুতী, তাঁর গ্রন্থের নাম : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ; ড. হুসাইন হামেদ হাসান, তাঁর গ্রন্থের নাম : نظرية المصلحة فى الفقه الاسلامى

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান অপরিহার্য গণ্য করে। আহকাম ও আহকামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা, একজন মুসলমানের জ্ঞান আদান-প্রদানের ব্যাপারে সার্বিক শরিয়াহ বিধানের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া এবং আংশিক বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেয়া ইত্যাকার বিষয়গুলো শিক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। প্রতিষ্ঠান দেখছে মুসলমানের জ্ঞান বুদ্ধি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। আংশিক বিষয়গুলো সম্পর্কিত দৃষ্টি-ভঙ্গির বিভিন্নমুখিতা, উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া, লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, আকৃতিগত ও আক্ষরিক বিধান সম্পর্কে উদাসীনতা, সামান্য অজুহাতে ইবাদতের পদ্ধতি বদলানো, হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা অথবা বিধানের অন্বেষায় অলসতা করা এগুলো হলো সংক্রমিত রোগের ধরন।

এভাবে প্রতিষ্ঠান মনে করে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গন্তব্য ও কার্যকারণ সম্বলিত আহকাম এবং নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম মুসলমানের জ্ঞান বুদ্ধিকে উল্লেখিত সংকট মুক্ত করতে এবং অনুপ্রবেশকৃত রোগ নিরাময়ের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপত্র দিতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় মানুষের মন-মানসিকতাকে কলুষমুক্ত ও নিখুঁত বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে এবং উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করে ইজতিহাদ ও প্রশিক্ষণ দান করতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আমাদের প্রতিষ্ঠান অধ্যাপক ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিমের এ আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থটি পেশ করছে। এটির বিন্যাস করেছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আবদুল গণী মুহাম্মদ আবদুল খালেক। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যরত বর্তমান শতকের একজন খ্যাতিমান উসূলবিদ। লেখক গ্রন্থটি তৈরি করতে একাল ও সেকালের ফিক্হ, উসূল ও ইতিহাসের বহুবিধ গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সময় ব্যয় হয়েছে প্রচুর। এর ফলে গ্রন্থটি চিন্তা- গবেষণা-অন্বেষায় একজন উৎসাহী ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে বলে আমাদের ধারণা। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির গবেষণার দুয়ার খুলে যাবে। আলেমদেরকে গবেষণা ও ইজতিহাদে উৎসাহিত করবে। এমনকি একজন সাধারণ পাঠককেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিষয়বস্তুর ওপর অভিজ্ঞতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে তাকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলবে।

লেখক-গবেষক নির্বিশেষে সবাইকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, এই কামনা করছি।

জমাদিউল উখরা ১৪১২ হি.
ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রি.

ড. ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী
প্রধান পরিচালক,
আন্তর্জাতিক ইসলামি গবেষণা সংস্থা
হিরগুণ, ভার্জিনিয়া, ইউএসএ

www.pathagar.com

পূর্বকথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। তিনি মেহেরবানি করে তাঁর বান্দাদের এমন একটি শরিয়াহ্ দান করেছেন, যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তিনি বান্দাদের কুপ্রবৃত্তি ও সৎস্বভাবের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তাঁর শরিয়াহ্র বিধান অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে অনিচ্ছায় ও প্রকৃতিগতভাবে যেভাবে তারা আল্লাহ্ তায়ালার বিধানের অনুগত থাকে অনুরূপভাবে স্বেচ্ছায়ও তাঁর বিধান মেনে চলে।

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

বলে দিন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম মুসলিম[১]।

শেষ নবি ও রসুল সা., তাঁর সাহাবা রা. ও পরিবার পরিজনদের প্রতি সালাত ও সালাম। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আবেদন, তিনি যেন আমাদের কথা ও কর্মের মধ্যে সমতা দান করেন। আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করেন। আমাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পকে সুন্দর ও শক্তিশালী করেন। আমরা যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

যে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সাক্ষাত করতে চায় তাকে অবশ্যই ভালো কাজ করতে হবে এবং অবশ্যই সে তার রবের ইবাদতের মধ্যে আর কাউকে শরীক করবে না[২]।

আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে লাখো শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ দান করেছেন যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুদূর প্রসারী, বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী। বিশ্ববিদ্যালয় সরবরাহকৃত ব্যক্তিত্ব, প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

---

১ সুরা আনআম- ১৬২ আয়াত।

২ সুরা আল কাহফ- ১১৫ আয়াত।

www.pathagar.com

ও পত্র-পত্রিকা ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, তাতারী তথা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সব ধরনের হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহসী ভূমিকা পালন করে আসছে। মুসলিম মিল্লাত পাশ্চাত্যের উগ্র আধুনিকতার প্লাবনে অবগাহন করে অধঃপতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার অন্তিম লগ্নে বিশ্ববিদ্যালয় বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম যুবকগণ অজ্ঞতা ও মূর্খতার অমানিশা থেকে আলোর দিশা পেতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা জ্ঞান আহরণের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

তারা যেন দ্বীনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য এখানে আসে এবং দেশে ফিরে তাদের স্বজাতিকে ভয় দেখায় যাতে তারা ভয় পায়[৩]।

একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, মুসলমানরা ইসলামি আকীদার প্রতি বিশ্বস্ত ও ইসলামি বিধানের সার্বিক অনুসরণ ছাড়া তাদের প্রাপ্য মর্যাদায় অধিষ্টিত হতে পারেনি। যতদিন তারা ইসলামি শরিয়াহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে অনড় ছিল ততদিন তাদেরকে কোনো প্রকার দুর্বলতা, ভীরুতা, অনৈক্য ও স্থবিরতা স্পর্শ করতে পারেনি। যখন শাসক-শাসিত, প্রভূ-ভৃত্য, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জড়তা, অলসতা, হীনমন্যতা ও ভোগবিলাসে ডুবে গেলো তখনই তাদের অধঃপতন, দুর্গতি ও ভোগান্তির দরোজা খুলে গেলো। এক পর্যায়ে তারা ভুলে গেলো আল্লাহ তায়ালার এই বাণী :

وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ

মূলত তারা সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়[৪]।

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

---

[৩] সূরা তাওবাহ- ১২২ আয়াত।

[৪] সূরা আল বাকারাহ- ২১৭ আয়াত।

www.pathagar.com

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করো[৫]। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যাতে প্রভাব পড়ে আল্লাহ তায়ালার শত্রুদের ওপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর[৬]।

এভাবে মুসলমানদের দুর্জয় শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তাদের ইমানী শক্তি দুর্বলতার শিকার হয় এবং তারা পরাশক্তি ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। শত্রুরা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে মুসলমানদেরকে বঞ্চনা ও প্রতারণার ফাঁদে ফেলে নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। মুসলমানদের হীনমন্যতা, জড়তা ও বিলাসিতার সুযোগে তারা বিভিন্ন উপায় উপকরণ উদ্ভাবন করে ধর্মীয় আদর্শ থেকে তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়। এভাবে মুসলমানদের সাথে তাদের স্নায়ু যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। স্নায়ু যুদ্ধে পরাভূত করার পর দেশ জয়ের লড়াই সহজ হয়ে যায়। সুখ নিদ্রার এক পর্যায়ে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো শত্রু বাহিনীর করতলগত হয়। এ লক্ষ্যে পৌছার জন্য ইয়াহুদী খ্রিস্টানরা একযোগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

এভাবে দখলদার শত্রুরা মুসলমানদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে এবং তাদের উত্তরসূরীদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

এহেন অবস্থায় মুসলমানরা অবসাদগ্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের উগ্র আধুনিকতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ নাজুক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের কোনো পথই তারা খুঁজে পাচ্ছিল না।

এ সময় শত্রুরা মুসলিম দেশগুলো দখল করে প্রথমে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টীয় মতবাদে দীক্ষিত করার প্রয়াস চালায়। কিন্তু এতে সফল না হয়ে তাদের হৃদয় থেকে ইমান ও ইসলামি চেতনা উচ্ছেদ করার জন্য ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা, সংশয় ও হীনতা সৃষ্টি করার পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে মানবরচিত অন্যান্য

---

[৫] সুরা আল বাকারাহ- ১২০ আয়াত।

[৬] সুরা আল আনফাল- ৬০ আয়াত।

www.pathagar.com

ধর্মের সাথে তুলনা করে ইসলামি বিধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অপবাদ ও দুর্নাম রটনা করে মুসলিম যুবকদের মন মানসিকতা বিষিয়ে তোলে। তারা আরো প্রকাশ করে, প্রতিটি ধর্মই পশ্চাতগামী। ইসলাম একটি ধর্ম। ইসলামও অন্যান্য ধর্মের মতো উন্নতি, প্রগতি ও আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্তরায়। কাজেই উন্নতি, প্রগতি ও আধুনিক সভ্যতার ধারক বাহকদের এহেন ধর্ম থেকে দূরে অবস্থান করা উচিত।

ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরনের একটি ধ্বংসকর নীলনকশার মাধ্যমে তারা এগিয়ে যেতে থাকে। অথচ তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানতো যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো নয়। এ ধর্মের রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র। কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এ পথকেই তারা উপযোগী মনে করে। কাজেই ইসলামের মর্মমূলে আঘাত হেনে তারা মুসলিম সন্তানদের সামনে ইসলামের বৈশিষ্ট্যের বিকৃতি ঘটিয়ে তার একটি কদাকার ও বিভীষিকাময় রূপ তুলে ধরে। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের পর এ নীলনকশা বাস্তবায়িত হলে তাদের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে দখলদাররা তাদের সেনাবাহিনী এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক গোষ্ঠীসহ প্রস্থান করলেও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে ও ইসলামের প্রতি শত্রুতায় মুসলিম সন্তানদেরকে ব্যবহার করতে থাকে। তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠাবার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে। ইসলাম ইতর, সেকেলে, প্রগতি ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তরায় ইত্যাকার অপবাদ মুসলিম সন্তানদের মুখ্য দিয়ে বের করতে সক্ষম হয়। পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত অথবা খণ্ডিত ও বিকৃত আইনের অনুসারী কোনো হাজী, মুসল্লী বা ইসলামের ধারক-বাহকে উদাহরণস্বরূপ এদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এদের মগজ ধোলাই করতে থাকে। এভাবে মুসলিম সন্তানদেরকে ইসলামের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলে। বস্তুত মারণাস্ত্রের সাহায্যে ধ্বংস করার চাইতেও এ প্রক্রিয়া ভয়ঙ্কর। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সব দেশের ইসলাম বিদ্বেষী মহল সমভাবে এ প্রক্রিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের এ চক্রান্তমূলক কার্যক্রম চলতে থাকে।

ইসলামি বিধান কি প্রগতির অন্তরায়? যুগের অনুপযোগী? যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিতে ইসলামি বিধান অক্ষম, একথা কি সত্য? ইসলামি বিধান কোনো কল্যাণকারিতা খর্ব করেছে এবং সেই কল্যাণের পরিচয় কি? এক্ষেত্রে প্রবৃত্তির তাড়নাকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হবে অথবা শরিয়াহর নির্দেশকে? এর মধ্যে কোন্ পন্থাটি অবলম্বনে দুর্ভোগ ডেকে আনে? আজকের মুসলমানরা কেন শরিয়াহ বিধানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ? এর পরিবর্তে কেনই বা তারা মানবরচিত এমন কৃশ ও খর্বকায় বিধানের আনুগত্য করছে যা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে প্রবৃত্তির দাসানুদাসে

www.pathagar.com

পরিণত করে? শরিয়াহর অকাট্য বিধান প্রতিটি স্থান ও কালের জন্য যথার্থ নয় কি? এসব বিধান কি দ্বীন, জীবন ও জ্ঞানকে সংকুচিত করে দিয়েছে? অথবা অর্থ ও পরবর্তী বংশধরদের ক্ষেত্রে এ সবের কি কোনো ভূমিকা নেই? মানবজীবনের এ পাঁচটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে এসবের কি কোনো ভূমিকা নেই? মানবজীবনের পাঁচটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্র আছে কি?

ছাত্রাবস্থা থেকেই উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো আমার মনে তোলপাড় করতো। আমি দেখতাম কথা ও কাজের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক ভিন্নতা। এ কারণেই আমি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়া ও কানুন বিভাগে ভর্তি হই। ভর্তি হওয়ার পরপরই আমি এপথে যাত্রা শুরু করি। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ইসলামি শরিয়াহর কার্যকারিতা, যথার্থতা এবং স্থানকাল পাত্রভেদের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হওয়া সম্পর্কে আমার বিশ্বাস সুদৃঢ় ও মজবুত হতে থাকে। শরিয়াহ বিধান কেবলমাত্র জাগতিক সমস্যারই সমাধান দেয় না বরং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জটিলতারও সমাধান দিয়ে থাকে। বিশেষত শরিয়াহ বিধানের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন এবং ক্রটিসহ পণ্ডিত লোকদের স্বীকৃতি প্রদানের পর শরিয়াহ বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইসলামি বিধান অপূর্ণাঙ্গ হওয়ার অপবাদ কি সত্য? আমি যখন মাষ্টারস শ্রেণির ছাত্র তখন ইসলামের ওপর আরোপিত অপবাদগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে থাকি। গভীর পর্যবেক্ষণের পর আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, এক্ষেত্রে ইসলামের ওপর চরম জুলুম করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের আরোপিত অপবাদ থেকে ইসলামি বিধান সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। মুসলমান প্রজন্মকে অজ্ঞতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইসলামের ওপর আরোপিত অভিযোগের জন্য দায়ী মুসলমানগণ বিশেষত মুসলিম আলেম সমাজ।

এম. এ. ডিগ্রী লাভের পর ডক্টরেট করার জন্য ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হের উপর একটি অভিসন্দর্ভ নির্দিষ্ট করার নির্দেশ পাই। তখনই আমি ইসলামি শরিয়াহর উদ্দেশ্য নামের অভিসন্দর্ভ বাছাই করি। এম. এ. ক্লাসের ছাত্র থাকা অবস্থায় আমি এ বিষয়ে সব সময় চিন্তা-ভাবনা করেছি। পরবর্তীতে উক্ত শিরোনাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হই। পরিবর্তিত শিরোনামের নামকরণ করা হয় ইসলামি শরিয়াহর সাধারণ উদ্দেশ্য।

উদ্ভূত পরিস্থিতি আমাকে এ বিষয়ে অভিসন্দর্ভ নির্বাচনে বাধ্য করেছে। সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের এবং বিশেষভাবে আলেমগণের মাথার ওপর খড়গ উত্তোলন

www.pathagar.com

করা হয়েছে। তার আঘাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা এবং ইসলামি শরিয়াহকে সব রকমের অপবাদ, প্রতারণা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করাই আমার সন্দর্ভের অন্যতম লক্ষ্য।

আমার গবেষণা বিষয়ের ব্যাপকতা ও প্রসারতা থেকে এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আন্দাজ করা যাবে। কেননা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গলের দৃষ্টিতে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। আর এ মঙ্গল নিহিত আছে মানুষের সত্তায়, দ্বীনে, জ্ঞান-বুদ্ধিতে, বংশ-প্রজন্মে ও সম্পদ-সম্পত্তিতে। মানুষের জীবনকে কল্যাণময় করতে হলে এগুলোর কল্যাণ হওয়া জরুরি। তাই কল্যাণকে সুদৃঢ় ও তার সকল দিক একত্র করা এবং অপাংতেয় বিষয়গুলো বের করে দেয়ার ব্যাপারে আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি।

এ পদ্ধতি অবলম্বন করলাম কেন?

আমার অভিসন্দর্ভ লেখার যাত্রাপথে আমি পূর্ববর্তী আলেমগণের মূলনীতি পরিবেশন ও সূচনা পর্বের বর্ণনার ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রমী পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। অবশ্য আমি সূচনা পর্বের পর শরিয়াহর প্রমাণপঞ্জি ও তথ্যসূত্রের একটি চিত্র তুলে ধরেছি এবং শরিয়াহর বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করেছি। প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ নীতিগুলো সমগ্র অনুচ্ছেদের আওতায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫টি সার্বিক বিষয়ের আলোচনা করেছি। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দু'টি কারণে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। প্রথম কারণটি হচ্ছে, পূর্ববর্তী উসূলবিদগণের পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমি এ গ্রন্থে নতুনত্বের সংযোজন করতে পারতাম না। আগের জামানার চিন্তাবিদগণ সূক্ষ্ম নীতি তৈরি ও স্বীকৃত ভিত্তি রচনায় যথেষ্ট অবদান রেখেছেন এবং এর দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন। এরপরও মূলনীতি বর্ণনা করার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমরা যে বাস্তব পরিবেশে বসবাস করছি তার সাথে জড়িত আছে আমাদের দ্বীন, দ্বীনের তাৎপর্য, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তার বিভ্রান্তি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ধন-সম্পদ। এসবের ওপর শরিয়াহর বিধানের যথাযথ প্রয়োগই আমার উদ্দেশ্য। ফলে প্রক্রিয়া ভিন্ন করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

তথ্য সূত্রের প্রকৃতি

বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও প্রসারতার কারণে সর্বজন স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী আমি বিভিন্ন তথ্য সূত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। আমার তথ্যের মূল উৎস হলো উসূল ও মাকাসিদের গ্রন্থরাজী। প্রক্রিয়ার ব্যাপারে আমি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তা বিষয়বস্তুর সীমিত কথাবার্তার আলোকে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য উসূল বিষয়ক গ্রন্থরাজি জরুরি কল্যাণ সংরক্ষণে অধিকতর সহায়ক। এ কারণে জরুরি কল্যাণগুলো সংক্ষেপে প্রদর্শিত হয়েছে। তবে ইব্‌নে আবদুস সালাম, শাতবী প্রমুখ যারা মাকাসিদ (উদ্দেশ্যাবলী) ও মাসালিহ (কল্যাণ) সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরা যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা অনুসারে সবিস্তারে লিখেছেন। কিন্তু তাতেও আমার গবেষণা কর্মে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। কেননা যে বিশ্ব পরিক্রমায় আমি বসবাস করছি তা প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। কাজেই আমি ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদিসের কতিপয় গ্রন্থ থেকে সূত্র নিতে বাধ্য হয়েছি। রাজনীতি, অর্থনীতি, আকীদা, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের বই থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদ্দেশ্য সম্পর্কে চরমভাবাপন্ন লেখকদের নিজস্ব মতামতের ব্যাপারেও আমি ইঙ্গিত দিয়েছি।

এ গ্রন্থের জন্য আমি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি নিবন্ধের বিশদ আলোচনা ও গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে সম্মানিত পাঠকদেরকে এর বিন্যাস ও সারবত্তার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করতে চাই।

সূচনা পর্ব, দু'টি অধ্যায় ও উপসংহার এভাবে আমার প্রবন্ধটির বিন্যাস করেছি। সূচনা পর্বে আমি শরিয়াহর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করেছি। শরিয়াহ হুকুম এবং তার প্রকারভেদের কথাও সংক্ষেপে বলেছি। ইসলামি শরিয়াহর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণও রয়েছে এগুলোতে। এর তথ্যসূত্রগুলো হলোঃ কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। সূচনা দিয়েই আমার নিবন্ধ শুরু করেছি। সূচনায় আছে পাঠকের জন্য শরিয়াহর একটি স্বচ্ছ চিত্র, তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তথ্যবহুল প্রমাণপঞ্জী। কেননা কোনো কিছুর ওপর নির্দেশ জারী নির্দেশেরই শাখা বিশেষ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহের শিক্ষা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছি। দুটি অনুচ্ছেদের আওতায় এগুলো বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে আছে : উদ্দেশ্যের অর্থের বিবরণ, শরিয়াহভিত্তিক লক্ষ্যসমূহের প্রমাণ, শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী কাজ বাতিল হওয়া, উদ্দেশ্যের যৌগিক ও মৌলিক দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া এবং গবেষকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার বিবরণ। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে :

www.pathagar.com

কল্যাণের পরিচয়, শরিয়াহভিত্তিক কল্যাণের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্নতা অনুসারে কল্যাণের বিভক্তি এবং ঐতিহ্যগতভাবে অন্যান্য বিভিন্নতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কল্যাণের বিস্তারিত বিবরণ আছে। পাঁচটি কল্যাণমূলক বিষয়ের ভিত্তিতে এগুলোকে পাঁচটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো : দ্বীন, জীবন, বংশ, জ্ঞান ও সম্পদ সংরক্ষণ করা। দ্বীনের কল্যাণ সংরক্ষণের অনুচ্ছেদে দ্বীনের অর্থ সবিস্তারে পেশ করেছি। দ্বীনের হেফাজতের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীন এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে দু'ভাবে বর্ণনা করেছি। যেমন- ইমান, ইবাদত, জিহাদ, বিদআত উৎখাত এবং মুরতাদ ও যিন্দীকদের হত্যা করা। নফস বা জীবন সংরক্ষণ অনুচ্ছেদে আমি একথা আলোচনা করেছি যে, মানুষকে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে নিরাপত্তামূলক আহকামের ওপর সুদৃঢ় থাকার জন্য শরিয়াহ প্রণেতা ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধান প্রবর্তন করেছেন।

জ্ঞান সংরক্ষণ অনুচ্ছেদে জ্ঞানের অর্থ এবং জ্ঞানের সাথে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ওহির সম্পর্ক বর্ণনা করেছি। এ অনুচ্ছেদটিকে অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীন অনুসারে দুটি ভাগে ভাগ করেছি। যেমন শিক্ষা গ্রহণ ওয়াজিব হওয়া, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা, নেশাকর দ্রব্য হারাম হওয়া, মদপানে বিধিবদ্ধ দন্ড দেয়া।

বংশ সংরক্ষণ অনুচ্ছেদে বৈবাহিক সূত্র প্রতিষ্ঠার বৈধতা আলোচনা করেছি। বৈবাহিক সূত্রে বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়া প্রথম মানব থেকেই স্বীকৃত। বংশ সংরক্ষণের দু'টি উদ্দেশ্য। একটি মৌলিক এবং অন্যটি যৌগিক। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সন্তানদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সঙ্গে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এ প্রক্রিয়ায় ব্যভিচার, অবৈধ যৌনাচার ও কামোদ্দীপক কাজ হারাম করে দিয়েছেন। হারাম কাজের পরিণতিও বর্ণনা করেছি।

ধন-সম্পদ সংরক্ষণ অনুচ্ছেদে সম্পদের অর্থ, সম্পদ আহরণের উৎস, স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা, ব্যয় করা এবং প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্য সমগ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে একটি আবর্তনের চেতনা সৃষ্টি করা। এ কারণে আমি সম্পদের মালিকানা এবং মালিকানার আবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করেছি। সম্পদ আহরণের জন্য ইসলাম যে উপকরণসমূহ উদ্ভাবন করেছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনিময় সহজ করা এবং পৃষ্ঠপোশকতার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তার উদ্দেশ্য শরিয়াহকে সমুন্নত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা।

www.pathagar.com

নিবন্ধের শেষাংশে আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর বর্ণনা দিয়েছি। সেগুলো হচ্ছে :

১. মুসলিম সন্তানদের মনে দ্বীন সম্পর্কে খারাপ ধারণা প্রদান। দ্বীনের আমল থেকে ইমানকে এবং কাজ থেকে কথাকে আলাদা করা।

২. বুদ্ধির সাথে পঞ্চেন্দ্রিয় ও ওহির সম্পৃক্ততা উপলব্ধির উপকরণগুলোকে আমি তিনটি আবর্তে বিন্যস্ত করেছি। এর সূচনায় আছে পঞ্চেন্দ্রিয় এবং সমাপ্তিতে আছে ওহি। আর মাঝখানে আছে বুদ্ধি। প্রতিটি আবর্তের আছে পরিধি এবং ক্ষেত্র। এ পরিসরেই সে বিচরণ করে। পরিসরের সীমা অতিক্রম করে না। কোনো প্রকার সংঘর্ষ ও প্রতিরোধ ছাড়াই একে অন্যকে সাহায্য করে থাকে। এসব আবর্তের সীমা কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যখন খারাপ ধারণা জন্মে তখন এ ধারণার ভিত্তিতে বিশ্বাস, চিন্তা ও আচরণে বিপর্যয় দেখা দেয়। পৃথিবীর বর্তমান ও অতীতের যাবতীয় বিপর্যয়ের উৎস এখানেই। এসব আবর্তন এবং এগুলোর সম্পৃক্ততার সীমা সম্পর্কে খারাপ ধারণা মুসলমান প্রজন্মকে প্রত্যক্ষভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

৩. সম্পদের মুনাফার প্রচলন ও আবর্তন। প্রচলন ও আবর্তনকে কার্যকরী করার জন্য ইসলামে একটি স্বীকৃত নীতি গৃহীত হয়েছে। এ নীতি যেকোনো অর্থনৈতিক উপায় ও আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে উত্তম।

পরিশেষে, আমি একথা দাবী করছি না যে, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। তবে সঠিক পন্থায় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। যদি পৌঁছে থাকি তাহলে সেটা আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানী। অন্যথায় এটাকে মানুষ হিসেবে আমার ভুল মনে করতে হবে। কারণ মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আর খুব কম লেখক ও গ্রন্থকারই ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

আল্লাহ তায়ালার দরবারে মিনতি জানাই, তিনি যেন আমাকে ইসলাম ও আন্তরিকতার পোশাকে আচ্ছাদিত করেন এবং আমার এ গ্রন্থকে কবূলিয়াতের অলঙ্কার পরিয়ে দেন। তিনিই উত্তম দু'আ কবূলকারী এবং সর্বোত্তম প্রত্যাশা তাঁরই কাছে।

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে দয়া ও নিয়ামত দান করেছো সে জন্য আমাকে তোমার শুকরিয়া আদায় করার তওফীক দান করো। আর আমাকে তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য নেক আমল করার শক্তি দান করো এবং আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সংশোধন করার তওফীক দাও। আমি তোমার কাছে তওবা করছি এবং আমি তোমাতে সমর্পিত একজন মুসলিম।

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা (পার্ট - ১)

ক. অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসন

এম. উমর চাপড়া *পিএইচডি*	
ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	২৫০/-
ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৬০/-
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে : অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ	৩০০/-
প্রফেসর খুরশিদ আহমদ	
উন্নয়ন ও ইসলাম	৩৫/-
এম আকরাম খান এবং এম রকিবুজ জামান	
ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ	৭০/-
এম. রুহুল আমিন অনূদিত	
ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা - সামাজিক প্রেক্ষাপট	১০০/-
কাজী মোরতুজা আলী	
ইসলামি জীবন বীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত	১৭৫/-
মাহমুদ আহমদ *পিএইচডি*	
ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ	৬০/-
রফিক ইসা বীকুন	
ইসলামি ব্যবসায় নৈতিকতা	১০০/-
প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান	
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা	২০০/-
Prof. M. Raihan Sharif	
Guidelines to Islamic Economics : Nature, Concept and Principles	২৫০/-
M. Zohurul Islam *FCA*	
Accounting Philosophy Ethics and Principles: The Islamic Perspective	২০০/-
Al-Zakah : A Hand book of Zakah Administration	২০০/-
An Analysis of the Development of Socio-Economic Development	১০০/-
M. Kabir Hasan *PhD*	
On Openness, Integration and Economic Growth	২০০/-
Globalization and the Muslim World	৪০০/-
M. Azizul Huq	
Profits Payout to Mudaraba Depositors (Bangladesh Perspective)	১০০/-
Masudul Alam Chowdhury	
A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islamic Countries	৩০০/-
Professor Dr. Muhammad Luqman (Edited)	
Islamic Management: Islamic Perspective	২০০/-
Md. Golam Mohiuddin *PhD* **& Afroza Bulbul**	
Islamization and Standardization of Knowledge...	১৩০/-

www.pathagar.com

প্রথম আলোচ্য বিষয়

বিষয় পরিচিতি, শরিয়াহ্ বিধানের সংজ্ঞা এবং শরিয়াহ বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বর্ণনা

আল্লাহ তায়ালা জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। তাদের নিকট রসুল পাঠিয়েছেন একের পর এক, বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন যুগে। এভাবে রসুল পাঠাবার পর তাদের আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁদের সাথে কিতাবও নাযিল করেছেন মানুষকে ভুল পথ থেকে ঠিক পথে এবং অন্ধকার থেকে আলোকের মধ্যে আনার জন্য। মানুষের কাছে ওহি পাঠাবার জন্য তাদের মধ্য থেকে রসুল সা.-কে বাছাই করে নিয়েছেন। এ ওহি তাঁর অন্তর্দেশ ও বহির্দেশকে আলোকোদ্ভাসিত করেছে। ওহি-ই হচ্ছে পথ প্রদর্শনকারী এবং প্রধান পথ প্রদর্শক।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি ওহি প্রেরণ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ইমান কি। কিন্তু আমি তাকে করেছি আলো, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ দেখাই[১৩]।

ফলে কুরআনই তাঁর সমগ্র জীবন-চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেছেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত[১৪]।

কারণ তিনি ওহির নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছেন। ফলে তাঁর জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড সেই অনুযায়ী ঢালাই হয়েছে। এভাবে ওহি হয়ে গেছে তাঁর পরিচালক।

---

[১৩] সুরা শুরা- ৫২ আয়াত।

[১৪] সুরা কলাম- ৪ আয়াত।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সা. ছিলেন আল্লাহ তায়ালার ওহির হুকুমের প্রবক্তা, তার অনুগত এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যই ছিল তাঁর প্রতি আরোপিত সত্যের সপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ যখনই তাঁর প্রতি হুকুম এসেছে, তিনি তা পালন করেছেন। যখনই কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তিনি তা বর্জন করেছেন। যখনই ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, তিনি সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক ভীত হয়েছেন। মোটকথা, তিনি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত শরিয়াহকে নিজের শাসকে পরিণত করেন এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী সত্য সঠিক পথ পাড়ি দেন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁর আল্লাহ তায়ালার প্রতি আত্মসমর্পন ও বন্দেগীর প্রশংসা করে তাঁকে তাঁর সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি শরিয়াহ সমগ্র মানবজাতির ওপর কর্তৃত্বশালী হয়। তাদের জন্য হয় আলোর দিশা। এ আলোয় তারা এগিয়ে চলে সত্যের পথে। যখন তারা নিছক মানবিক বুদ্ধিবৃত্তি ও জাতীয় মর্যাদার ভিত্তিতে নয় বরং শরিয়াহর বিধানসমূহ মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী কথায়, কর্মে ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলে তখন জীবন হয় মর্যাদাশালী। কারণ আল্লাহ তায়ালা মর্যাদাকে সম্পৃক্ত করেছেন তাকওয়ার সাথে, অন্য কিছুর সাথে নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

> অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই বেশি মর্যাদাশালী যে বেশি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে[১৫]।

কাজেই মানুষের মধ্যে শরিয়াহর সর্বাধিক আনুগত্য করে তার সংরক্ষণকারী ব্যক্তিই সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। অন্যথায় তার উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া সুদূর পরাহত।

কাজেই শরিয়াহর কর্তৃত্ব বেশি করে মেনে নেয়ার ওপরই মানুষের মর্যাদা নির্ভরশীল। আর ইসলামের শরিয়াহ হচ্ছে আল্লাহর শরিয়াহ, যা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী এবং অন্য সকল শরিয়াহ বাতিলকারী ও তাদের ওপর বিজয় লাভকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করে এ শরিয়াহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের অনাবিল সুখ ও শান্তিতে ভরে দেয়। যে

---

[১৫] সুরা হুজুরাত- ১৩ আয়াত।

www.pathagar.com

ব্যক্তি এ পথে চলে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। আর যে ব্যক্তি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবন-যাপন হবে সঙ্কুচিত এবং কিয়ামতের দিন সে উত্থিত হবে অন্ধ অবস্থায়, আপাত দৃষ্টিতে তাকে যতই সুখী ও সততার অধিকারী দেখা যাক না কেন। কাজেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান এবং কথায় ও কর্মে তাঁর শরিয়াহর আনুগত্যই পবিত্র ও শান্তিময় জীবনের ধারক।

শরিয়াহর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

শরিয়াহর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, এমন একটি প্রকাশ্য পথ যে পথে পানির কাছে পৌঁছানো যায় এবং এমন একটি পানির ঝর্ণা যেটা মানুষ তৈরি করেছে। অর্থাৎ সে পানি তাদের দিকে নেমে আসে এবং তারা তা থেকে পান করে এবং পরিতৃপ্ত হয়। আরবরা এ স্থানটিকে ততক্ষণ শরিয়াহ্ বলে না যতক্ষণ না তা অবিরত ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে

এবং প্রকাশ্য ও নির্দিষ্ট থাকে, রশি দিয়ে বাল্‌তি নামিয়ে তা থেকে পান করতে হয় না। শরিয়াহ শব্দটি গৃহীত হয়েছে তাশ্‌রী থেকে। এ হচ্ছে উটের রীতি বর্ণনা করা অর্থাৎ উট হাউজে পানি পান করে না এবং পানি বের করে এনে দৃঢ়ভাবে তার সামনে ধরতে হবে তবে যে সে পান করবে, এরও সে মুখাপেক্ষী নয়। কথায় বলে, তাশ্‌রী হচ্ছে সহজে পানি পান করা।

শরিয়াহর পারিভার্ষিক অর্থ হচ্ছে, কার্যকর অনুশাসন ও বিধি। সম্ভবত শরিয়াহ বিশারদগণ এটি গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী থেকে :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি তৈরি করেছি শরিয়াহ্ ও পথ[১৬]।

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ

তারপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি শরিয়াহর বিশেষ বিধানের ওপর[১৭]।

কাতাদাহ রহ. বলেন : শরিয়াহ হচ্ছে, আদেশ-নিষেধ এবং হুদূদ (শাস্তি) ও ফরয সংক্রান্ত বিধান। কারণ শরিয়াহ একটি পথ, যা সত্যের দিকে চলে[১৮]।

---

[১৬] সুরা আল মায়েদাহ- ৪৮ আয়াত।

[১৭] সুরা আল জাছিয়া- ১৮ আয়াত।

www.pathagar.com

ইবনে কাসীর তাঁর নিহায়াহ গ্রন্থে বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের মধ্য থেকে যা কিছু তাঁর বান্দাদের জন্য প্রচলন করেছেন এবং তাদের জন্য অবশ্য পালনীয় করেছেন তাই হচ্ছে শরিয়াহ। বলা হয়ে থাকে : তাদের জন্য শরিয়াহ (বিধিবদ্ধ) করা হয়েছে, কাজেই বিধিবদ্ধকারী হিসেবে তিনি শারে। আর আল্লাহ তায়ালা দ্বীন বিধিবদ্ধ করেছেন শরিয়াহ হিসেবে তিনি তাকে প্রকাশ করেছেন ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন[১৯]।

এর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি : শরিয়াহ বলতে দ্বীন বুঝায়, যা রসুলগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে এনেছেন মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করার জন্য আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করার জন্য আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে। আর এ অর্থেই শরিয়াহ শব্দটি বিশ্বাস ও কর্ম উভয় দিকেই প্রসারিত। এ দুটিই সম্মিলিতভাবে দ্বীনে কামেল তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তবে ফকীহগণের ভাষায় শরিয়াহ কেবল ব্যবহারিক বিধিবিধানকেই বুঝায়।

কেউ কেউ এর সংজ্ঞা এভাবে নির্দেশ করেছেন[২০]: শরিয়াহ এমন বিধি বিধানকে বুঝায়, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য প্রচলন করেছেন, যাকে জীবনে কার্যকর করে তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হতে পারে। আর আল্লাহ তায়ালা দ্বীন প্রচলন করেছেন অর্থাৎ তা প্রণয়ন করেছেন। এটি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে নাযিল হয়েছে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحا

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে[২১]।

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারোর শরিয়াহ প্রণয়ন করার অধিকার নেই। এ আয়াতটি একথা প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য দ্বীনের বিধান প্রণয়ন করা এবং

---

[১৮] তাফসির আত্‌তাবারী : খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ৮৮, হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৬ আল কুরতুবী : খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১৬৩। ফখরুর রাযী : খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৩২, আল আলসূ : খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৩৫।

[১৯] আল নিহায়া, ইবনুল আছীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬১ ।

[২০] তারীখুত তাশরীইল ইসলামি, শায়খ আবদুর রহমান তাজ ও শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্ সাইস, পৃষ্ঠা ৮-৯। তাফসীর আল মানার, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪১৪। তারিখ আত্‌তাশরী আল ইসলামি ইসলামি, উস্তাদ আশ্‌শাহাবী, পৃষ্ঠা ৬ ।

[২১] সুরা আশ শূরা- ১৩ আয়াত।

www.pathagar.com

তাকে শরিয়াহ নামে অভিহিত করা মূলত শরিয়াহ শব্দটির ধাতুগত অর্থই প্রকাশ করেছে। আমাদের আলোচ্য অবশ্য এখন এটা নয়। কারণ আমরা শরিয়াহ বলতে বুঝাতে চাচ্ছি যথাযথ বৈধ বিধানসমূহ।

ফকীহগণ শরিয়াহ শব্দের এ অর্থই করেন। এক্ষেত্রে তাহলে শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে কী সম্পর্ক থাকে?

ইতোপূর্বে আমরা বলেছি, শরিয়াহর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, পানির উৎস বা এমন পথ যা পানির কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। আর পারিভাষিক অর্থে এটি হচ্ছে মানুষকে পথ দেখাবার জন্য বিধিবদ্ধ আইন। এ থেকে আমরা জানতে পারি, এ দু'য়ের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনকারী হচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রে সুবিধা অর্জন করা যেমন তাফসিরে আবু দাউদে বলা হয়েছে : আইন ও শরিয়াহ হচ্ছে পানির কাছে পৌঁছনোর পথ। দ্বীনকে তার সাথে তুলনা করা যায়। কারণ দ্বীন হচ্ছে একটি পথ, যার সাহায্যে চিরন্তন জীবনের পথে পাড়ি জমানো যায়, যেমন পানির সাহায্যে আমরা এ অস্থায়ী জীবনে উপকৃত হই[২২]।

বলা হয়, দ্বীন হচ্ছে কর্মজীবনের একটি পথ যা কর্মীকে আভ্যন্তরীণ ময়লা ও আবর্জনা মুক্ত করে। তেমন শরিয়াহ পানির কাছে যাবার একটি পথ, যা তার পথিককে ইন্দ্রিয়াসক্তির নোংরামি থেকে পবিত্র করে[২৩]।

মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন গ্রন্থের লেখক আল্লামা রাগেব ইস্‌পাহানী রহ. বলেন : পানির শরিয়াহ বা পথের সাথে তুলনা করে শরিয়াহকে শরিয়াহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ পানিতে যে অবগাহন করে যথার্থভাবে সে মলিনতামুক্ত ও পবিত্র হয়। কোনো কোনো দার্শনিক বলেন: আমি পান করেছিলাম কিন্তু আমার তৃষ্ণা প্রশমিত হয়নি। তারপর যখন আমি আল্লাহ তায়ালাকে চিনলাম তখন পান ছাড়াই আমার তৃষ্ণা প্রশমিত হলো। আর পবিত্র করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

আল্লাহ তায়ালা তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে হে নবি পরিবার! এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান[২৪]।

---

[২২] তাফসীর আবিস সাউদ হামিশ আলফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৮ ।

[২৩] আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃষ্ঠা ২৫৯ ।

[২৪] সুরা আহযাব, ৩৩ আয়াত।

www.pathagar.com

কাজেই পানির শরিয়াহ বা পথে রয়েছে দেহের জীবন। অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালার শরীয়তে রয়েছে আত্মার জীবন ও বিবেকের পবিত্রতা এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবনে মানুষের সাফল্য।

শরিয়াহ ও তাশ্‌রী-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ শাব্দিক অর্থে শরিয়াহ বলা যায় সেই স্থানকে যেখানে পানি পান করা হয়। আবার তাশরী বলা হয় উটের আচরণ বর্ণনা করাকে[২৫]। অন্যদিকে ফকীহগণের পরিভাষায় তাশরী শব্দটির দু'টি অর্থ বর্ণনা করা হয়। এক, প্রাথমিক আইন কানুন রচনা করা। ইসলামে এটি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অধিকারভুক্ত। দুই, প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ থেকে বিধান গ্রহণ করা। তার কোনো নস থেকে এটা গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা তার উপস্থাপিত কোনো যুক্তি-প্রমাণ থেকে কিংবা তার কোনো মূলনীতি, প্রাণশক্তি ও তাৎপর্য থেকে। তাশর-এর উভয় অর্থই মূল আশ্রিত। কিন্তু ইসলামে প্রথম অর্থেই তাশ্‌রী-এর প্রচলন শুরু হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া মূলত আইন প্রণয়নের অধিকার আর কারোর নেই। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ বা মূলগত নয়। কারণ, বিধানের মধ্যে যে হুকুমটি গুপ্ত থাকে উদ্ভাবনকারী তা থেকেই উদ্ভাবন করে থাকেন, তিনি কোনো নতুন হুকুম তৈরি করেন না।

তাশ্‌রী-এর দ্বিতীয় অর্থটি অর্থাৎ আইন ও বিধান রচনা করা ইজতিহাদের সমার্থক। এ ইজতিহাদ হচ্ছে, শরিয়াহ উপস্থাপিত প্রমাণসমূহের কোনো একটির ভিত্তিতে শরিয়াহর বিধান নির্মাণ করার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো।

আর শরিয়াহ বলতে আমরা যে কথাটি বুঝাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে, এমন সব শরিয়াহ বিধান যেগুলো নসের মাধ্যমে বা নস্‌ থেকে উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যয় বা ধারণাদীপ্ত বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার হুকুম থেকে শরিয়াহ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শরিয়াহর কতিপয় বিধানের মধ্যে বিরোধ সহকারে সমগ্র দ্বীনী ব্যবস্থার ঐক্য

কুরআনের কতিপয় আয়াতে নবি ও রসুলগণের অভিন্ন পথের কথা বলা হয়েছে। আবার কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে তাদের ভিন্নতার কথা। এ আয়াতগুলোকে আমরা সামঞ্জস্যশীল করবো কিভাবে?

---

[২৫] তারিখ আত্‌তাশরী আল ইসলামি, শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব খাল্লাফ, পৃষ্ঠা ১৭৯। তারিখ আত্‌ তাশরী আল ইসলামি, শায়খ আবদুর রহমান তাজ ও শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্‌সাইস, পৃষ্ঠা ৮-৯ । তারীখ আত্‌তাশরী, আলউস্তাদ আশ্‌শাহাবী, পৃষ্ঠা ৬ ।

www.pathagar.com

যেমন প্রথম ধরনের বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে :

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো। তার মধ্যে মতভেদ করো না[২৬]।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন :

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

তাদেরকেই আল্লাহ্ তায়ালা সৎ পথে পরিচালিত করেছিলেন, কাজেই তাদের পথ অনুসরণ করো[২৭]।

আবার দ্বিতীয় ধরনের আয়াতে বলা হয়েছে :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়াহ্ ও স্পষ্ট পথ তৈরি করে দিয়েছি[২৮]।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

তারপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের ওপর, কাজেই তুমি তার অনুসরণ করো[২৯]।

এ উভয় ধরনের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি হচ্ছে : যেমন বলা হয়, প্রথম ধরনের আয়াতগুলো দ্বীনের মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত এবং দ্বিতীয় ধরনের আয়াতগুলো দ্বীনের শাখা-প্রশাখার সাথে সংশ্লিষ্ট। ইমাম কুরতুবী বলেন : দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো।-এ বিষয়টি হচ্ছে : আল্লাহ্ তায়ালার একত্বে বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর রসুলগণ ও কিতাবের প্রতি পরকালের প্রতি এবং এক ব্যক্তির মুসলমান থাকার জন্য যা কিছুর প্রয়োজন সে সবের প্রতি ইমান রাখা এবং মুসলিম উম্মতের কল্যাণার্থে নিবেদিত শরিয়াহ্কে প্রত্যাখ্যান না করা। শরিয়াহ্ বিভিন্ন এবং তাদের মধ্যে দূরত্বও রয়েছে[৩০]।

---

[২৬] আশ্ শূরা, ১৩ আয়াত।

[২৭] সুরা আল আনআম, ৯০ আয়াত।

[২৮] সুরা আল মায়েদাহ, ৪৮ আয়াত।

[২৯] সুরা আল জাসিয়া, ১৮ আয়াত।

[৩০] আল কুরতুবী, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১০-১১।

www.pathagar.com

এর অর্থ হচ্ছে : হে মুহাম্মদ ও নূহ! তোমাদের আমি একই দ্বীন তথা জীবনবিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছি। অর্থাৎ তোমাদের এমন মূলনীতি মেনে চলতে হবে যার শরিয়াহ বিভিন্ন হবে না। সেই শরিয়াহ হচ্ছে: তওহীদ, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, সৎকর্মশীলতা সহকারে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য, সত্যবাদিতা, অঙ্গীকার পালন, আমানতদারী, আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার, কুফরী না করা, হত্যা না করা, যিনা না করা, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকে কষ্ট না দেয়া, অযথা অর্থ ব্যয় না করা, জীবের প্রতি অত্যাচার না করা, হীনতাকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং সৌজন্যবোধ খতম না করা। এসবগুলোই একটি দ্বীন ও ঐক্যবদ্ধ মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত বিধিবদ্ধ বিধান। নবিদের সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ আছে কিন্তু তাদের এই একীভূত পদ্ধতির ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই[৩১]।

এরপর বাহ্যিক শারীরিক কাঠামোর ন্যায় শরিয়াহ বিভিন্ন হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার বিধৃত কল্যাণ এবং বিভিন্ন যুগের উম্মতের জন্য কর্ম কৌশল। মুজাহিদ রহ. বলেন : আল্লাহ তায়ালা যত নবি পাঠিয়েছেন প্রত্যেককেই হুকুম দিয়েছেন নামায কায়েম করার, যাকাত দেবার এবং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের অঙ্গীকার করার। এ দ্বীনই আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য রচনা করেছেন[৩২]।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, শরিয়াহ দুই প্রকারের। তার মধ্যে এক প্রকার শরিয়াহ অপরিবর্তনীয়। তার কোনো বিধান রহিত হয় না। বরং একে অপরিবর্তনীয় রাখাই অপরিহার্য। সমস্ত নবির দ্বীন ও শরিয়াহর মধ্যে এর এ অবস্থান চির নির্ধারিত। আবার দ্বিতীয় প্রকারের শরিয়াহটি বিভিন্ন নবির দ্বীন ও শরিয়াহর ভিত্তিতে বিভিন্ন। দ্বিতীয় প্রকারের শরিয়াহটির তুলনায় প্রথম প্রকারের শরিয়াহটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কারণ দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবার জন্য প্রথম ধরনের শরিয়াহর ভিত্তিতে সময়ের সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে[৩৩]।

কাজেই নবিগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে মূলত একই জিনিস এনেছেন। তার মধ্য থেকে স্থায়ী কল্যাণের সাথে জড়িত বিষয়গুলো স্থান কালের পরিবর্তনে নমনীয় হয়ে যায় না। যেমন : ইমান, নামায, ন্যায়বিচার, সত্যবাদিতা এবং কুফরী, জুলম ও মিথ্যাচারের হারাম হওয়া ইত্যাদির অপরিহার্য কর্তব্য হওয়া যেমন ইতোপূর্বে

---

[৩১] আল কুরতুবী, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১১ এবং হাশিয়াতুল জামাল আলাল জালালাইন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৫

[৩২] কুরতুবী, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১১ এবং হাশিয়াতুল জামাল, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৫ ।

[৩৩] তাফসীর ফখরুর রাযী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৬৮।

www.pathagar.com

আলোচিত হয়েছে। আবার এর মধ্যে এমন কল্যাণকর বিষয় আছে যা স্থান-কাল-পাত্রের বিভিন্নতায় ও অবস্থার পরিবর্তনে নমনীয় হয়ে যায়। এই কল্যাণকর বিষয়গুলো এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তার মধ্যে পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে। নাসেখ মানসূখের ক্ষেত্রে উসূলবিদগণ এ সম্পর্কে সম্যক অবগত। কাজেই দ্বীনের মূলে রয়েছে ঐক্য ও এককতা। শরিয়াহ তথা আইন-কানুন ও পথ-পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক[৩৪]।

ইবনে কাইয়িম[৩৫] বলেন : সমস্ত শরিয়াহ যদিও বিভিন্ন কিন্তু তাদের সবার মূলনীতি এক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৌন্দর্যের দিক দিয়েও তারা একীভূত। যদি তারা অন্যরকম হতো, তাহলে হয়ে পড়তো জ্ঞান, কল্যাণ ও রহমত শূন্য[৩৬]।

শরিয়াহ বিধানের সংজ্ঞা

আগেই বলা হয়েছে, শরিয়াহর অর্থ হচ্ছে বিধিবদ্ধ অনুশাসন। শরিয়াহর এ অর্থ নির্ধারিত হবার পর আমরা উসূলবিদগণের দৃষ্টিতে শরিয়াহ তথা বিধিবদ্ধ অনুশাসনের তাৎপর্য বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। একই সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত শরিয়াহ ও রচিত শরিয়াহ (Positive law) এ দুই প্রকার শরিয়াহ এবং এদের শ্রেণি বিভাগেরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

উসূলবিদগণ বলেন : আল্লাহ তায়ালা যেসব কাজ করার জন্য মানুষকে সম্বোধন করেছেন সেগুলো ফরয, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা অথবা বাড়তি লাভ হিসেবে গণ্য[৩৭]।

এ সম্বোধন হলো আসলে মানুষকে বুঝাবার জন্য, তার কাছে বাণী পাঠানো, তারপর তাকে বাণীর দিকে ফিরিয়ে দেয়া। আর আল্লাহ তায়ালা সম্বোধন করেন তাঁর নিজের শাশ্বত বাণীর মাধ্যমে। এর সাথে মানুষের সম্পর্ক দুই রকমের : সৎকর্মশীলতার ও কার্যকরণের। সৎ কর্মশীলতার সম্পর্কের অর্থ হচ্ছে : কর্তব্য পালনের শর্তগুলো

---

[৩৪] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫ ।

[৩৫] মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব সীদ আ্যাওজী আদ্ দামেস্কী, পরিচিতি লাভ করেছেন ইবনে কাইয়েম জওযী বা ইবনে কাইয়েম নামে। দামেশ্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৭৫১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

[৩৬] মিফতাহু দারুস সাআদাহ, ইবনে কাইয়েম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২।

[৩৭] জামউল জাওয়ামে গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যা ও ফুটনোট, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৫ । তানকীহুল ফুসূল, কারাফী, পৃষ্ঠা ৩১। আল মিরআতু ফিল উসূল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮৮। আল আস্নবী আলা মানহাজিল বাইদাবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২ ।

www.pathagar.com

একত্র হয়ে গেলে মানুষ তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এটি একটি প্রাচীন সম্পর্ক। অন্যদিকে কার্যকরকরণের সম্পর্কটি সাময়িক। কারণ এর অর্থ হচ্ছে, নবির আগমনের এবং তাঁর দাওয়াত পৌঁছে যাবার পর মানুষের কর্তব্য পালনের শর্তগুলো একত্র হয়ে যায়। এটিই এর প্রকৃত অর্থ। এখানে মানুষের ওপর কর্তব্য পালনের দায়িত্ব চাপে। আর একজন সাবালক বুদ্ধিমান মানব সন্তানের কাছে এ দাওয়াত পৌঁছে যাবার পর তাকে কর্তব্য পালনে তৎপর হতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। ফকীহ ও উসূলবিদগণ এ অর্থেই একে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে মানুষ তার আন্তরিক বিশ্বাস, কথা ও অন্যান্য মানবিক শক্তির মাধ্যমে কাজ করে।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ রচনা শব্দটির যে অর্থ করেছেন তা হচ্ছে : তাঁরা এ শব্দটিকে এর অর্থের ওপর প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। যেমন সন্তানের নাম রাখা হয় যায়েদ অর্থাৎ বুদ্ধি হওয়া। এ প্রেক্ষিতে এখানে এর অর্থ হচ্ছে : আল্লাহ তায়ালা একটি জিনিসকে কার্যকারণ, শর্ত, সঠিক প্রতিবন্ধক অথবা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী করে রচনা করেছেন।

শরিয়াহ অনুশাসন দুই প্রকারের : তাকলীফী তথা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত শরিয়াহ ও রচিত শরিয়াহ। এ উভয় প্রকার শরিয়াহর প্রত্যেকটিই আবার বিভিন্ন প্রকারের। আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত শরিয়াহ পাঁচ প্রকারের : ওয়াজিব, মানদুব, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ। কাজের দাবী যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন ওয়াজিবে পরিণত হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছলে তা হয় মানদুব। আবার কাজটি পরিহার করার দাবী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তা হারামে পরিণত হয়। এ দাবী চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছলে তা হয় মাক্রূহ। আর মানুষকে যখন কাজটি সম্পন্ন বা পরিহার করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয় তখন তাকে বলা হয় মুবাহ। এভাবে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত শরিয়াহ পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে[৩৮]।

এগুলো থেকে যে কাঙ্ক্ষিত কর্ম উৎপন্ন হয় তাকে সরাসরি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি ওয়াজিব এবং দ্বিতীয়টি মান্‌দুব। আর এগুলোর মাধ্যমে যে অনাকাঙ্ক্ষিত কর্ম পরিহার করা হয় তাকেও দুভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হারাম এবং অন্যটি মাকরূহ। আর এসব কর্ম সম্পন্ন ও পরিহার করার মাঝামাঝি যে ইখতিয়ার রয়েছে সেটি হচ্ছে মুবাহ।

ওয়াজিব বলা হয় এমন কাজকে যা পরিহার করলে মানুষ শরিয়াহর দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হয়। হারাম বলা হয় এমন কাজকে যা সম্পাদন করলে মানুষ শরিয়াহর দৃষ্টিতে

---

[৩৮] তানকীহুল ফুসূল, কারাফী, ৩৩ পৃষ্ঠা এবং উসূল মুহাম্মদ আল খিদরী, পৃষ্ঠা ৫৯।

www.pathagar.com

নিন্দাভাজন হয় এবং পূর্বাহ্নিক সতর্কতা হিসেবে শরিয়াহ বিধান অনুসারে তাকে কারারুদ্ধ করা যায়। মানদূব বলা হয় এমন কাজকে শরিয়াহর দৃষ্টিতে যা করাকে তার না করার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয় এবং না করার জন্য সে নিন্দনীয় হয় না। মাকরূহ বলা হয় এমন কাজকে শরিয়াহর দৃষ্টিতে যা পরিহার করাকে তার সম্পাদন করার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয় এবং তা সম্পাদন করলে নিন্দাভাজন হয় না। আর মুবাহ বলা হয় এমন কাজকে শরিয়াহর দৃষ্টিতে যার উভয় পাল্লা সমান।

কারাফী রহ.[৩৯] বলেন : ফিক্‌হের পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত অনুশাসনকে বলা হয়েছে তাক্‌লীফ্। কারণ এ তাক্‌লীফ শব্দটির মধ্যে রয়েছে কুল্‌ফাত। কুল্‌ফাত মানে হচ্ছে : মুশাক্কাত, দুঃখ, কষ্ট ও অস্বাচ্ছন্দ্য। অর্থাৎ নির্ধারিত কাজটি ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে তা পরিহারকারী কষ্টভোগ করবে। অথবা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে তা সম্পাদনকারী কষ্ট ভোগ করবে। আর এ দু'টি অবস্থা ছাড়া এর সম্পাদনকারী বা পরিহারকারীকে কষ্টভোগ করতে হবে না। কারণ কুল্‌ফাত তথা দুঃখ-কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শাস্তি। এ দু'টি অবস্থা ছাড়া এ শাস্তি নেই। এ কারণে বলা হয় : শিশুরা মুকাল্লাফ নয় অর্থাৎ তাদের শাস্তি নেই। যদিও তাদের হজ্জ সম্পাদন করা মানদুব হিসেবে গণ্য। আর তাদের নামায পড়া একটি সঠিক কাজ। কাজেই তাকলীফ শব্দটি সহনীয়তা ও প্রশস্ততা সৃষ্টি অর্থে শেষোক্ত তিনটির তুলনায় প্রথমোক্ত দুটির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে[৪০]।

রচিত শরিয়াহ বিধানের বিভিন্ন প্রকরণ

মানুষের কাজের ক্ষেত্রে শরিয়াহ প্রণয়নকারীর বিধান কখনো দাবী হিসেবে আবার কখনো ইখতিয়ার হিসেবে প্রদত্ত হয়। এগুলো তাঁর নির্ধারিত বিধান একথা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আবার কখনো এগুলো কোনো কিছুর কার্যকারণ, শর্ত বা প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেয়। তখন এগুলো হয় রচিত বিধান (Positive Law)। কোন কোন ফকীহ্ রচিত বিধানের ব্যাপারে বলেন : এগুলো কোনো জিনিস বা কাজকে সহীহ (সঠিক),

---

৩৯ তাঁর মূল নাম হচ্ছে, শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবুল উলা ইদ্‌রীস ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আস্‌সান্‌হাজী আল-বাহনাসী আল-মিসরী আল-কারাফী, মৃত্যু ৬৮৪ হিজরি। তিনি ছিলেন মালেকী মযহাবের অনুসারী। শায়খ ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম ছিলেন তার শিক্ষক। কারাফীর আল-আহকাম ফী তামীযিল ফাতাওয়া-আনিল আহকাম ওয়া তাসার্‌রুফাতুল কাযী ওয়াল ইমাম গ্রন্থের মাহমুদ উমূসের লিখিত ভূমিকা দেখুন।

৪০ তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ৩৩।

www.pathagar.com

ফাসেদ (বেঠিক), আযীমত (অবিচলতা) ও রুখসাতে (না করার অনুমতি) পরিণত করে[৪১]।

শরিয়াহর বিধানসমূহ কার্যকারণ, শর্ত ও প্রতিবন্ধকের অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ্ তায়ালা বিধানসমূহ রচনা করেছেন এবং তাদের জন্য তৈরি করেছেন বিভিন্ন কার্যকারণ, শর্ত ও প্রতিবন্ধক। মানুষের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা যে কর্মের দায়িত্ব চাপিয়েছেন তা দুই প্রকারের। এক. তাকলীফী কর্ম। একে মানুষের জ্ঞান ও শক্তির শর্তাধীন করেছেন। দুই. রচিত কর্ম। একে ঐ ধরনের কোনো শর্তাধীন করেননি। তবে এ ধরনের কর্ম বহুতর কার্যকারণ, শর্ত ও প্রতিবন্ধকের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো তার মধ্যে সাধারণভাবে নেই। তাই রচিত বিধানে পাগল ও গাফিলদের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে অনিষ্ট হতে পারে বলে তাদের জন্য গ্যারান্টি অপহিরার্য গণ্য করেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায় যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন : যখন বাস্তবে গ্যারান্টি পাওয়া যাবে তখন আমার হুকুম কার্যকর করতে হবে। ঝটতি তালাক দেয়া ও আত্মীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে মীরাস বন্টনও এরই অন্তর্ভুক্ত। কখনো কখনো একে জ্ঞানের শর্তাধীন করা হয়। যেমন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যিনাকারীর শপথ করে বলা এবং হত্যার বদলে হত্যা। কারণ যে ব্যক্তি পাপ কাজ করার সংকল্প করেনি, সে ব্যাপারে জানতোও না এবং তার অংশগ্রহণ ছাড়াই তা সম্পন্ন হয়েছে, সে যাতে শাস্তি না পায়, সে ব্যাপারে শরিয়াহর আইন অবশ্যই সজাগ।

এজন্য যেসব অপরাধমূলক কাজের শাস্তিস্বরূপ জামানতের ভিত্তিতে জরিমানা করা হয় সেগুলো ছাড়া প্রত্যেকটি মারাত্মক অপরাধ, যা সংঘটিত হয়, তার কার্যকারণের সাথে জ্ঞান ও সামর্থ্যের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে ফকীহগণ বলেন : জনগণের অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে জেনে বুঝে বা ভুলে কোনো অপরাধ করা সমান পর্যায়ভুক্ত[৪২]।

কার্যকারণ হচ্ছে : যার অস্তিত্বের ওপর কাজের অস্তিত্ব নির্ভরশীল হয় এবং যার অনস্তিত্বের ফলে কাজটি অস্তিত্বহীন হয়।

শর্ত হচ্ছে : যার অস্তিত্বহীনতার ফলে কাজটি অস্তিত্বহীন হয় এবং যার অস্তিত্বের ফলে কাজটির অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব/অনিবার্য হয়ে ওঠে না।

প্রতিবন্ধক হচ্ছে : যার অস্তিত্ব কাজটির অনস্তিত্বকে অনিবার্য করে এবং যার অনস্তিত্বের ফলে কাজটির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অনিবার্য হয় না।

---

[৪১] উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৫৯।

[৪২] উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪ ।

www.pathagar.com

এ তিনটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাবকে কার্যকারণ হিসেবে স্থির করা হয়েছে, একটি বর্ষকাল অতিক্রম হওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ঋণকে তার ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক নির্ণয় করা হয়েছে। কাজেই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে অর্থ-সম্পদের নিসাবের অধিকারী হতে হবে, তার ওপর দিয়ে একটি বছর ঘুরে যেতে হবে এবং তাকে ঋণমুক্ত থাকতে হবে।

কার্যকারণকে হুকুমের জন্য আরো বেশি ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে তার সংজ্ঞা যাকে অপরিহার্য করে তোলে না সেক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়াকে নামায ফরয হওয়ার আলামত নির্ধারণ করা। আবার শরিয়াহর জন্য যা তাকে অপরিহার্য করে তোলে সেক্ষেত্রেও তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন মদের উপর কিয়াস করে নবীয তামার (খেজুর ভিজানো পানি যা পান করলে নেশা হয়) হারাম হওয়ার জন্য পরিচিত কড়া গান বাজনাকে কার্যকারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মদ পান হারাম হওয়ার জন্য একে কার্যকারণ চিহ্নিত করা হয়নি। কারণ সুস্পষ্ট নস্-ও ইজ্মার ভিত্তিতে মদপান হারাম, কড়া গান-বাজনার ভিত্তিতে নয়।

কার্যকারণের ভিত্তিতে যার ওপর হুকুম প্রয়োগ করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে শরিয়াহর হুকুম প্রকৃত গুণের অধিকারী নয়। বরং প্রকৃত গুণের অধিকারী হচ্ছে তার প্রতি কার্যকারণের ভিত্তিতে শরিয়াহর হুকুম। এভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা, যা তার মধ্যকার হুকুমকে কার্যকারণের ভিত্তিতে হুকুম চিহ্নিত করে, অন্য কোনো শ্রুত প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, তার মধ্যে দু'টি হুকুম রয়েছে। এক. কার্যকারণের সাথে চিহ্নিত হুকুম। দুই. প্রকৃত গুণের ভিত্তিতে যে হুকুম করা হয়েছে তার সাথে জড়িত কার্যকারণ। যেমন- যিনা, তার মধ্যে দু'টি হুকুম রয়েছে : এক. যিনাকারীর ওপর হদ (অপরাধ দণ্ডবিধি) ওয়াজিব হয়ে যায়। দুই. যিনা যিনাকারীর ওপর হদ জারী করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রকৃতপক্ষে যিনার মধ্যে যিনাকারীর ওপর হদ জারী করার কোনো কারণ মওজূদ নেই বরং শরিয়াহ প্রণেতা তার ওপর হদ জারী করার ফলেই তার মধ্যে এ কারণ সৃষ্টি হয়ে গেছে[৪৩]।

কার্যকারণকে যখন হুকুমের সাথে চিহ্নিত করা হয় তখন এর অর্থ এ দাঁড়ায় না যে, সে নিজের সত্তা ও গুণের জন্য নিজেকে অপরিহার্য করে তোলে। তবে শরিয়াহর বিধান উপস্থিত হবার পূর্বে সে তার কারণে পরিণত হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, শরিয়াহ প্রণেতা কোনো হুকুমকে হুকুমে পরিণত করেন, অন্য কেউ নয়। আর কার্যকারণকে চিহ্নিত করে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে যে লাভটি হয়েছে তা হচ্ছে : ওহির জামানা

---

[৪৩] আল আহকাম, আল আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬, রাওদাতুন নাযের পৃষ্ঠা ৩০; আল মুসতাস্ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩। ইবনুল হাজেব আলাল আদুদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭ ।

www.pathagar.com

খতম হয়ে যাওয়ার পর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনায় মানুষের ওপর শরিয়াহর নির্দেশ জারী হওয়ার ক্ষেত্রে কঠিনতা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে শরিয়াহ প্রণেতা বিভিন্ন ঘটনাকে শরিয়াহর নির্দেশ বহির্ভূত করার জন্য পরিচিত গুণাবলীকে সতর্ক ঘন্টায় পরিণত করেছেন। এ অবস্থায় কার্যকারণ যতবারই দেখা যাবে ততবারই হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন সূর্য ঢলে পড়া, প্রথমার চাঁদ উদিত হওয়া, একটি বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি কার্যকরণ[৪৪]।

ফকীহগণ কার্যকারণ শব্দটির চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন :

প্রথম স্তর : প্রত্যক্ষের মোকাবিলায় তাকে ব্যবহার করা। যখন তাকে ব্যবহার করা হয় প্রত্যক্ষের মোকাবিলায় তখন তা থেকে আমাদের উদ্দেশ্য হয় নিছক শর্ত। এ শব্দটিকে জামিনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে : প্রত্যক্ষের পক্ষে জামিন প্রয়োজন, কারণসূচকের পক্ষে নয়। এখানে প্রত্যক্ষের জন্য কারণ থাকতে হবে এবং কারণসূচকের জন্য থাকতে হবে শর্ত। বলা হয় : পশুর পায়ের খুর হচ্ছে কারণসূচক এবং কুঠার প্রত্যক্ষ। আর যে ব্যক্তি দাসের বাঁধন খুলে দিল, যার ফলে সে পালিয়ে গেলো সেক্ষেত্রে সে হলো কারণসূচক এবং দাস হলো প্রত্যক্ষ। এক্ষেত্রে হুকুম অর্জিত হয়েছে বাঁধন খুলে দিয়ে পলায়ন করার মাধ্যমে, কেবল বাঁধন খুলে দেয়ার মাধ্যমে নয়। বলা হয়, পবিত্রতা অর্জিত হয় রজমের মাধ্যমে। এখানে রজম পরিণত হয় শর্তে এটি এর শাব্দিক অর্থে ব্যবহারের নিকটতম স্তর।

দ্বিতীয় স্তর : এটি হচ্ছে কারণের কারণ কার্যকারণ। যেমন : তীর নিক্ষেপ করা। এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, এটা মৃত্যুর কারণ। কেননা তীর নিক্ষেপের ফল মৃত্যু নয়। বরং এ স্তরে পৌঁছার জন্য তীর নিক্ষেপটা কার্যকারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভিতরে অনুপ্রবেশ করা ও আঘাত লাগার মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছে তীর নিক্ষেপের ফলে তাই অর্জিত হয়েছে। ফলে তীর নিক্ষেপটা যেন কারণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য এ দুই স্তরের একটির সাথে এর অর্থ সামঞ্জস্যশীল হয়েছে। আর সেটি হচ্ছে, কারণের মাধ্যমে ছাড়া এর হুকুম অর্জিত হবে না। যেমন রাস্তায় পৌঁছানো সম্ভব নয় কারণের মাধ্যম ছাড়া। তবে ভ্রমণ রাস্তা অতিক্রম করার ফল নয়। এখানে কারণটি অর্জিত হয়েছে কার্যকারণের সাহায্যে। কার্যকারণের এ শ্রেণিটি হুকুমের বাধ্যবাধকতার প্রত্যেকটি স্তরে প্রত্যক্ষ হুকুমের অধিকারী হয়।

তৃতীয় স্তর : এটি হচ্ছে কারণওয়ালা, এর পেছনে থাকে গুণাবলী হিসেবে কার্যকারণ। এর নামকরণ করা হয়েছে : কাফফারার জন্য শপথ, কার্যকারণ

---

[৪৪] আল আহকাম, আল আসাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬, ওদাতুন নায়ের, পৃষ্ঠা ৩০; আল মুস্তাসফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩।

www.pathagar.com

হিসেবে। একে এ নামকরণও করা হয়েছে : নিসাবের মালিক, কার্যকারণ হিসেবে, শপথ ভঙ্গ না করে এবং বছর পার না করে। এভাবে রূপকের মাধ্যমে একে পেশ করার অর্থ হলো, নিছক তার সাহায্যে হুকুম অর্জিত হয় না। যেমন নিছক পথের সাহায্যে গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না[৪৫]।

চতুর্থ স্তর : এমন অপরিহার্য কারণ যা কার্যকারণে পরিণত হয়। যেমন প্রেম, শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের কারণের নামকরণ করা হয়েছে: কার্যকারণ। কেনাবেচার কারণের নামকরণ করা হয়েছে : মালিকের জন্য কার্যকারণ অমালিকের প্রতি। এটি হচ্ছে শাব্দিক কাঠামো থেকে রূপক অর্থে দূরবর্তী স্তর। কারণ এখানে উদ্দেশ্য কারণের সাথে সম্পর্কিত এবং কাঠামোর মধ্যে কার্যকারণের সাথে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু প্রত্যেক স্তর থেকে শর্ত ও আলামতের অর্থের মধ্যে যে শরিয়াহ কারণ থাকে সেটিই রূপকের স্তর। কারণ তার সত্তার সাহায্যে হুকুম ওয়াজিব হয় না বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হুকুম ওয়াজিব হয়। এই স্তর থেকেই রূপক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়[৪৬]।

কারাফী রহ. তাঁর তানকীহুল ফুসূল গ্রন্থে বলেছেন : তার জন্য শর্ত হচ্ছে, কারণের অংশের সাথে তার সামঞ্জস্য থাকতে হবে। তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, কারণের অংশ তার সত্তার উপযোগী, অন্যদিকে শর্ত হচ্ছে অন্যের উপযোগী। কারণের অংশের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন জেনে বুঝে জালেমানা হত্যার কিসাস। কারণ তিনটি হচ্ছে কিসাসের কার্যকারণ। এদের প্রত্যেকটি কারণের অংশ। কারণ তাদের কোনোটিকে আবার আমরা স্বতন্ত্রভাবে কিসাস ওয়াজিব হবার ফলে পাই না। আর যদি তাদের কোনোটিকে স্বতন্ত্র হুকুমের মাধ্যমে পাই তাহলে তাদের প্রত্যেকটিই হবে স্বতন্ত্র কারণ। হুকুমের ব্যবস্থাপনাকে একত্র করা হলে যদি তাদের কোনোটি স্বতন্ত্র হয়ে যায় তাহলেও হুকুম কার্যকর হবে। যেমন কুমারীত্ব ও শক্তিপ্রয়োগ সাপেক্ষে নাবালিকত্ব। যদি এ দুটি একত্র হয়ে যায় তাহলে পিতা শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। আর যদি এদের কোনো একটি আলাদা হয়ে যায় যেমন বিবাহিতা নাবালিকা অথবা অবিবাহিতা কুমারী, তাহলে তার জন্য শক্তি প্রয়োগ বৈধ। তবে এ ব্যাপারে হানাফীয়া ও শাফেয়ীয়াদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

এক্ষেত্রে যখন সবকিছু উপযোগী হয় তখন সেখানে কোনো শর্ত থাকে না বরং থাকে একটি বা একাধিক কারণ। আর যদি কিছু অংশ উপযোগী হয় এবং কিছু অংশ হয়

---

[৪৫] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ৩৫৮ ।

[৪৬] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ৩৫৯, আল মুস্‌তাসফা, খণ্ড ১ । পৃষ্ঠা ৯৩ এবং রওদাতুন নাযের, পৃষ্ঠা ৩০।

www.pathagar.com

অনুপযোগী তখন উপযোগী অংশ হয় কারণ এবং অনুপযোগী অংশ হয় শর্ত, আর এ শর্ত হয় সত্তার ওপর হুকুমের নির্ভরতার প্রয়োজনে। শর্তের আচরণের ক্ষেত্রে কার্যকারণসূচকের কৌশলের জন্য পূর্ণতাকারী অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এটা নিসাবের অংশের মতো। কারণ এটা হচ্ছে ধর্মীর সম্পদের কিছু অংশ। দরিদ্রদেরকে এর মাধ্যমে সান্ত্বনা দেয়া যায়। বছর ঘুরে যাবার সময় তার মধ্যে সম্পদশালিতা থাকে না। তবে তা নিসাবের উপযোগী সম্পদশালিতাকে পূর্ণতা দান করে। ফলে তা শর্তে পরিণত হয়[৪৭]।

শরিয়াহ্ প্রতিবন্ধক তিন প্রকারের

এক. হুকুমের সূচনা ও তার ধারাবাহিকতাকে যা বাধা দেয়।

দুই. যা কেবল তার সূচনাকে বাধাগ্রস্ত করে।

তিন. প্রথমটি বা দ্বিতীয়টির সাথে সম্পৃক্ত হবে কিনা এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।

প্রথমটির দৃষ্টান্তঃ যেমন রিদায়াত বা শিশুকে দুধপান করানো। এর ফলে প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ, রিদায়ী ভাই-বোনের মধ্যে যেমন বিয়ে নিষিদ্ধ তেমনি অনাকাংখিতভাবে তা ঘটে গেলে তাকে টিকিয়ে রাখা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ ইস্‌তাব্‌রা বা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর থেকে আলাদা হতে চাওয়া। এর ফলে প্রাথমিক পর্বেই বিয়ে নিষিদ্ধ এবং তা ঘটে গেলে তার ধারাবাহিকতাকে বাতিল করা হবে না। আর তৃতীয়টির দৃষ্টান্ত হচ্ছে : ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা। প্রাথমিক পর্বেই এটি নিষিদ্ধ এবং কোনোক্রমে মুহরিম শিকার করে ফেললে শিকার করা জীব থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া ওয়াজিব কিনা? এ প্রশ্নে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে[৪৮]।

সঠিক ও বাতিল

সঠিক শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি হচ্ছে দুনিয়ায় কর্মের উদ্দেশ্য নির্ণয় করা। যেমন আমরা ইবাদত সংক্রান্ত ব্যাপারে বলে থাকি যে, এগুলি সঠিক ইবাদত। এর অর্থ হয়, এগুলো সংরক্ষণ করলেও প্রতিদান দেয় ও ত্রুটিমুক্ত করে এবং সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। শর্ত ও আরকান সহকারে এটি হবে শরিয়াহ প্রণেতার হুকুম অনুসরণ করা। আর যেমন লেনদেনের ব্যাপারে বলা হয়, এটি

---

[৪৭] তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০।

[৪৮] তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০।

www.pathagar.com

সঠিক লেনদেন। এর অর্থ-শরিয়াহর দিক দিয়ে মালিকানা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে এটি কল্যাণকর। যেমন বেচা-কেনা ও ইজারাদারী।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আখেরাতে কর্মফল। যেমন সওয়াব লাভ করা। বলা হয় : এটি সঠিক আমল। অর্থাৎ এ থেকে আখেরাতে সওয়াবের আশা করা যায়, এটি ইবাদত বা অভ্যাস হিসেবে করা হলেও[৪৯]।

অন্যদিকে বাতিল বলতে বুঝায় দুনিয়ায় কাজের প্রভাব ও ফল অনুষ্ঠিত না হওয়া। যেমন ইবাদতের ব্যাপারে আমরা বলি, এ ইবাদতটি বাতিল হয়ে গেছে। এর অর্থ হয় এটি সংরক্ষণ করলে প্রতিদান দেয়না ও ত্রুটিমুক্ত করে না এবং সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয় না। এটি হচ্ছে শরিয়াহ প্রণেতার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা। এ বিরোধিতা যখন প্রযুক্ত হয় ইবাদতের সাথে তখন বাতিল শব্দটি তার ওপর প্রয়োগ করার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ দেখা যায় না। এটি যখন বাইরের কোনো গুণের সাথে প্রযুক্ত হয়, যা তার প্রকৃত তাৎপর্য থেকে দূরে অবস্থান করে, যেমন জবর দখল করা বা অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া কোনো জায়গায় নামায পড়া। এক্ষেত্রে জাম্হুরের মতে নামায সঠিক হবে। কারণ শরিয়াহ প্রণেতার রীতি অনুযায়ী নামায পড়া হয়েছে। বিরোধিতা এক্ষেত্রে নামাযের গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। তবে কোনো কোনো ফকীহ একে বাতিল গণ্য করেছেন। কারণ তাঁরা একে শরিয়াহ প্রণেতার হুকুমের গুণগত বিরোধিতা হিসেবে গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে ছিনিয়ে নেয়া বা কারোর কাছ থেকে বলপূর্বক কেড়ে নেয়া ছুরি দিয়ে যবেহ করার ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়।

লেন-দেন প্রধানত যখন দুনিয়াবী স্বার্থভিত্তিক হয় তখন সেখানে দুটি বিবেচনা সামনে আসে। এক. সেগুলি শরিয়াহর দৃষ্টিতে অনুমোদিত অথবা নির্দেশিত বিষয়। দুই. সেগুলি বিভিন্ন কল্যাণ বা স্বার্থের কার্যকারণ, যেগুলির ভিত্তি তাদের ওপর স্থাপিত হয়েছে। প্রথম বিবেচনাটি যে দল করেছেন তাদের মতে, এখানে শরিয়াহ প্রণেতার নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। যেমন নিছক ইবাদতের ক্ষেত্রে। এ অবস্থায় শরিয়াহ প্রণেতার নির্দেশের বিরোধিতার ফলে তা শরিয়াহ বিরোধী হয়ে যায় এবং শরিয়াহ বিরোধী বিষয় বাতিল হিসেবে গণ্য। এক্ষেত্রে শাফেয়ীগণ বলেন: ফাসেদ ও বাতিল লেনদেনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন একথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবেচনাটি যারা করেছেন তারা

---

[৪৯] দেখুন আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৭। আল মুস্তাসফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৫, জামউল জাওয়ামে, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৭, তানকীহুল, ফুসূল, পৃষ্ঠা ৩৬। উসূল মুহাম্মাদ আল খিদরী, পৃষ্ঠা ৮০।

www.pathagar.com

প্রথম বিষয়টির পরোয়া করেননি বরং তাঁরা বিষয়টিকে কল্যাণ বা স্বার্থের বিবেচনার ভিত্তিতে প্রয়োগ করেছেন।

এ অর্থের ভিত্তিতে কখনো এর কাজ হয় হুকুমের বিরোধী এবং আসল চুক্তি বা কার্যক্রমে তার প্রভাব পড়ে। যেমন পাগলের বেচা-কেনা এবং মুসলিম মেয়ের বিয়ে কাফেরের সাথে। এগুলো বাতিল গণ্য হবে। আবার কখনো অর্থের ভিত্তিতে কাজ হয় বিরোধী এবং তা আসল চুক্তিতে কোনো প্রভাব ফেলে না, তবে তার গুণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ক্ষতিপূরণ সম্ভবপর হয়। যেমন অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য বা অজ্ঞাত মূল্যের বিনিময়ে বেচা-কেনা। এক্ষেত্রে কাজটি বাতিল হওয়া সম্ভব নয়। বরং চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় ক্ষতিপূরণ প্রদানে নির্দেশিত হয়। এ অর্থটি কখনো শরিয়াহ নির্ধারিত সময় সীমার বিরোধী গুণকে সরিয়ে দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো চুক্তি বাতিল করে দেয় যদি তা গ্রহণ করে নেওয়া হয়। হানাফীগণ একে ফাসেদ চুক্তি গণ্য করেছেন। আর তাদের দৃষ্টিতে বাতিল হচ্ছে এমন চুক্তি যা আসলেও গুণগতভাবে শুরু হয়নি। অন্যদিকে ফাসেদ হচ্ছে এমন চুক্তি যা গুণগতভাবে না হলেও আসলে শুরু হয়েছিল। যেমন সূদী বেচাকেনার চুক্তি। কারণ তা বেচা-কেনা হিসেবেই শুরু হয় এবং নিষিদ্ধ হয়ে যায় এ কারণে যে, বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই এটা আসলে ও গুণগতভাবে নিষিদ্ধ এবং গুণগতভাবে নয় বরং আসলে বৈধ এর মাঝখানে একটি পর্যায়ের দাবী করে। এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিতে হুকুমের ব্যবহারটাই ফাসেদ, হুকুম বাতিল হওয়াটা নয়।

শাফেয়ীগণ বাতিল ও ফাসেদ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে এটা তার বিপরীত। তাদের দৃষ্টিতে এ দুটির একই অর্থ।

আযীমাত ও রুখ্সাতের ক্ষেত্রে হুকুমের বিভিন্নতা

আযীমাত শব্দটি এসেছে আয্ম থেকে। আয্ম অর্থ দৃঢ় সংকল্প। শরিয়াহর দৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে : যা সূচনাতেই শরিয়াহর সাধারণ প্রচলিত হুকুম হিসেবেই শুরু হয়েছিল। সাধারণ হুকুম অর্থ হচ্ছে : যা দায়িত্ব পালন অর্থে কেবল বিশেষ কিছু দায়িত্বশীলের সাথে এবং বিশেষ কিছু অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন নয়। যেমন নামায। নামায সাধারণভাবে সবার ও প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সকল অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে রোযা, যাকাত ও হজ্জ। অন্যদিকে ইসলামের শিআর তথা ঐতিহ্যগুলো শরিয়াহর বিশেষ বিষয়াবলী হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে।

আর সূচনাতে শরিয়াহী বিধান হিসেবে এর প্রচলন অর্থ হচ্ছে, শরিয়াহ প্রণেতা শুরু থেকেই বান্দাদের ওপর ফরয হুকুম হিসেবে এগুলোর প্রচলন করেছেন। এর পূর্বে

www.pathagar.com

শরিয়াহর কোনো হুকুম এর অগ্রবর্তী ছিল না। যদি অগ্রবর্তী কোনো হুকুম থেকে থাকে তাহলে এটি এসে তাকে রহিত করে দিয়েছে। ফলে এটি প্রাথমিক হুকুমে পরিণত হয়েছে এবং এ থেকে কোনো কিছুকে বিশেষত্ব প্রদান করা হয়নি[৫০]।

অন্যদিকে রুখ্সাত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : সহজ ও অনায়াস। ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর সংজ্ঞা এভাবে নির্দেশ করেছেন : দায়িত্ব পালনকারীর কোনো ওজর ও অক্ষমতার কারণে তার দায়িত্ব পালনকে সহজ করে দেয়া এবং তার মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা[৫১]।

কাজেই মারাত্মক ওজরের ভিত্তিতে রুখ্সাত শুরু হয়। মূল থেকে ব্যতিক্রম হিসেবে তাকে ধরা হয় এবং প্রয়োজন পূরণের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্তও করা হয়। মারাত্মক ওজর তাকে আযীমত থেকে আলাদা করে দেয়। আর তার 'মারাত্মক ও কঠিন হওয়ার ফলে উপস্থিত অনায়াসলব্ধ প্রয়োজন থেকে নিছক প্রয়োজনকে বের করে দেয়। যেমন সাল্ম ব্যবসা[৫২] করা। উসূলবিদগণ একে রুখ্সাত বলেননি। আর এর আসল থেকে ব্যতিক্রম হওয়া একথা বলে যে, প্রথমে এটা বিধিবদ্ধ ছিল না, আসল হুকুম স্থিতি লাভ করার পর বিধিবদ্ধ হয়। বাকি থাকে রুখ্সাতের ক্ষেত্রে তার সংক্ষিপ্ত হওয়া। এটা রুখ্সাতের এমন একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা বিধিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ প্রয়োজন ও রুখ্সাতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। রুখ্সাতের বিধিবদ্ধতা একটা আংশিক বিষয়, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সাল্ম ব্যবসায়ে ও মুদারিবায়[৫৩] তা হয় না। এ দুটি সর্বাবস্থায় জায়েয। কাজেই আযীমত পরিপূর্ণ মূলের দিকে শুরুতেই ফিরে আসে। অন্য দিকে রুখ্সাত ফিরে আসে পরিপূর্ণ মূল থেকে আলাদা হয়ে অংশ বিশেষের দিকে[৫৪]।

---

৫০ আল আযীমাত শারহুল আদুদ আলা ইবনিল হাজের, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮। আল মুসতাসফা, খণ্ড ২, ৯৮ পৃষ্ঠা। আল মাআদী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৮।

৫১ আল মুস্তাস্ফা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৮।

৫২ সাল্ম ব্যবসায়ের নিয়ম হলো : পণ্যের মূল্য নগদ আদায় করা হয় এবং পণ্য পাওয়া যায় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে।

৫৩ আর মুদারিবাকে বাংলায় বলা হয় ফট্কা। অর্থাৎ অধিক মূল্যে বিক্রয়ের আশায় পণ্য বা শেয়ার কেনা।

৫৪ উসূল মুহাম্মদ আল খিদরী, পৃষ্ঠা ৭১-৭২।

www.pathagar.com

শরিয়াহর উৎসসমূহ বা আহকাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী

শরিয়াহর হুকুমের সংজ্ঞা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে আমরা বলেছি : এখানে আল্লাহ তায়ালার সম্বোধন দায়িত্বশীলদের কর্মের সাথে সম্পর্কিত। এ থেকে প্রতিপাদ্য হয় যে, শরিয়াহর আহকাম বা বিধানসমূহ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ নয়।

আহকাম সম্পর্কিত আমাদের বক্তব্যসমূহকে সংক্ষেপে তিনটি বিষয়ে বিভক্ত করা যায়।

এক. শরিয়াহ এমন কোনো দায়িত্বভার অর্পণ করেনি যা বহন করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

দুই. দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়া শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়।

তিন. মুতাযিলা ও আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে ভালো ও মন্দ বিষয়াবলী।

প্রথম বিষয়

কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, দায়িত্ব পালনকারীর কাজ করার ক্ষমতাই তার দায়িত্ব পালনের শর্ত ও কারণ হিসেবে বিবেচিত। যে কাজটি করার তার ক্ষমতা নেই শরিয়াহর দিক দিয়ে সেটি করার দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়া সঠিক নয়, যদিও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তা বৈধ। যে কাজটি করার ক্ষমতা মানুষের নেই কখনো আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে শরিয়াহ প্রণেতা যেন মানুষকে সেটি করতে বলেছেন। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

তোমরা কখনো মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না[৫৫]।

নবি সা. বলেন :

كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل.

আল্লাহ তায়ালার নিহত বান্দা হও, হত্যাকারী বান্দা হয়ো না[৫৬]।

তিনি আরো বলেন :

لا تمت وانت ظالم.

---

[৫৫] সুরা আল বাকারা, ১৩২ আয়াত।

[৫৬] শাতবী মাওয়াফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬।

www.pathagar.com

জালেম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো না।

এখানে আসলে সেটিই চাওয়া হয়েছে যা মানুষের শক্তির আওতাভুক্ত। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা ও ইসলামের আহকাম মেনে চলা এবং জুলুম পরিহার করা, হত্যা না করা ও আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে নেওয়া। এ ধরনের সমস্ত বিষয় এ পর্যায়ভুক্ত।

অনুরূপভাবে মানুষের স্বভাবজাত গুণাবলী, যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা। এগুলো বিলুপ্ত করা বা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে এগুলোকে সরিয়ে দেয়া কখনো কাঙ্ক্ষিত হয় না। কারণ এগুলো এমন সব চাহিদা ও দায়িত্ব যেগুলো কাঙ্ক্ষিত হয় না। কারণ এগুলো এমন সব চাহিদা ও দায়িত্ব যেগুলো খতম করার ক্ষমতা মানুষের নেই। ঠিক তেমনি মানুষের শরীরের মধ্যে যে প্রকৃতিগত দোষ-ত্রুটি আছে সেগুলোকে গুণাবলী হিসেবে প্রকাশ করা বা দোষগুলোকে ষোলকলায় পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা কাঙ্ক্ষিত নয়। কারণ এগুলো মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

এ ধরনের বিষয় দাবী বা নিষিদ্ধ করা শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়। বরং তিনি মানুষের কামনা বাসনাকে যেসব বিষয় হালাল নয় সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখতে ও দমন করতে চান। হালাল জিনিস প্রয়োজন মতো ভারসাম্যপূর্ণভাবে সরবরাহ করতে চান। মানুষ কর্মের মাধ্যমে যেসব গুণাবলী অর্জন করতে পারে এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত[৫৭]।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, মানুষের জন্য কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী মূলত : তিন প্রকারের।

এক. যেগুলো কোন ক্রমেই মানুষের অর্জন ক্ষমতার আওতাভুক্ত নয়। এগুলো স্বল্প সংখ্যক। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী :

فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।

এখানে মৃত্যু বরণ করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। কাজেই এখানে কাঙ্ক্ষিত বিষয় হচ্ছে তাই যা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে আছে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ অনুগত বান্দা হয়ে যাওয়া।

---

[৫৭] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

www.pathagar.com

দুই. যেগুলো পুরোপুরি মানুষের অর্জন ক্ষমতার আওতাভুক্ত। মানুষের বেশির ভাগ কাজ এর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষ প্রচেষ্টা চালালে সেগুলো অর্জন করতে পারে। এখানে কাঙ্ক্ষিত হচ্ছে, অর্পিত দায়িত্ব নিজের বা অন্যের জন্য হোক সঠিকভাবে পালিত হওয়া।

তিন. যার হুকুম কখনো কখনো সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন ভালোবাসা-ঘৃণা, কাপুরুষতা-সাহসিকতা, ক্রোধ ইত্যাদি। এগুলো মানুষের অভ্যন্তরে স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। সৃষ্টিগতভাবে মানুষের প্রকৃতির সাথে এগুলো মিশে আছে। কাজেই এগুলোর অধীন হয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে যে গুণাবলী আছে, অবশ্যই তাদের অধীনে মানুষকে বিভিন্ন কাজ করতে হবে। কাজেই সেই কাজগুলোর ওপর চাহিদা নির্ভরশীল হবে, তা থেকে যা উৎপন্ন হবে তার ওপর নয়। অথবা এগুলো অন্যের উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রসূত হয়। উত্তেজনাবশত তার মধ্যে এগুলো উৎপন্ন হয়। কাজেই অন্য ধরনের কাজ করার চাহিদা নিয়ে এগুলোর আগমন হয়।

তার উত্তেজক যদি পূর্বগামী এবং তার স্বোপার্জিত হয়, তাহলে তার চাহিদা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে। যেমন নবি সা. বলেছেন : تهادوا تحابوا অর্থাৎ, পরস্পর উপহার আদান প্রদান করো, পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। আর যেদিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয নয় সেদিকে কামনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আর যদি তার উত্তেজক তার স্বোপার্জিত না হয়, তাহলে তার সাথে সংশ্লিষ্টদের চাহিদা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে। যেমন উত্তেজকের ক্রোধ প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং কামনার দৃষ্টি যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি, যে কাজ দায়িত্বশীলের ক্ষমতার আওতায় পড়ে না, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য তাকে দায়ী করেন না। কারণ এর মধ্যে রয়েছে বাস্তবে যে কাজ করার ক্ষমতা তার নেই তার জন্য নিজেকে দায়ী করা। আর আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতার বাইরে কোনো ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য দায়ী করেন না। কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি সুস্পষ্ট শরয়ী বিধান।

দ্বিতীয় বিষয়

ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব অর্পনের ক্ষেত্রে তাকে কষ্ট দেয়া শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়। ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি, যে কাজটি ব্যক্তির ক্ষমতার আওতায় পড়ে না শরিয়াহর দৃষ্টিতে সে কাজটি করা তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া পূর্ববর্তী শরিয়াহগুলো থেকেও ক্ষমতা বহির্ভূত কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবার কথাও প্রমাণিত

www.pathagar.com

নয়। এখন এই পর্যালোচনার পর ক্ষমতার আওতায় পড়ে কিন্তু করা কষ্টকর এমন ধরনের কাজের আলোচনায় আসতে হয়। কারণ যে কাজ করার ক্ষমতা নেই তা করার জন্য কষ্ট দেয়া শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়। এ কষ্ট কয়েক প্রকারের।

কষ্ট শব্দটি আরবি ভাষায় যেভাবে ব্যবহার হয় তা থেকে বোঝা যায় যে, কোনো বিষয় বা কোনো কাজ করা যখন খুব কঠিন হয় এবং এই কঠিনতা ব্যক্তির পিছু নিতে থাকে তখন তাকে কষ্টকর বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ

সেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ও কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না[৫৮]।

কষ্ট বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হলে আরবি বাগধারায় সাধারণত এর চার ধরনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

প্রথম ব্যবহার : আয়ত্তাধীন ও তার বাইরের সব বিষয়ের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতার বাইরে হলেই তাকে কষ্টকর বলা হয়। যেমন কুঁজোর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, মানুষের হাত-পা ছড়িয়ে বাতাসে উড়ে বেড়ানো এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন বিষয়।

দ্বিতীয় ব্যবহার : আওতাধীন বিষয়ের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে তা চিরাচরিত কাজের বাইরে থাকে, এমন অবস্থায় যে তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি বিরাজ করে এবং তাকে চাপিয়ে দিলে কষ্ট বেড়ে যায়।

এ ব্যবহারটি দু'প্রকারের। একটি হচ্ছে, ব্যক্তির কাজের ধরনের ভিত্তিতে বিশেষ কষ্ট। কাজটি একবার করা হলে কষ্টই দেখা যায়। এজন্য এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়েছে, যা ফকীহদের বহুল প্রচলিত পরিভাষায় রুখ্সাত নামে পরিচিত। যেমন রুগ্ন অবস্থায় ও সফরে রোযা রাখার কষ্ট, সফরে রোযা সম্পূর্ণ করা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন কাজ। দ্বিতীয় প্রকারটি হচ্ছে, সমগ্র কাজের ভিত্তিতে একবার নয় বরং নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে তা করতে থাকার ভিত্তিতে কষ্ট। এভাবে কাজ করলে যে করে তার জন্য কষ্টকর হয়। নফলের ব্যাপারে এগুলো দেখা যায়। যে ধরণের নফল কাজ করার ক্ষমতা ব্যক্তির নেই যে কোনো কারণেই হোক না কেন সে যখন নিজের ওপর তা চাপিয়ে নেয় তখন এ ধরনের কষ্ট হয়। কারণ স্থায়ীত্বই তাকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে। প্রথম প্রকার অনুযায়ী কাজটি একবার করার পর সে যে কষ্টের সম্মুখীন হয় বার বার তার সম্মুখীন হতে থাকে। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে

---

[৫৮] সুরা আন নাহল, ৭ আয়াত।

www.pathagar.com

শরিয়াহ কোমলতার বিধান আরোপ করেছে এবং কষ্টের মধ্যে পড়তে না হয় এমন কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। যেমন নবি সা. বলেছেন :

خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا

এমন কাজ করো যা করার ক্ষমতা তোমাদের আছে। কেননা তোমরা ক্লান্ত না হলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্লান্তড় করেন না[৫৯]।

তিনি আরো বলেছেন :

وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا

তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যপন্থা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবে[৬০]।

এ কষ্টটা দেখা দেয় সম্পূর্ণ কাজের ভিত্তিতে এবং প্রথম প্রকারের মধ্যে যে কষ্টের কথা বলা হয়েছে তা দেখা দেয় আংশিক কাজের ভিত্তিতে।

তৃতীয় ব্যবহার : আয়ত্তাধীন বিষয়ের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যক্তির নিয়মিত কাজের ফলে যে কষ্ট হয় তার কোনো প্রভাব এর ওপর পড়ে না। কিন্তু দায়িত্বের বোঝা চাপার পূর্বে যে নিয়ম ও অভ্যাস গড়ে ওঠে দায়িত্বের বোঝার চাপটাই তার ওপর বাড়তি কষ্ট বিবেচিত হয়। এজন্য দায়িত্বের বোঝা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আসলে দায়িত্ব শব্দটির আভিধানিক অর্থের মধ্যে কষ্টের তাগিদ পাওয়া যায়। কারণ আরবরা যখন কাউকে কোনো কঠিন ও কষ্টকর কাজের হুকুম দেন তখন বলেন كلفته تكليفا তার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছি। এ দৃষ্টিতে বিচার করে এ ধরনের কাজকে কষ্টকর বলা হয়েছে।

চতুর্থ ব্যবহার : ইতোপূর্বের আলোচনায় যেসব কাজের জন্য কষ্ট অনিবার্য হয়েছে সেগুলোর তুলনায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। কারণ দায়িত্ব চাপানোর মধ্যে দায়িত্বশীলকে তার নফসের কামনা থেকে বের করে নিয়ে আসার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর সাধারণভাবে কামনার বিরোধিতা করা তার জন্য কষ্টকর হয়। কামনার জন্য মানুষ কষ্ট ও ক্লেশের সম্মুখীন হয়। এটা মানুষের একটি পরিচিত প্রাকৃতিক প্রবণতা।

মোটামুটি আরবি ভাষায় কষ্ট শব্দের এ চার ধরনের ব্যবহার দেখা যায়।

---

[৫৯] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৫।

[৬০] বুখারি, রিকাক অধ্যায়।

www.pathagar.com

প্রথম ধরনের কষ্টের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শরিয়াহ কোনো প্রকার দায়িত্ব আরোপ করেনি।

দ্বিতীয় ধরনের কষ্টের ক্ষেত্রে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য কষ্টকর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া নয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি পথ আছে :

এক. নস্ সুস্পষ্ট ভাষায় এই উম্মতের উপর থেকে কঠিনতা, কষ্ট ও সংকীর্ণতা উঠিয়ে নেবার এবং সহজতা ও কোমলতা আরোপ করার বাণী উচ্চারণ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا

> আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না, যা তার সাধ্যাতীত[৬১]। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :
>
> يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
>
> আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা চান না[৬২]।

তিনি আরো বলেন :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

> তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি[৬৩]। এ ধরনের আরো বিভিন্ন নস্ রয়েছে।

দুই. শরিয়াহর বিধান অনুযায়ী রুখ্সাত তথা ছাড় দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি শরিয়াহর একটি নির্ধারিত বিষয় এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটি দ্বীনী জ্ঞান। যেমন সফরে ও অসুস্থতায় রমযানের রোযার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া, সফরে নামাযে কসরের ব্যবস্থা করা, সফরে জাম্আ বাইনাস সালাতাইন অর্থাৎ, দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার অনুমতি দেয়া এবং ক্ষুধায় প্রাণ সদংশয়ের আশঙ্কায় একান্ত বাধ্য হয়ে হারাম বস্তু খাওয়া। নিসন্দেহে এসব সংকীর্ণতা ও কষ্ট দূর করার কথা প্রমাণ করে।

---

৬১ সুরা আল বাকারাহ- ২৮৬ আয়াত।

৬২ আল বাকারাহ- ১৮৫ আয়াত।

৬৩ সুরা আল হাজ্জ- ৭৮ আয়াত।

www.pathagar.com

তিন. দায়িত্বের ক্ষেত্রে এর অস্তিত্বশীল না হওয়ার ব্যাপারে ইজ্মা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, শরিয়াহ প্রণেতা এর নির্দেশ দেননি। এরপরও যদি এটা ঘটে যায় তাহলে শরিয়াহর মধ্যে বৈপরীত্য ও মতবিরোধ দেখা দেবে। আর শরীয়তে এই ধরনের বৈপরীত্য ও মতবিরোধ নেই। কারণ শরিয়াহ্ যখনই প্রণীত হয়েছে কষ্ট ও কঠিনতাকে লক্ষ্য করে এবং যখনই প্রমাণিত হয়েছে যে, শরিয়াহর লক্ষ্য হচ্ছে কোমলতা ও সহজতা তখনই এ দু'য়ের মধ্যে বৈপরীত্য ও বিরোধ প্রবল হয়েছে। কিন্তু মূলত ইসলামি শরিয়াহ এ ধরনের বিরোধ ও বৈপরীত্য মুক্ত[৬৪]।

এখন তৃতীয় ধরনের কষ্টের ক্ষেত্রে শরিয়াহ প্রণেতা যে এমন পর্যায়ের কোনো দায়িত্ব নির্মাণ করেছেন যার মধ্যে কোনো না কোনো প্রকার কষ্ট ও কঠিনতা আছে, এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসের ক্ষেত্রে একে কষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয় না। যেমন জীবিকা অর্জনের জন্য শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে যে নিয়মিত কষ্ট ও মেহনত করা হয় তাকে কষ্ট বলে অভিহিত করা হয় না। কারণ অভ্যাসের ফলে এটা সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভ্যস্ত হওয়ার দরুণ কষ্ট খতম হয়ে যায় না। বরং বুদ্ধিমান ও অভ্যস্ত জনেরা এর মাধ্যমে কুড়েমি দূর হবার কথা বলে থাকে এবং তারা এক্ষেত্রে কুড়েমির জন্য ভর্ৎসনাও করে থাকে। কাজেই এভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা যায়। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে নিছক কষ্ট এবং অভ্যাসের ফলে যাকে কষ্ট বলা হয় না এমন কষ্টের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে[৬৫]।

এর নিয়ম হচ্ছে : কাজটি যদি এমন হয় যে, নিয়মিত চলতে চলতে একদিন বন্ধ হয়ে যায়, অথবা তার অংশবিশেষ বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা মানসিক দ্বিধা ও অর্থনৈতিক অবস্থা বা পরিস্থিতির কারণে ব্যাহত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কষ্টটি অভ্যস্ত হয়ে ওঠা কষ্টের পর্যায়ভুক্ত হবে না। আর যদি তার মধ্যে পারতপক্ষে এসবের কিছুই না থাকে তাহলে কষ্ট অভ্যাসের মধ্যে গণ্যই হবে না। যদি একে কষ্ট নাম দেয়া যায়, তাহলে এ দুনিয়ায় মানুষের খাওয়া, পরা, বসবাস করা এবং জীবন যাপনের সমস্ত অবস্থাই কষ্ট। কিন্তু মানুষকে এসবকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাকে এসব অবস্থার শিকারে পরিণত করা হয়নি। এভাবেই দায়িত্ব সক্রিয় ও বাস্তব রূপ নিয়েছে। কাজেই দায়িত্ব এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট কষ্টও ও ক্লেশের অর্থ বুঝতে হবে।

---

৬৪ আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

৬৫ আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

www.pathagar.com

এ বিষয়টি নির্ণীত হয়ে যাবার পর মানুষের প্রতি নির্ধারিত দায়িত্ব অভ্যস্ত কষ্টের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কাজেই শরিয়াহ প্রণেতার দাবীর উদ্দেশ্য কষ্ট নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দায়িত্বশীলের প্রতি আরোপিত কল্যাণ। মানুষের থেকে সংকীর্ণতা ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে তা এরই সাক্ষ্যবহ[৬৬]।

চতুর্থ ধরনের কষ্টের ক্ষেত্রে বলা যায়, মানুষের প্রবৃত্তি যা চায় তার বিরোধিতা করা এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা তার জন্য কঠিন ও কষ্টকর হয়। এ কারণে প্রবৃত্তির অনুসারীরা অবাধ্যতার চরমে পৌছে যায়। তাদের জন্য এ সাক্ষ্য যথেষ্ট যে, রসুল সা. কে যেসব মুশরিক, আহ্লি কিতাব ও অন্য লোকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনি বহু বছর জীবন অতিবাহিত করেছিলেন কিন্তু তারা তাঁর নিষেধে কর্তপাত করেনি। তারা বহু প্রাণ ও ধন-সম্পদ বিনষ্ট করেছিল কিন্তু নিজেদের প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে রাজি হয়নি। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন :

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছো, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ তায়ালা তা জেনে শুনেই তাকে গোমরাহির মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন[৬৭]।

তিনি আরো বলেন :

إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ

তারা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে[৬৮]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার কাছে তার মন্দ কাজগুলো শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে[৬৯]?

---

[৬৬] প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

[৬৭] সুরা জাসিয়াহ- ২৩ আয়াত।

[৬৮] সুরা আন নাজম- ২৩ আয়াত।

www.pathagar.com

এ ধরনের আরো বিভিন্ন আয়াতে এ কথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

আমরা জানি শরিয়াহ প্রণেতা শরিয়াহর বিধান রচনা করে মানুষকে প্রবৃত্তির অনুগামিতা থেকে বের করে এনেছেন এবং তাকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তায়ালার বান্দায় পরিণত করেছেন যেমন সে বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ তায়ালার বান্দা আছে।

এক্ষেত্রে প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা যেমন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য কষ্ট নয়, যদিও অভ্যাসের দৃষ্টিতে তা কঠিন অনুভূত হয়, তবুও যদি তা বিবেচনাযোগ্য করে শরিয়াহর বিধান হালকা ও সহজ করা হতো তাহলে তা শরিয়াহ প্রণয়নের উদ্দেশ্যকেই বাতিল করে দিতো। কাজেই এটা বাতিল হিসেবে গণ্য। আর যা বাতিলের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাও বাতিল[৭০]।

এ আলোচনার পর আমরা একথা বলতে পারবো যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর শরিয়াহর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি যা পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং যা পালন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যা কিছু দায়িত্ব চাপিয়েছেন তার মধ্যে অবশ্যই কিছু চিরাচরিত কষ্ট আছেই। এই কষ্ট ঐ দায়িত্বের সাথে জড়িত। শরিয়াহ প্রণেতার মৌল উদ্দেশ্য এই কষ্ট নয়। তবে এর মাধ্যমে দায়িত্বশীলের জন্য ইহকালীন বা পরকালীন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্য রয়েছে।

তৃতীয় বিষয়

আহলে সুন্নাত ও মুতাযিলাদের দৃষ্টিতে সৎ গুণ ও অসৎ গুণ কোন্ পর্যায়ভুক্ত?

মুতাযিলারাই এ বিষয়টির অবতারণা করেছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে : সৎ গুণ ও অসৎ গুণ কি কর্মের গুণ বিশেষ, যার ভিত্তিতে শরিয়াহ প্রণেতা একটি করার হুকুম দিয়েছেন এবং অন্যটি নিষিদ্ধ করেছেন? যদি সত্যের মধ্যে সৎ গুণ না থাকতো তাহলে তা করার হুকুম দেয়া হতো না আর যদি মিথ্যার মধ্যে অসৎ গুণ না থাকতো তাহলে তা নিষিদ্ধ করা হতো না। অথবা শরিয়াহ প্রণেতা তাঁর হুকুমের মাধ্যমে সত্যকে সৎ গুণ সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মিথ্যাকে অসৎ গুণ সম্পন্ন করেছেন? তিনি চাইলে এর বিপরীত করতে পারতেন। রসুলদের আগমনের পূর্বে নিছক বুদ্ধিবৃত্তি কি বস্তুর মধ্যে সৎ গুণ ও অসৎ গুণ উপলব্ধি করতে পারতো?

---

[৬৯] মুহাম্মদ- ১৪ আয়াত।

[৭০] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬-১০৯; আল মিরআতুবিহাশিয়াতিল আযমিরী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৪।

www.pathagar.com

ঘটনাক্রমিক অবস্থান

এ ব্যাপারে মুতাযিলা ও আহ্‌লি সুন্নাত একমত হয়েছেন যে, প্রকৃত সত্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তবে এ সঙ্গে এ ব্যাপারেও একমত হয়েছেন যে, সমগ্র কর্ম মূলত ওয়াজিব, মান্‌দূব, মুবাহ, হারাম ও মাকরূহ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। আর সৎ গুণ ও অসৎ গুণ স্বভাবের উপযোগী বা বিরোধী এবং পূর্ণতা ও অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন জ্ঞানের সৌন্দর্য ও মূর্খতার কদর্যতা। এ প্রশ্নে উভয় দলের মধ্যে বিরোধ নেই। এই সঙ্গে তারা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পশুদের কর্মের সাথে সৎ গুণ ও অসৎ গুণের কোনো সম্পৃক্ততা নেই[৭১]।

এরপর ব্যক্তির কাজের সৎ ও অসৎগুণকে তার ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রশ্নে এবং তার মধ্যে যে হুকুম আছে শরিয়াহ বিধৃত হবার পূর্বে কর্মের জন্য সেই ব্যক্তিগত সূচনাবলীর ভিত্তিতে বুদ্ধির তা উপলব্ধি করার ব্যাপারে তারা বিরোধ করেছেন।

মুতাযিলাদের অভিমত

অধিকাংশ মু'তাযিলার মতে, শরিয়াহর আদেশ নিষেধ ছাড়াই কর্ম তার আপন সত্তায় সৎ গুণ ও অসৎ গুণে গুনান্বিত। তাদের মতে, বুদ্ধি একথা বলে যে, অসৎ কাজ যে করে সে নিন্দাবাদের ভাগী হবে। অন্য দিকে সৎ কাজ করলে নিন্দাযোগ্য হবে না। তারপর তাদের মতে, অসৎ মানে হারাম। এ ক্ষেত্রে অসৎ আর সৎ এর মর্যাদার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেউ কোনো কাজ করার পর বুদ্ধি যদি বলে যে, সে প্রশংসার অধিকারী এবং পরিহার করার পর যদি বলে যে, সে নিন্দাবাদের যোগ্য, তাহলে বুঝতে হবে কাজটি ওয়াজিব। অন্যথায় কাজটি করার পর যদি সে শুধুমাত্র প্রশংসার যোগ্য হয় এবং না করলে প্রশংসা ও নিন্দা কিছুরই যোগ্য হয় না, তাহলে কাজটি মুন্‌দূব। আর কাজটি পরিহার করলে যদি সে শুধুমাত্র প্রশংসার যোগ্য হয়, তাহলে কাজটি মাকরূহ অন্যদিকে কাজটি করলে বা না করলে যদি সে নিন্দাবাদ বা প্রশংসার কোনোটারই যোগ্য না হয়, তাহলে কাজটি মুবাহ। বুদ্ধির সম্ভাবনার বিষয়ে তারা বলেন, বুদ্ধি খুঁটিনাটি ও আংশিক বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সমাজের অধিকাংশ জনের লাভ ক্ষতির ভিত্তিতে কোনো কোনো কাজের সামগ্রিক বিধান দিতে সক্ষম হয়। কাজের প্রভাব সমাজের দিকে ধাবিত হয় এবং কর্মগুণের সাথে সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যেমন সৎ গুণের সৌন্দর্য হিসেবে বলা যায় ন্যায় বিচার, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ডুবন্তকে উদ্ধার করা ও দরিদ্রকে সাহায্য করা ইত্যাদি[৭২]।

---

[৭১] আল আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১, জাম্‌উল জাওয়ামে শারবিনীর হাশিয়াসহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩ এবং উসুলুল খিছরী, পৃষ্ঠা ২১।

[৭২] উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ২১-৪২ ।

www.pathagar.com

কোনো কোনো মু'তাযিলীর মতে, কর্মের সাথে যে কারণ সম্পৃক্ত থাকে তাই তাকে সৎ গুণ ও অসৎ গুণসম্পন্ন করে। কারণ খুঁটিনাটি ও আংশিক বিষয়ের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্ভব।

মু'তাযিলীদের মতে শরিয়াহর আদেশ নিষেধসমূহ বিঘোষিত, অনড়ভাবে নির্ধারিত নয়। কাজেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, নামায ওয়াজিব হওয়া ও যিনা হারাম হওয়ার বিষয় দুইটি তাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ গুণের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত, আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে নয়। বরং তারা আদেশ নিষেধের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ ও দৃঢ়ভাবে বলবৎ করে। ফলে কর্মকে যখন তার সম্পাদনকারীর সাথে সম্পর্কিত করে তখন তার অসৎ গুণের প্রচারণা বেড়ে যায় এবং এ জন্য প্রাপ্য শাস্তি বিলম্বিত এবং নিন্দাবাদ দ্রুতগামী হয়।

কাযী আবদুল জাব্বার রা. তাঁর মুগান্নী গ্রন্থে বলেন : প্রত্যেকটি নির্দেশ বুদ্ধি অথবা তার উপার্জনের প্রয়োজন অনুযায়ীই কাজ করতে শেখায়। কাজেই শ্রবণের সাথে তার সম্পর্ক জোড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ শ্রবণ প্রমাণ সাপেক্ষে তার মধ্যেই ফিরে আসে। আর শ্রবণ অনুষ্ঠিত না হলেও যে বিষয়ে জানা নেই তার সাথেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়[৭৩]। বুদ্ধির প্রয়োজন অনুযায়ী জানার মাধ্যমে কল্পনা করা হয়। যেমন ইমানের সুন্দরতা ও কুফরীর কদর্যতা। আবার তার উপার্জন অনুযায়ী জানার মাধ্যমে কল্পনা করা হয়, যেমন ক্ষতিকারক সত্যবাদিতার সুন্দরতা এবং লাভজনক মিথ্যাবাদিতার কদর্যতা। আর শ্রবণ অনুষ্ঠিত না হলেও বুদ্ধি অথবা তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কাজ করতে শেখানো হয় না তাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেমন ইবাদত[৭৪]।

আশ্'আরীদের মতে, উপরোল্লিখিত অর্থে কর্মে সুন্দরতা ও কদর্যতা নেই। বরং কর্মের নিষিদ্ধতাই তার কদর্যতা এবং তার বিপরীতটিই সুন্দরতা। তার নিজের মধ্যে এমন কোনো গুণ নেই যা শরিয়াহ উন্মুক্ত করে দেবে। বরং কর্মগুণ দু'টি শরিয়াহর দ্বারা গুণান্বিত। আর বিষয়টি যদি উল্টে যায় তাহলে সুন্দর কদর্যে এবং কদর্য সুন্দরে পরিণত হবে। তাদের বক্তব্যের সারকথা হলো : শরিয়াহ প্রণেতার আদেশ ও নিষেধ ছাড়া কর্মে সুন্দরতা ও কদর্যতা সৃষ্টি হয় না। তার আপন সত্তায় এ গুণাবলি নেই। বাইরের আরোপিত কোনো বিষয়ও তার মধ্যে এ গুণাবলি সৃষ্টি করে না। তারা বলেন : আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, মু'তাযিলারা সুন্দরতা ও কদর্যতাকে যে অর্থে উপস্থাপন করেছে তা কর্মের মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা

---

৭৩ আল মুগানী, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ১০১ এবং শারহে ইসূলিল খামসা, পৃষ্ঠা ৭১।

৭৪ আল মুনতাহা, ইবনে হাজেব, পৃষ্ঠা ২১।

www.pathagar.com

অর্জনে সক্ষম হয়নি। বরং ব্যক্তি, সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। কাজেই ব্যক্তিগত গুণের কোনো অর্থই নেই। শরিয়াহ প্রণেতা তাঁর হুকুমের মাধ্যমে যাকে ভালো বলেছেন তাই ভালো এবং যাকে মন্দ বলেছেন তাই মন্দ। সেখানে বুদ্ধির কোনো দখল নেই[৭৫]।

যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে সুন্দরতা ও কদর্যতা

কালাম শাস্ত্রে এ আলোচনার শেকড় বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। সেখান থেকে তা উসূল শাস্ত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে। তার ভিত্তিতে উসূলবিদগণ দায়িত্বশীলদের কর্ম এবং তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম জানার পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। এটি তাদের জন্য শরিয়াহর কল্যাণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতবাদের সাথে সম্পর্ক জোড়ারও একটি পদ্ধতি। কর্মের পেছনে রয়েছে তা থেকে কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি দূর করার কার্যকারণ ও উপায় উপকরণ। এখন এই কল্যাণ ও ক্ষতি কি কেবল শরিয়াহর মাধ্যমেই জানা যাবে অথবা বুদ্ধির মাধ্যমেও জানা সম্ভব? সামনের দিকে কল্যাণ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

শরিয়াহর বিধানসমূহ যখন দায়িত্বশীলদের কর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং কর্ম ছাড়া যখন কোনো দায়িত্ব সম্পাদিত হয় না তখন অবশ্যই আমাদের দায়িত্বশীলদের কর্ম ও তার শর্তাবলী আলোচনা করতে হবে।

আমরা বলবো, কর্ম ছাড়া কোনো দায়িত্বের অস্তিত্বই নেই। আদেশের ক্ষেত্রে এটা সুস্পষ্ট। তবে নিষেধের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে ব্যক্তিকে কাজটি থেকে বিরত রাখাই উদ্দেশ্য হয়। আর এটা সম্ভবই হয় না যতক্ষণ না কোনো আহ্বানকারী সেদিকে আহ্বান করে। কাজেই এক্ষেত্রে প্রয়োজনপূর্ণকারী কোনো দায়িত্ব বর্তায় না। শরিয়াহ প্রণেতা যখন বলেন : لا تقربوا الزنى (যিনার ধারে কাছে যেয়ো না) তখন এর অর্থ হয়, তোমার প্রবৃত্তি যদি যিনার প্রত্যাশী হয় তাহলে তাকে তা থেকে বিরত রাখো। কারণ যখন মনের মধ্যে কল্পনাই জাগবে না তখন তা থেকে বিরত থাকার কথা চিন্তা করবে কেমন করে? কাজেই এটি হচ্ছে ঝুলন্ত দায়িত্ব। ফকীহ্গণ দায়িত্ব (تكليف) কে কর্মের সাথে বেঁধে দিয়েছেন। কারণ এটি বান্দার উপার্জন। কাজেই তার ক্ষমতার মধ্যেই এর সীমানা। আর বান্দার উপার্জন না হলে তার ক্ষমতার মধ্যে এটি পড়ে না। কারণ ক্ষমতার কোনো প্রভাব সেখানে পড়ছে না[৭৬]।

---

[৭৫] জামউল জাওয়ামে, শারবিনীর হাশিয়াসহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৯, উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ২৩; আলমিরআতু, আযমিরীর হাশিয়াসহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮২।

[৭৬] উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৯১-৯২।

www.pathagar.com

দায়িত্বের আওতাধীন কর্মের মধ্যে বিভিন্ন শর্ত থাকে।

প্রথম শর্ত : কর্ম সঠিকভাবে সংঘটিত হতে হবে। একমাত্র অস্তিত্বহীন আদেশ ছাড়া এমন কোনো আদেশ নেই যার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় শর্ত : বান্দার তা উপার্জন করার বৈধতা ও ইখতিয়ার থাকতে হবে। যেমন যায়েদ চিঠি লিখতে ও পোশাক তৈরি করতে পারে। কিন্তু উমরের কাছে যায়েদের চিঠি লেখা এবং উমরের পোশাক তৈরি করা যায়েদের জন্য বৈধ করা হয়নি। ফলে সংঘটিত হবার সম্ভাবনার সাথে সাথে যে সম্পাদন করবে তার ক্ষমতার মধ্যেও তাকে আনতে হবে।

তৃতীয় শর্ত : যাকে আদেশ করা হয় তার জন্য কাজটি জ্ঞাত এবং অন্যান্য কাজ থেকে পৃথক হতে হবে, যাতে সে সেই কাজটি করার সংকল্প করতে পারে।

চতুর্থ শর্ত : কাজটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আদেশ করা হয়েছে, এ বিষয়টিও জ্ঞাত হতে হবে, যাতে আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। যেসব আদেশের মধ্যে আনুগত্য ও নৈকট্যের অপরিহার্য বিধান আছে সেগুলোর সাথে এটি সংশ্লিষ্ট। এখানে জ্ঞাত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের সম্ভাবনা, সীমানা ও সামর্থ্য পর্যন্ত জানার বিস্তৃতি। কাজেই একথা বলা যাবে না যে, কাফেরকে ইমান আনার আদেশ করা হয়েছে কিন্তু সে একথা জানে না। কারণ দাওয়াত পৌঁছে যাওয়ার পর সেটি জানার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তখন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং কর্মের সম্ভাবনা অর্জিত হয়।

পঞ্চম শর্ত : কাজটি বাদ দেয়ার সংকল্প হতে হবে আনুগত্যের ভিত্তিতে। আর অধিকাংশ অভ্যাসের সাথে এগুলো সংশ্লিষ্ট। তবে দু'টি জিনিস এর ব্যতিক্রম। এর একটি হচ্ছে : প্রথম ওয়াজিব অর্থাৎ ওয়াজিবের মধ্যে এক নজরে পরিচিত। এক্ষেত্রে আনুগত্যের ভিত্তিতে বাদ দেয়ার সংকল্প সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে : আনুগত্য ও আন্তরিকতার সংকল্পের মৌলিকত্ব। এক্ষেত্রে যদি সংকল্পের অভাব অনুভব করা হয় তাহলে এক সংকল্প অভাব অনুভব করবে আর এক সংকল্পের এবং এভাবে এর অশেষ ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে[৭৭]।

উসূলবিদগণ এ শর্তাবলীর প্রশ্নে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করবো।

---

[৭৭] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৪ এবং উসূলুল খিদরী, ৮২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়

ইসলামি শরিয়াহর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামি শরিয়াহর কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো অন্যান্য শরিয়াহ থেকে তাকে পৃথক করে দিয়েছে। ইসলামি শরিয়াহ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। পৃথিবীতে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এ জীবনবিধানও প্রচলিত থাকবে। শরিয়াহ ব্যবস্থার এ বৈশিষ্ট্যগুলো দায়িত্ব এবং স্থান ও কাল ভেদে ব্যাপক হয়ে থাকে। কখনো এ বৈশিষ্ট্যগুলো স্থবিরতা ও নমনীয়তার মাঝামাঝি অবস্থান করে। আবার কখনো দ্বীন এবং ব্যক্তি, সমাজ ও দুনিয়ার কল্যাণার্থে এগুলো বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। কখনো এগুলো আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ইমানের প্রতিবন্ধকের সাথে আচরণ বিধি নির্ণয় করে। আবার কখনো শরিয়াহর উৎসকে বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে রক্ষা করে।

১ম বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর ব্যাপকতা

দায়িত্বশীলদের প্রেক্ষিতে শরিয়াহর বিধান ব্যাপকতর তথা সবার জন্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ দায়িত্বের শর্ত যেখানে উপস্থিত থাকে সেখানে আল্লাহ তায়ালার কোনো বিধান অন্যদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র একজন দায়িত্বশীলকে বিশেষভাবে আহ্বান করে না। এই বিধানের আওতাধীন করা থেকে কোনো একজন দায়িত্বশীলকেও বাদ দেয় না। কয়েকটি বিষয় এদিকে ইঙ্গিত করে।

প্রথম বিষয় : পরস্পর সাহায্যকারী নস্। যেমন- আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً

> (হে মুহাম্মদ সা.!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে[৭৮]।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً

> (হে মুহাম্মদ সা.!) বলে দাও, হে মানবজাতি! আমি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের সবার কাছে প্রেরিত হয়েছি[৭৯]।

রসুল সা. বলেছেন :

---

[৭৮] সুরা আস সাবা- ২৮ আয়াত।

[৭৯] সুরা আল আরাফ- ১৫৮ আয়াত।

www.pathagar.com

بعثت إلى الأحمر والأسود

আমাকে লাল কালো নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির কাছে পাঠানো হয়েছে[৮০]।

উল্লেখিত নস্গুলো এদিকে ইঙ্গিত করে যে, নবি সা.-এর নবুওয়াত সাধারণভাবে সবার জন্য, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয়। কারণ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য হলে সেক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হবার কথা বলা হতো না। যদি নবির বিশেষ বিধানের দায় এক ব্যক্তির ওপর না পড়ে, যেহেতু নবি তার জন্য প্রেরিত হননি, তাহলে এ বিধানকে সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রেরিত বলা হতো না। কাজেই এ বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তায়ালার বাণী থেকেও এর ব্যাপকতা প্রমাণ হয় :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

হে রসুল! তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দাও[৮১]।

এ আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, রসুল সা.-এর প্রতি নাযিলকৃত সমগ্র শরিয়াহ সকল মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া ওয়াজিব। প্রথম দুটি আয়াত ও হাদিসটি প্রকাশ করে যে, রসুল সা.-এর আগমন সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং এ আয়াতটি থেকে প্রমাণ হয় যে, তাঁর দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির জন্য[৮২]।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে : আল্লাহ তায়ালার বিধানসমূহ মানুষের কল্যাণার্থে রচিত হয়েছে। কাজেই কল্যাণের চাহিদার দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। কারণ মানব সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে অভিন্নতা আছে সেই অনুযায়ীই সেগুলো তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো যদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হতো তাহলে সাধারণভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য সেগুলো ব্যবহৃত হতো না। রসুল সা. যদি কোনো বিষয়কে বিশিষ্টতা দিয়ে থাকেন তাহলে তারই ভিত্তিতে কোনো বিষয়কে বিশিষ্ট করা ছাড়া আর কোনো কিছুই এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। অথবা তাঁর কোনো সাহাবাকে যদি কোনো বিষয়ে বিশিষ্টতা দান করা হয়ে থাকে, যেমন

---

[৮০] বুখারি, মুসলিম ও তিরমিযী।

[৮১] সুরা আল মায়েদা- ৬৭ আয়াত।

[৮২] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৬ এবং ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৫।

www.pathagar.com

খুযাইমা রা.-এর সাক্ষ্য এবং আবু বুরদা রা.-এর যবেহকৃত ছাগীর অঙ্গসমূহ। ইমামুল হারামাইন[৮৩] বলেছেন : বিশেষ বিধান সাধারণ বিধানের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো বিপুলের মধ্যে সামান্য। তারপর প্রত্যেক প্রকার মানুষের মধ্যে বিশিষ্টতার ভিত্তিতে শ্রেণিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে মেয়েরা পুরুষদের বিধান থেকে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, মুসাফিররা মুকীমদের বিধান থেকে বিশেষত্ব লাভ করেছে এবং এভাবে দায়িত্বশীলদের মধ্যে আরো বহু দল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে[৮৪]।

নবি সা.-এর হাদিসের মাধ্যমে কোনো কোনো সাহাবাকে যে বিশিষ্টতা দান করা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পর্কিত প্রমাণ ও ঘোষণা রয়েছে যে, শরিয়াহর বিধানসমূহ বিশিষ্ট আইন থেকে মুক্ত।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে : সাহাবা, তাবেয়ী ও পরবর্তীকালের ফকীহগণের ইজ্‌মা। এ জন্য রসুল সা.-এর কার্যাবলিকে তাঁরা সমধর্মী সকল বিষয়ের জন্য গ্রহণীয় প্রমাণে পরিণত করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সাথে যে বিধানগুলো জড়িত সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণভাবে অপ্রকাশ্য সাধারণ বিষয়াবলীর ওপর এগুলো জারী করায় কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ

তারপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম। যাতে মুমিনদের জন্য তাতে কোনো বিঘ্ন না থাকে[৮৫]।

এখানে ব্যক্তি বিশেষের ওপর হুকুম প্রতিষ্ঠিত করে তার মাধ্যমে তাকে জারী করা হয় সর্বসাধারণের জন্য[৮৬]।

---

[৮৩] তার মূল নাম হচ্ছে; আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ আল জাওয়িনী আবুল মাআলী। তিনি শাফেয়ী মযহাবের পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠতম ইমাম। নিশাপুরের উপকণ্ঠে জাওয়িনে তাঁর জন্ম হয়। সেখান থেকে তিনি বাগদাদে চলে আসেন এবং তারপর সেখান থেকে মক্কায় এবং তারপর মদীনায় গিয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ফাতোয়া দেবার দায়িত্বও পালন করেন। তারপর নিশাপুরে ফিরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুল্‌ক তাঁর জন্য তৈরি করেন মাদ্রাসা নিযামিয়া। ৪৭৮ হিজরিতে তিনি নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৭।

[৮৪] দ্রষ্টব্য জামে আযহার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত দালিল পত্রাদি, ৯১৩ নম্বর দলিল।

[৮৫] সুরা আল আহযাব, ৩৭ আয়াত।

[৮৬] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭।

www.pathagar.com

চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে : কোনো কোনো হুকুম যদি ব্যক্তি বিশেষকে দেয়া যায়, যার ফলে বিশেষ কিছু লোক তার আওতার বাইরে চলে যায়, তাহলে শরিয়াহর-নিয়ম কানুনের ক্ষেত্রেও এ ধরনের বিষয় জায়েয হবে। এক্ষেত্রে দায়িত্বের শর্তাবলী যার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে এমন কারোর প্রতি এই হুকুম জারী করা যাবে না। সমস্ত বিষয়ের মূল যে ইমান তার ব্যাপারেও একই কথা। অথচ এটি সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। অর্থাৎ শরিয়াহর বিধান যার মধ্যে দায়িত্বের শর্তাবলী পূর্ণতা লাভ করেছে এমন সবার জন্য। স্থানকালের ভিত্তিতে তার ব্যাপকতা অত্যাবশ্যকীয় হয়[৮৭]।

কারণ যদি এমনটি না হতো, তাহলে রসুল সা.-এর সামনে যে সকল সাহাবা রা. ছিলেন তাদের প্রজন্মের ওপর কুরআন বা সুন্নাহর বিধান জারী হতে পারতো না। এগুলো হিজাজবাসীদের উপরও জারী হতে পারতো না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো মুসলিম আলেমও একথা বলেননি। এভাবে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক দায়িত্বশীলের উপর শরিয়াহর বিধান জারী হবে। প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে জারী হবে। এটিই কাঙ্ক্ষিত। এ বৈশিষ্ট্যটি কিয়াস অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ নবি সা.-এর যুগে কিছু লোককে বিশেষভাবে সম্বোধন করা বা কিছু লোকের জন্য বিশেষ হুকুম জারী করার অনেক ঘটনা ঘটেছে। সে ঘটনাগুলোকে সর্বসাধারণের জন্য ব্যাপক করার কোনো প্রমাণও সেখানে পাওয়া যায় না। কাজেই একথা ঠিক নয় যে, শরিয়াহ সর্বজনীনতার ভিত্তিতে রচিত তবে তার মধ্যে কিছু ঘটনাকে বিশিষ্টতা দান করা হয়েছে যদিও তা উদ্দেশ্য নয় এবং সেখানে অনুল্লেখকে উল্লেখের সাথে যুক্ত করেছে এমন একটি নির্ভরযোগ্য শব্দও পাওয়া যাবে না। এ থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক ঘটনার আভ্যন্তরীণ অর্থ তার সাথে অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। আর এটিই হয় কিয়াসের অর্থ। সাহাবা রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিমের কার্যক্রম এ বক্তব্যেরই সমর্থক[৮৮]।

২য় বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর বিধানসমূহ স্থবিরতা ও নমনীয়তার মাঝামাঝি অবস্থান করে

শরিয়াহর বিধানসমূহ দুইভাগে বিভক্ত। এক ধরনের বিধানে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বা সংকোচন নেই, এগুলো স্থির ও দৃঢ়বদ্ধ। স্থান-কালের পরিবর্তন তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। আর এক ধরনের বিধান আছে যেগুলো স্থান-কাল-অবস্থান-পরিস্থিতি-পরিবেশের প্রভাবাধীন হয়। প্রচলন ও অভ্যাসের

---

[৮৭] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৭।

[৮৮] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৮।

www.pathagar.com

পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানবতার কল্যাণের প্রেক্ষিতে শরিয়াহর মূলনীতি ও মৌলিক বিধানকে অটুট রেখে তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়।

ইমাম ইবনে কাইয়িম রহ. তাঁর ইগাছাতুল লাহ্ফান গ্রন্থে লিখেছেন : শরিয়াহর বিধান দুই প্রকারের। এক প্রকারের বিধান সবসময় একই অবস্থায় থাকে। স্থান ও কালের পরিবর্তনে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। ইমামগণের ইজতিহাদও তার মধ্যে পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা রাখে না। যেমন ফরয, ওয়াজিব, হারাম, শরিয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধ দণ্ডবিধি এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন বিষয়। যেগুলোর জন্য এগুলো রচিত হয়েছে ইজতিহাদ করে সেগুলোর বিরুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। দ্বিতীয় ধরনের বিধান স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে মানবতার কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন অনুমান ভিত্তিক পরিমাপ ও তার গুণাবলি। অবশ্যই শরিয়াহ প্রণেতা নিজেই প্রয়োজন অনুযায়ী তার মধ্যে বৈচিত্র সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চতুর্থ দফায় শরাব পান করার পর পানকারীকে হত্যার বিধান দিয়েছেন। আর নামাযের জামায়াতে না আসার কারণে ঘরবাড়ি পোড়াবার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যদি বাড়িতে স্ত্রী ও সন্তানাদি না থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সময় অর্থদণ্ডের বিধান দিয়েছেন[৮৯]।

চাল-চলন ও রীতি-নীতির বিভিন্নতার ফলে প্রয়োজন ও লক্ষ্যও বিভিন্ন হয়ে যায়। কাজেই বিধানের শর্তাদিও বিভিন্ন হয়ে যায়। আর রীতি-নীতির ক্ষেত্রে বিধান বিভিন্ন হয়ে গেলে মূলত : দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। কারণ দুনিয়ার জীবন ও দায়িত্ব যদিও অনন্তকালীন নয় তবুও শরিয়াহর বিধান রচিত হয়েছে চিরস্থায়ীভাবে। তাই শরিয়াহ আরো কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। তাই এক্ষেত্রে বিভিন্নতার অর্থ হচ্ছে, রীতি-নীতি যখন বিভিন্ন হয়ে যায় তখন প্রত্যেকটি রীতিই শরিয়াহর মূলের দিকে ফিরে আসে এবং শরিয়াহর হুকুম নিজের ওপর আরোপ করে নেয় এই যুক্তিতে যে, কোনো রীতি শরিয়াহর মূলনীতি থেকে আলাদা হয়ে গেলে শরিয়াহর দৃষ্টিতে তার কোনো মূল্য থাকে না।

অনুরূপ সাবালক হয়ে যাবার ক্ষেত্রেও। যেমন শিশুকে দায়িত্ব মুক্ত রাখা হয়েছে। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। সাবালক হওয়ার সাথে সাথেই তার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সাবালক হওয়ার পূর্বে দায়িত্ব মুক্ত রাখা এবং তারপর সাবালক হওয়ার পরই দায়িত্ব অর্পিত হওয়া, এর কারণ দায়িত্ব আরোপ করার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা নয়। বরং এ বিভিন্নতা এসেছে রীতিনীতি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বিয়ের পর স্ত্রী সংগমের পরের বিধানের

---

[৮৯] ইসাছাতুল লাহফান নাকলান আন তা'লীলিল আহকাম, মুহাম্মদ শালবী, পৃষ্ঠা ৩১৯-৩২০।

www.pathagar.com

ব্যাপারেও একই কথা। এক্ষেত্রে মোহরানা না দেবার ব্যাপারে স্বামীর কথাই গ্রাহ্য হবে এবং এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে রীতি রেওয়াজের ওপর। আবার রীতি-নীতির পরিবর্তনও হয়। সেক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য হবে[৮০]।

এই ধরনের বিধান যাতে আপাত দৃষ্টিতে পরিবর্তন গৃহীত হয়, এগুলো শরিয়াহর বিধান এবং তার অবিভাজ্য অংশ। এগুলো শরিয়াহর বিরাট স্তম্ভ। এই বিধানগুলোর কোনো কোনোটির ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তিত হওয়া এগুলোকে শরিয়াহ থেকে আলাদা করে দেয় না বরং এর মাধ্যমে শরিয়াহর মধ্যে ইজতিহাদ ও উদ্ভাবন করার বৈধতার প্রমাণ পেশ করে।

এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়াহ প্রত্যেকটি নতুন ঘটনাকে এবং প্রত্যেকটি ঘটনাকে এবং প্রত্যেকটি ঘটনা যা প্রচলনে ও সত্যনিষ্ঠদের রীতি-রেওয়াজে পরিবর্তন সূচিত করে, তাকে শরিয়াহর অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই শরিয়াহকে কেউ স্থবির বা ত্রুটিপূর্ণ বলতে পারবে না। তবে আল্লাহ তায়ালা যাদের চোখ ও দৃষ্টিকে মূর্খতার অন্ধকারে বা বক্রতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছেন একমাত্র তারাই এ ধারণা পোষণ করতে পারে।

৩য় বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর বিধানসমূহ সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে ও কল্যাণার্থে সুবিধা প্রদান করে

ইসলামি শরিয়াহর বিধানসমূহ সকল প্রকার ইহকালীন, পরকালীন, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। শরিয়াহ এমন কোনো দুনিয়ার পরিচয় দেয় না যার সম্পর্ক আখেরাতের সাথে নেই এবং এমন কোনো আখেরাতের পরিচয় দেয় না যার সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে নেই। অন্য দিকে এমন কোনো সমষ্টির পরিচয় দেয়নি যার সম্পর্ক ব্যষ্টির সাথে নেই এবং এমন কোনো ব্যষ্টির পরিচয় দেয়নি যার সম্পর্ক সমষ্টির সাথে নেই। ব্যষ্টি ও ব্যক্তি হচ্ছে অংশ ও অঙ্গ এবং সমষ্টি ও সমাজ হচ্ছে সমগ্র ও দেহ। ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেকেই নিজেদের প্রয়োজন পূরণে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এ অবস্থায় শরিয়াহ প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধণের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের পদ্ধতি অবলম্বন করে। আর প্রয়োজন ও কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্যে পৌছার পথ হচ্ছে ন্যায়নীতি, সমতা, মিতাচার ও মধ্যম পন্থা। এ হচ্ছে তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে শরিয়াহর আলেমগণ সাধারণ অভিভাবকত্বকে অপরিহার্য গণ্য করেছেন। কারণ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা, অধিকার আদায় এবং সংঘটিত ও আসন্ন জুলুম প্রতিরোধ করা।

---

৮০ আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৫।

www.pathagar.com

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের উৎস বর্ণনা করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো। আর দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না[৯১]।

কাতাদা রহ. বলেন : এর অর্থ হচ্ছে দুনিয়া থেকে হালাল রুজি আহরণ করার ক্ষেত্রে তোমার অংশ বিনষ্ট কর না। তোমার চাহিদা তুমি নিজেই পূর্ণ করবে এবং তোমার দুনিয়ার ফলাফলের প্রতি তুমি দৃষ্টি রাখবে। ইবনে উমর রা. বলেন : তোমার দুনিয়ার জন্য এমনভাবে জমি কর্ষণ কর যেন মনে হবে তুমি চিরকাল জীবন-যাপন করবে
এবং তোমার আখেরাতের জন্য এমনভাবে কাজ কর যেন মনে হবে তুমি আগামী কালই মারা যাবে[৯২]।

দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে শরিয়াহ যা কামনা করে তার রূপরেখা এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে। মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের স্বার্থে তার দুনিয়ার কল্যাণের সাথে আখেরাতের কল্যাণকে সংযুক্ত করার জন্য এবং সৎকাজে ও আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে চলার কাজে দ্রুত অগ্রসর হবার ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এ দু'টিই অপরিহার্য। এতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের লাভ। কারণ অস্থায়ী কল্যাণের ওপর স্থায়ী কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়ার ফলে মানুষের স্বার্থ চিন্তা ও দুনিয়া প্রীতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আখেরাতের কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সে ত্যাগ স্বীকার করতে ও অন্যদেরকে তাতে শরীক করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

অতঃপর কিছু নিয়ম-কানুন ব্যক্তি ও সমাজের এই কল্যাণগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। সেগুলো নিম্নরূপ : যাকে আত্মকল্যাণ সাধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অন্য কেউ তার জন্য এই কল্যাণগুলো প্রতিষ্ঠিত করে দেবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা রাখে তাকে তা অর্জন করিয়ে দেবার দায়িত্ব অন্য কারোর ওপর অর্পিত হয়নি। যে দায়িত্বশীলের কল্যাণ অন্যের সাথে জড়িত, বিনা কষ্টে যদি সে তা অর্জন করার ক্ষমতা রাখে তাহলে অন্যের তাকে সহায়তা করার কোনো দায়িত্ব নেই। আর যদি সে তা অর্জনে অক্ষম হয় এবং তা বিশেষ অগ্রবর্তী কল্যাণ হয় যা তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে এবং এক্ষেত্রে অন্যের কল্যাণ যদি সাধারণ ও ব্যাপকধর্মী

---

[৯১] সুরা আল কাসাস, ৭৭ আয়াত।

[৯২] তাফসীর আলকুরতুবী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ২১৪।

www.pathagar.com

হয় তাহলেও যাদের সাথে এ কল্যাণের সম্পর্ক রয়েছে এ কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এর ফলে তাদের মূল কল্যাণ তার সমান বা তার চেয়ে বেশি কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। পূর্ণ ও আংশিক বিষয়ের কল্যাণ প্রসঙ্গে সামনের দিকে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে[৮৩]।

ইসলামি শরিয়াহ দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার কল্যাণকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। কারণ শরিয়াহ রচিত হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তার রচয়িতা হচ্ছেন তাদের স্রষ্টা ও রব। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন তাদের অবস্থা এবং তাদের কল্যাণ কিসে হয়। অন্যদিকে মানবরচিত আইন কেবলমাত্র দুনিয়ার কল্যাণের প্রতি নজর রাখে এবং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করারও ক্ষমতা রাখে না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : দ্বীনের প্রতিবন্ধকের সাথে আচরণবিধি নির্ণয় করা

ইসলামি শরিয়াহ আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ইমানের প্রতিবন্ধকের সাথে আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের তৈরি দুনিয়ার অন্যান্য আইন ব্যবস্থার মতো ইসলামি শরিয়াহরও একটি পার্থিব বিধি-ব্যবস্থা আছে। শরিয়াহর আহকামের যে বিরোধিতা করে তাকে দমন ও তার শাস্তির ব্যবস্থা এর মাধ্যমে করা হয়। ইসলামি শরিয়াহ এদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধানকারী যিনি সর্বজ্ঞ এবং চোখের অপব্যবহার ও হৃদয়ে যা কিছু গোপন আছে সে সম্পর্কেও যিনি সঠিক খবর রাখেন, উপরন্তু যিনি সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন, তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক। কাজেই শরিয়াহর বিধানের বিরোধিতা করে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে সে দুনিয়ার পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পারে। দুনিয়ার হিসাব ও শাস্তির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পাকড়াও থেকে তার কোনো অবস্থাতেই মুক্তি নেই। সব কিছুই সে তার সামনেই দেখতে পাবে একটি কিতাবে উন্মুক্ত আকারে। তা ছোট বড় কিছুই বাদ দেবে না বরং তার সমস্ত হিসাব রাখবে[৮৪]।

আল্লাহ তায়ালার পাকড়াও ও শাস্তি থেকে কারোর রেহাই নেই। এদিকে ইঙ্গিত করে রসুল সা. বলেছেন : অবশ্যই আমি একজন মানুষ আর তোমরা অনেক সময় আমার কাছে আসো ঝগড়া বিবাদ নিয়ে। তোমাদের কেউ কেউ সম্ভবত অন্যের তুলনায় সুন্দর করে আলঙ্কারিক ভাষায় নিজের বক্তব্য পেশ করো। আমি যেভাবে

---

[৮৩] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৪-৩৬৭।

[৮৪] নাসের, ইনসাইক্লোপিডিয়া, ইসলামি ফিক্‌হ সংক্রান্ত।

www.pathagar.com

শুনি তেমনি ফায়সালা দিয়ে দেই। এক্ষেত্রে তোমাদের ভাইয়ের ন্যায্য পাওনার বিরুদ্ধে যদি আমি কোনো ফায়সালা দিয়ে দেই তাহলে তা গ্রহণ করো না। যে তা গ্রহণ করবে আমি যেন তার জন্য জাহান্নামের একটি অংশের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলাম[৯৫]।

মানুষ মানুষের পাকড়াও এড়াতে পারলেও আল্লাহ তায়ালার পাকড়াও এড়াতে পারবে না, এ হাদিসটি তার একটি প্রমাণ। আর যে ব্যক্তি অন্যায় বিরোধ করে বাহ্যত অন্যের কিছু অংশ খসিয়ে নেবে মূলত, পর্দার আড়ালে তা তার জন্য হারাম হবে এবং সে আযাবের ভাগীদার হবে। কারণ তার অন্তর গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। ইসলামি শরিয়াহর এ বৈশিষ্ট্যই শরিয়াহর আইন ও মানুষের তৈরি আইনের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। শরিয়াহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ হিসেবে দেখা দেয়। এ কার্যকারণ মানুষের তৈরি আইনের ক্ষেত্রেও দেখা দেয়, কিন্তু সত্য দ্বীনের দিক নির্দেশনা ছাড়া অন্য কিছুতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে না। আর এ দিক নির্দেশনাই একমাত্র মেনে চলার যোগ্য। এখানে সামনে পেছনে কোথাও থেকে বাতিল ও অন্যায়ের অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই।

৫ম বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর উৎসকে বিকৃতি ও পরিবর্তন মুক্ত রাখা

এ মুবারক শরিয়াহকে বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করেছেন। রসুল সা.-এর জামানা থেকে আজ পর্যন্ত রক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। এর দু'টি পদ্ধতি আমাদের চোখে সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে :

প্রথম পদ্ধতি : দ্ব্যর্থহীন ও দূরবর্তী ইশারার মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাজতকারী[৯৬]।

كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ

এই কিতাবের আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে[৯৭]।

---

[৯৫] উম্মে সালামা রা. থেকে একদল বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেছেন, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৮৮।

[৯৬] সুরা আল হিজর- ৯ আয়াত।

[৯৭] সুরা হুদ- ১ আয়াত।

www.pathagar.com

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না, সামনে থেকেও না এবং পেছন থেকেও না। এটি প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অবতীর্ণ[৯৮]।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমার পূর্বে আমি যেসব রসুল বা নবি পাঠিয়েছি তাদের কেউ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষেপ করে আল্লাহ তায়ালা তা বিদূরিত করেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী[৯৯]।

এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর আয়াতসমূহ তিনিই সংরক্ষণ করবেন। তিনিই সেগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তার সাথে অন্য কিছু মিশিয়ে ফেলতে দেবেন না। তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন করতেও দেবেন না। আর রসুল সা.-এর সুন্নাত কুরআনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। কুরআনের চতুস্পার্শ্বেই তার আবর্তন এবং কুরআনের অর্থের মধ্যে তা প্রত্যাগমন করে। কুরআন ও সুন্নাহ পরস্পরকে সাহায্য করে এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম[১০০]।

কুরআন ও সুন্নাহ, এ দুটি হচ্ছে দ্বীনের উৎস। এ দুটির মাধ্যমে দ্বীনের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখাসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যেভাবে বিকৃতি সাধিত হয়েছে কুরআনে তেমন বিকৃতির কোনো পথ নেই। সেগুলো বিকৃত হয়েছে কিন্তু কুরআন এ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এর মধ্যে একটি হরফ বা শব্দ বাড়ানো বা কমানের ক্ষমতা কোনো মানুষের বা জিনের নেই। আল্লাহ তায়ালা এর

---

৯৮ সুরা ফুসসিলাত, ৪২ আয়াত।

৯৯ সুরা আল হাজ্জ, ৫২ আয়াত।

১০০ সুরা আল মায়েদা, ৩ আয়াত।

www.pathagar.com

সংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, কেউ যদি এর মধ্যে একটু সামান্য কিছু পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালায় তাহলে আরব থেকে আজম পর্যন্ত বিস্তৃত সারা বিশ্বের হাজারো লাখো শিশুরাই (অর্থাৎ, হাফেযে কুরআন) একে বানচাল করে দেবে। প্রবীন ও প্রখ্যাতদের প্রয়োজন পড়বে না।

জনৈক আলেমকে জিজ্ঞেস করা হলো, তওরাতের অনুসারীদের জন্য তার মধ্যে পরিবর্তন আনা কেমন করে বৈধ হলো অথচ কুরআনের অনুসারীদের জন্য তা বৈধ হলো না কেন? জবাবে তিনি বললেন : এর কারণ আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলেছেন :

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ

কারণ তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল[১০১]।

তওরাত সংরক্ষণের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পন করা হয়েছিল এবং তারা তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছিল। অন্যদিকে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী[১০২]।

এখানে কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন, কাজেই এর মধ্যে পরিবর্তন আনার কোনো পথই নেই।

যুগের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারবিদ সাহিত্যিকগণ এর একটি সুরার অনুরূপ বাক্যাবলী রচনা করতেও অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। শয়তানদেরকে আড়ি পেতে শোনা থেকেও বিরত রাখা হয়েছে। এ সবই এর সংরক্ষণের সাথে সংরক্ষিত। কিয়ামত পর্যন্ত এ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে শরিয়াহকে রক্ষা করার ভাবধারাও এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : রসুল সা.-এর জামানা থেকেই একটি সাক্ষ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হয়ে গেছে। উম্মতের জন্য শরিয়াহর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত শক্ত ভিত্তিতে তৈরি করে দিয়েছেন। সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে এ প্রতিরক্ষা হচ্ছে : আল্লাহ তায়ালা পূর্ব থেকেই কুরআন কণ্ঠস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন। সারা দুনিয়ার সব দেশের মুসলমানদের মধ্যে এর প্রচলন হয়েছে। বড় ছোট নির্বিশেষে সব বয়সের লোকই কুরআন হিফ্য করেছে। কুরআনের ভিত্তিতে যে শরিয়াহ রচিত হয়েছে তা অধ্যয়ন করার জন্য বিভিন্ন লোক এগিয়ে এসেছে এবং তারা সেগুলো

---

[১০১] সুরা আল মায়েদা, ৪৪ আয়াত।

[১০২] সুরা নাহল- ৯ আয়াত, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯, কুরতুবী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৬০৫ এবং হাশিয়াতুল জামাল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬০৬।

www.pathagar.com

কণ্ঠস্থ ও আত্মস্থ করেছে। প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক লোক আরবি ভাষা, সাহিত্য ও জ্ঞান অধ্যয়ন ও চর্চা করে চলেছে। অনুরূপভাবে একদল লোক কুরআন ও হাদিসের ভাষা ও জ্ঞান অধ্যয়ন করে শব্দ ও অর্থের দুর্বলতা তার মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি। আর আরবি ভাষা জানা শরিয়াহর জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাবি। কারণ আল্লাহ তায়ালা আরবি ভাষায় এ জ্ঞান তাঁর রসুল সা.-এর কাছে ওহি করেছেন।

তারপর আল্লাহ তায়ালা একদল গবেষক ও ভাষাবিদ নিয়োগ করেছেন। তারা এর সমস্ত বাক্যের ও শব্দের ব্যাকরণ ভিত্তিক আক্ষরিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব ও রসুল সা.-এর সুন্নাতের জ্ঞান আহরণ সহজ করে দিয়েছেন। তারপর একদল লোক নিয়োগ করেছেন, তাঁরা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে হাদিসের নির্ভুলতা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করেছেন। বর্ণনা পরম্পরার দিক দিয়ে তাঁরা একান্ত নির্ভরযোগ্য, সৎকর্মশীল ও সত্যবাদী বর্ণনাকারীর ভিত্তিতে হাদিসগুলোর নির্ভুলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন। কে কার কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন ও গ্রহণ করেছেন তার সন, তারিখ ও সময় সনাক্ত করেছেন এবং এভাবে হাদিসের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এগুলো ছাড়াও বিদআতী, অবিশ্বাসী, নাস্তিক ও সত্যভ্রষ্ট কামনার পূজারীদের চক্রান্তের হাত থেকেও আল্লাহ তায়ালা একে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর একদল সৈনিক তৈরি করেছেন। তারা আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও তাঁর রসুল সা.-এর সুন্নাত হৃদয়ঙ্গম করেছেন। কুরআনে ও সুন্নাতে শরিয়াহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয় করে তার অর্থ অনুধাবন করেছেন এবং তার ভিত্তিতে সেখান থেকে বিস্তারিত বিধান উদ্ভাবন করেছেন- কখনো আল্লাহ তায়ালা ও রসুল সা.-এর বাণীর নিষেধাজ্ঞা থেকে, কখনো তার অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে, আবার কখনো হুকুমের কার্যকারণ থেকে। ঘটনাবলীকে তারা এমনভাবে সন্নিবেশিত করেছেন যার ফলে যার মধ্যে কোনো নসের হুকুম পাওয়া গেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। এভাবে পরবর্তীকালে আগতদের জন্য এ পদ্ধতিকে সহজ করে গেছেন। অনুরূপভাবে তারা শরিয়াহর জ্ঞানের যথার্থ অনুধাবন ও অনুশীলন যে সমস্ত ইল্‌ম ও শাস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল তার প্রত্যেকটির মধ্যে এ পদ্ধতি জারী করেছেন। এমনকি আরবি হস্তলিপিবিদ্যা যা শরিয়াহর ইল্‌ম প্রকাশে সহায়তা করে তাকেও এভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন[১০৩]।

---

[১০৩] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৯; মুস্তাফা সাব্বায়ী লিখিত আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী, পৃষ্ঠা ৮৯।

www.pathagar.com

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়

ইসলামি শরিয়াহর উৎসসমূহ অথবা বিধানাবলীর যুক্তির ভিত্তি

নবি সা.-এর জামানায় তাঁর প্রতি কুরআনের যে ওহি নাযিল হতো তা তিনি সাহাবাগণের সামনে পেশ করতেন। তারপর তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে তাঁদের সামনে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। এসব কিছুই তিনি সামনাসামনি ও প্রত্যক্ষভাবেই করতেন। এক্ষেত্রে মাঝখানে কারোর অনুবাদ, চিন্তা-গবেষণা বা কিয়াস করার প্রয়োজন ছিল না।

তাঁর ইন্তিকালের পর এই সরাসরি ও সামনা-সামনি বিধান নাযিল হওয়ার সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর আগেই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং আল্লাহ তায়ালার বাণী কুরআন ব্যক্তি পরম্পরায় কণ্ঠস্থ হয়ে মুসলমানদের স্মৃতিতে[১০৪] সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল[১০৫]।

আর রসুল সা.-এর সুন্নাত তাঁর কথা, কাজ বা অনুমোদন হিসেবে সম্ভাব্য সর্বাধিক নির্ভুলতা সহকারে যেভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে সাহাবাগণ একমত হয়েছেন।

এ দৃষ্টিতে কুরআনে ও সুন্নাতে শরিয়াহর বিধানের পথ নির্দেশনা নির্ধারিত হয়েছে। তারপর উভয়কে তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে একত্র করা হয়েছে। কঠিন বিষয়গুলোর ওপর মতবিরোধ সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো সব নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। কারণ তারা অকাট্য প্রমাণ এবং একটি জনসমষ্টির অঙ্গীকার ভিত্তিক সাক্ষ্য ছাড়া কোনো বিষয়ে একমত হননি। কাজেই শরিয়াহর মধ্যে ইজমা একটি শক্তিশালী ও প্রামাণ্য দলিলে পরিণত হয়েছে।

তারপর আমরা সাহাবা রা. ও প্রথম যুগের আলিমদের কেরামের কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইস্‌তিদলাল তথা যুক্তি উপস্থাপন ও মাসায়েল উদ্ভাবন পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখতে পাই যে, তাঁরা সদৃশকে সদৃশের ওপর কিয়াস করেছেন এবং সমতুল্যকে সমতুল্যের নজির হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একমতও হয়েছেন আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের জন্য এ বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। কারণ নবি সা.-এর পরে এমন অনেক

---

[১০৪] একই সাথে লিখিত হয়ে লিপির মাধ্যমও সংরক্ষিত হয়েছিল। - অনুবাদক

[১০৫] ইবনে খালদুন, আমল মুকাদ্দামা, পৃষ্ঠা ৩৭৯-৩৮০।

www.pathagar.com

ঘটনা ঘটেছে নসে যার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে এক্ষেত্রে তাঁরা সংঘটিত সমধর্মী ঘটনার ওপর তাকে কিয়াস করেছেন এবং নসের সাথে তাকে সংশ্লিষ্ট করার জন্য যেসব শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোসহ তাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন। তারপর তাঁরা এই সদৃশদ্বয় ও সমতুল্যদ্বয়ের মধ্যে সঠিক সমতা বিধান করেছেন। এর ফলে সর্বাধিক নির্ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, এ দুটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম একই বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আর এভাবে তার ওপর তাঁদের ইজ্‌মার ভিত্তিতে কিয়াস শরিয়াহর দলিলে পরিণত হয়েছে। এটি এখন শরিয়াহর চতুর্থ দলিল। শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফিক্‌হবিদগণের অধিকাংশই একে দলিল উপস্থাপন ও মাসায়েল উদ্ভাবনের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব যারা ইজমা ও কিয়াসকে অস্বীকার করেছেন কেবল তারা ছাড়া আর কেউ এ পদ্ধতির সমালোচনা করেননি।

কাজেই অধিকাংশ আলিম শরিয়াহর যেসব দলিলের ব্যাপারে একমত হয়েছেন সেগুলো হচ্ছে : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এছাড়াও এই চারটির সাথে জড়িত আরো কয়েকটি দলিল আছে। কিন্তু যুবা শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেননি। তবে অনুসন্ধান ও গভীর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এগুলো উল্লেখিত চারটি দলিলের দিকেই ফিরে আসে। এগুলো হচ্ছে :

১. পূর্ববর্তী শরিয়াহ,
২. সাহাবীর উক্তি,
৩. মদিনাবাসীদের আমল,
৪. ইস্তিস্‌হাব,
৫. ইস্তিহ্‌সান
৬. আল মাসালিহুল মুরসালাহ এবং অন্যান্য।

কারাফী তাঁর তানকীহুল ফুসূল কিতাবে এ ধরনের ১৯টি দলিলের নামোল্লেখ করেছেন[১০৬]।

তাঁদের অনেকে চারটি দলিলকে নিয়ন্ত্রিত করে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন: দলিল হচ্ছে ওহি অথবা ওহি ছাড়া অন্য কিছু। এ ওহি হচ্ছে মাত্‌লু বা গায়ের মাত্‌লু। মাত্‌লু তথা পঠিত ওহি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কিতাব আল কুরআন এবং গায়ের মাত্‌লু বা অপঠিত ওহি হচ্ছে রসুল সা.-এর সুন্নাত। অন্যদিকে ওহি

---

[১০৬] কারাফী, তানকীহুল ফুসূল আলাল উসূল, পৃষ্ঠা ১৯৮।

www.pathagar.com

ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে যুগের প্রত্যেক মুজতাহিদের বক্তব্য হচ্ছে সেটি ইজ্মা অথবা কিয়াস[১০৭]।

ফখরুল ইসলাম বায্দবী রহ.-এর[১০৮] মতে, শরিয়াহর মূল উৎস হচ্ছে তিনটি : কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা। আর এই তিনটি মূল উৎস থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে কিয়াস। কাজেই তিনটি হচ্ছে স্বতন্ত্র ও মূল উৎস এবং কিয়াস হচ্ছে একদিক দিয়ে মূল এবং অন্যদিক দিয়ে শাখা।

কিয়াসের ফলে হুকুমের প্রকাশ ঘটে এবং তার গুণাবলি বিশেষ থেকে ব্যাপকতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে উল্লেখিত তিনটি মূল উৎসের মতো সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে না[১০৯]।

আমাদী ও ইবনুল হাজেবের মতে শরিয়াহর যথার্থ দলিল হচ্ছে পাঁচটি : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইস্তিদলাল। অন্যদিকে শাতবী শরিয়াহর দলিলগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

এর একটি নিছক ওহির ভিত্তিতে গঠিত এবং দ্বিতীয়টি গঠিত হয়েছে নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক রায়ের ভিত্তিতে। আর এ বিভাগটি মূল দলিলের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে করা হয়েছে। অন্যথায়, উভয় বিভাগই পরস্পরের প্রয়োজন বোধ করবে। কারণ ওহির ভিত্তিতে ইস্তিদলাল করার সময় তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগের প্রয়োজন হয়। আবার কোনো বুদ্ধি বৃত্তিক রায় শরিয়াহর দৃষ্টিতে ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তা ওহির সূত্রে গ্রথিত হয়।

প্রথম বিভাগটি হচ্ছে : কুরআন ও সুন্নাহ। আর দ্বিতীয় বিভাগটি হচ্ছে : কিয়াস ও ইস্তিদলাল। অবশ্য দু'টি বিভাগের প্রত্যেকটিই মতৈক্য বা মতানৈক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে।

প্রথম বিভাগটির সাথে যেকোনোভাবেই হোক না কেন সংশ্লিষ্ট হবে ইজ্মা, সাহাবীর মতামত ও পূর্ববর্তী শরিয়াহ। কারণ এর প্রত্যেকটি এবং তার মধ্যে যে অর্থ বিধৃত

---

[১০৭] আল মার্আতু ওয়া শারাহুহা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩।

[১০৮] তিনি হচ্ছেন : আলী ইবনে মুহাম্মদ আবুল হাসান ফখরুল ইসলাম আল বাযদাবী। ফিক্হ, উসূল ও তাফসীর শাস্ত্রে হানাফীয়াদের প্রধান বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। সমরকন্দের বাসিন্দা। বয্দ একটি দুর্গের নাম এবং এর সাথেই তিনি সম্পর্কিত। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে কানযুল উসূল ইলা মারিফাতিল উসূল গ্রন্থটি উসূলুল বাযদাবী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করছে। জুরজানের নিকটবর্তী কাশ শহরে ৪৮২ হিজরতিতে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্রষ্টব্য আল আ'লাম, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৪৮ ও আল জাওয়াহিরুল মাগশিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭২ ।

[১০৯] আলমিরআতু-এর উপর লিখিত আযমিরীর ফুটনোট দেখুন।

www.pathagar.com

হয়েছে তা ওহির নির্দেশনার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। এর মধ্যে অন্যের বুদ্ধি খাটাবার কোনো উপায় নেই। ইজ্‌মার মধ্যে এ প্রবণতাই পরিদৃশ্যমান। ওহির সাথেই তা সম্পর্কিত, অন্য দু'টির সাথে নয়। মুজতাহিদ তাঁর রায় প্রত্যাহার করতে পারেন।

দ্বিতীয় বিভাগটির সাথে যুক্ত হবে ইস্তিহ্‌সান ও মাসালিহুল মুরসালাহ। এগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। আবার কখনো প্রথম বিভাগের দিকে ফিরে আসে[১১০]।

প্রথম বিভাগটি খুঁটিনাটি বিধানের পথ নির্দেশনার দিক দিয়ে দায়িত্বশীলতার প্রামাণ্য বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যেমন তাহারাত, সালাত, যাকাত, ব্যবসায় বাণিজ্য, অপরাধ দণ্ডবিধি ইত্যাদির খুটিনাটি বিধানের ক্ষেত্রে।

আবার খুঁটিনাটি বিধানের প্রামাণ্যতা যেসব নিয়ম-কানুনের ওপর নির্ভরশীল সেগুলোর পথ নির্দেশনার দিক দিয়েও দায়িত্বশীলতার প্রামাণ্য বিধান হিসেবে স্বীকৃত। যেমন ইজমা একটি শরিয়াহ প্রমাণ, কিয়াস একটি শরিয়াহ প্রমাণ, সাহাবীর উক্তি একটি শর্‌য়ী প্রমাণ এবং আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়াহ একটি শরিয়াহ প্রমাণ ইত্যাদি[১১১]।

আর সুন্নাহ কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। কারণ রসুল সা.-এর সত্যতা হচ্ছে, তিনি মু'জিযার মাধ্যমে শিক্ষা দেন। আর কুরআন হচ্ছে সবচেয়ে বড় মু'জিযা আমাদের মহান রসুল সা.-এর জন্য। তারপর এ কথাও সত্য যে, সুন্নাত এসেছে কুরআনকে সুস্পষ্ট করার, তার অন্তর্নিহিত অর্থের ব্যাখ্যা দেবার এবং তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে
বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার জন্য। কাজেই আল্লাহ তায়ালার কিতাব হচ্ছে সমস্ত উৎসের উৎপত্তি স্থল[১১২]।

শরিয়াহর দলিলসমূহ তার বিধানাবলীর ভিত্তি, যা থেকে নস্ বা ইস্তিম্‌বাত তথা উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। আর এগুলো সবই এমন সংকেত যা আল্লাহ তায়ালার হুকুম আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয়। কারণ দলিল শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: পথ প্রদর্শক ও উন্মুক্তকারী[১১৩]।

---

[১১০] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬।

[১১১] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬।

[১১২] আল মিরআহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮২ এবং আলমাওয়াফিকাত খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬।

[১১৩] আল মিসবাহুল মুনীর, পৃষ্ঠা ৩০৬ ।

www.pathagar.com

এ কারণে হুকুম থেকে যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পথ নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং নবি সা. থেকে শরিয়াহর দলিল উপস্থাপন করার পদ্ধতির মধ্যে যে শক্তির তারতম্য থাকে তার ভিত্তিতে শরিয়াহর দলিল শক্তিশালী ও দুর্বল হয়।

কাজেই শরিয়াহর প্রত্যেকটি দলিল অকাট্য অথবা অনুমানসিদ্ধ হয়। যদি তা অকাট্য ও চূড়ান্ত হয় তাহলে তা বিবেচনা করা ও মেনে নেয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার দ্বিধার অবকাশ থাকে না। যেমন- সালাত, নাপাকি থেকে তাহারাত লাভ, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, আদল ও ইনসাফ করা এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য বিষয়ের ওয়াজিব হওয়া।

আর যদি তা অনুমানসিদ্ধ হয়, তাহলে প্রথমত তা প্রত্যাবর্তিত হবে মূল অকাট্য দলিলের দিকে। যদি তা মূল অকাট্য দলিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে, তাহলে পুনরায় নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে। সাধারণ খবরে ওয়াহিদ[১১৪]-এর ব্যাপারে একথাই ঠিক। কারণ তা কুরআনের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

আর তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে[১১৫]।

হাদিসে এ ধরনের আরো যে বিষয়গুলো এসেছে সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, যেসব ব্যবসায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সুদ ও অন্যান্য বিষয়। আল্লাহ তায়ালার এই বাণী এগুলোর প্রতি আরোপিত হয় :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

আর আল্লাহ তায়ালা ব্যবসায়কে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন[১১৬]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

---

[১১৪] যে সহিহ হাদিসের বর্ণনা পরম্পরার কোনো এক স্তরে মাত্র একজন, দু'জন বা তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে খবরে ওয়াহিদ বা খবরে আহাদ বলা হয়। - অনুবাদক

[১১৫] সুরা আন নাহল, ৪৪ আয়াত।

[১১৬] সুরা আলবাকারা, ২৭৫ আয়াত।

www.pathagar.com

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না[১১৭]।

সমস্ত খবরে ওয়াহিদ ও মুতাওয়াতির[১১৮] হাদিসও এগুলোর প্রতি আরোপিত হয়, যদি তার দিক নির্দেশনা অনুমানলব্ধ না হয়। এরি অন্তর্ভুক্ত নবি সা.-এর এ বাণীও : لا ضرر ولا ضرار কোনো ক্ষতি এবং কোনো অনিষ্ট করা যাবে না[১১৯]। অবশ্যই তা মূল ও চূড়ান্ত অর্থের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়াহর সকল কারণ, নিয়ম-কানুন ও ছোট-খাটো বিষয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতি ও অনিষ্টের বিস্তার রোধ করা হয়েছে। যেমন জীবন, ধন-সম্পদ ও বস্তুর মধ্যে তার বিস্তার এবং সাধারণভাবে জুলুম প্রতিরোধ করা। এমন প্রত্যেকটি জিনিস যা থেকে ক্ষতি ও অনিষ্ট বুঝায় তা থেকে বাঁচা নিসন্দেহে শরিয়াহর সাধারণ লক্ষ্য।

যখন তা অকাট্য ও চূড়ান্ত অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় না তখন অবশ্যই সেখানে সুনিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী হতে হবে। সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোনো কথা আরোপ করা সঠিক হবে না। এটি দুই প্রকার। তম্মধ্যে এক প্রকার অর্থ মূলের বিরোধী এবং অন্য প্রকারটি মূলের বিরোধীও নয় আবার অনুকূলও নয়।

প্রথম প্রকারটি হচ্ছে অনুমানসিদ্ধ এবং তা মূল অকাট্য অর্থের বিরোধী এবং অন্য কোনো মূল অকাট্য অর্থ তার সাক্ষ্যও দেয় না। এটি সর্ব সম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত। কারণ, এটি শরিয়াহর মূলনীতির বিরোধী। এ ধরনের প্রত্যেকটি অর্থ অনির্ভরযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য। তবে কখনো এর উপযোগী দৃষ্টান্তও দেয়া হয়, যা অত্যন্ত বিরল। যেমন- স্ত্রীকে যিহার[১২০] করার কাফ্ফারা হিসেবে পরপর দু'মাস রোযা রাখা

---

[১১৭] সুরা আল বাকারা, ১৮৮ আয়াত।

[১১৮] যে সহিহ হাদীসের বর্ণনা পরম্পরায় প্রত্যেক যুগে অধিক বর্ণনাকারীর সংখ্যা পাওয়া যায় এবং তারা এত বিভিন্ন স্থানের হয় যে তাদের পক্ষে একত্র সমবেত হয়ে একটি হাদিস তৈরি করা সম্ভব নয়, তাকে মুতাওয়াতির হাদিস বলে। মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা ইলমে ইয়াকীন তথা এমন প্রত্যয়লব্ধ জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করা যায়, যা সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহের উর্ধে। -অনুবাদক

[১১৯] ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন, এছাড়া আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৯০।

[১২০] যিহার অর্থ জাহেলি যুগে আরব সমাজে যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলতো, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠ তুল্য। তাহলে সেই স্ত্রী তালাক হয়ে যেতো। এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বলে। -অনুবাদক

www.pathagar.com

ওয়াজিব। তবে যার দাস মুক্তির সামর্থ নেই একমাত্র তার জন্যই রোযা রাখার প্রশ্ন আসে[১২১]।

প্রথম দলিল : আল কিতাব

উসূলবিদ ও ফকীহগণের পরিভাষায়, এটি হচ্ছে কুরআন। কুরআন আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট বাণী, তাঁর মুখ্য প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি। তার সামনে ও পেছন থেকে কোনো বাতিলের অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়। কুরআনই শরিয়াহর পূর্ণাঙ্গ বিধান, দ্বীনের মূলনীতি ও মিল্লাতের স্তম্ভ। এটিই জ্ঞানের উৎসমূল, রিসালাতের নিদর্শন এবং দৃষ্টির ও প্রমাণের আলো। কুরআনই আল্লাহ তায়ালার এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া নাজাতের আর কোনো পথ নেই। কুরআনের বিরোধিতা করে অন্য কিছুর সাথে জড়িত হওয়া যাবে না। কুরআনের সাহায্যে যে হুকুম দেয় সে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে এবং কুরআনের সাহায্যে যে কথা বলে সে সত্য কথা বলে। যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যতীত থেকে হিদায়াত লাভ করতে চায় সে সত্য সরল পথ হারিয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি তার হিদায়াতের অনুসারী হয় সে কখনো পথ হারায় না এবং দুঃখ কষ্টও পায় না আর যে ব্যক্তি তার থেকে বিমুখ হয় তার জীবন-যাপন হয় সঙ্কুচিত।

কুরআন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী ও যুক্তিবাদী। জিন ও মানবজাতিকে সে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তার অনুরূপ আর একটি কিতাব আনার জন্য। যদি মানুষ ও জিন সমবেত হয়ে যায় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তাহলেও তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যেমন কবি বলেন :

যে চেয়েছিল অপসারণ করতে
লজ্জার গাউন, মুসাইলামার মতো সংকীর্ণ পথে
তার প্রকাশই ছিল লজ্জা,
তার শব্দগুলো দুর্বল এবং অর্থও

যেমন তার কথা : আত্‌তাহেনাতু তাহ্‌নান[১২২]।

উসূলবিদগণ কুরআনের সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেছেন, কুরআন হচ্ছে শ্রুতির মাধ্যমে আহৃত প্রথম দলিল এবং তার সমগ্রের মূল স্বরূপ। উসূলবিদগণ কুরআনের সংজ্ঞায় কয়েকটি নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করেছেন। এগুলোর সাহায্যে সে সুস্পষ্ট করে নামায যা

---

[১২১] ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন, এছাড়া আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯ ও ১৪ দেখুন।

[১২২] নাফহুত তীব এ লেখক আহমদ আল মুকরীর কিতাব ইদাআতুদ দাজিনাহ থেকে।

www.pathagar.com

বৈধ করে এবং যা বৈধ করে না। বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কুরআন হয় সুস্পষ্ট দলিল। আর এক্ষেত্রে যে তা অস্বীকার করে সে কাফের হয়ে যাবে কি-না এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন বিষয় কুরআন থেকে জানা যায়।

তাঁরা বলেছেন : কুরআনের শব্দ মুহাম্মদ সা.-এর ওপর নাযিল হয়েছে। এর মতো সুরা রচনা করা মানুষের সাধ্যের অতীত। এর তেলাওয়াত ইবাদতের শামিল। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি পরম্পরায় এর আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে[১২৩]।

সুন্নাত, হাদিসে কুদসী ও বিরল কিরাআত কুরআন সম গণ্য হবে না। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে কুরআন দলিল হিসেবে স্বীকৃত। কুরআনের দলিল তার আয়াতের মধ্যে চূড়ান্ত মু'জিযা হিসেবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় বিরাজিত। কোনো একজন মুসলমানও কুরআনের অপ্রামাণিকতার দাবী করে না। মতবিরোধ যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে তা হচ্ছে কুরআনের শব্দ ও অর্থ থেকে দলিল গ্রহণ ও মাসায়েল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। কুরআনের প্রামাণিকতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কুরআন তেইশ বছরে থেমে থেমে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। এর একটি অংশ মক্কায় এবং অন্য অংশ মদিনায় নাযিল হয়। এ কারণে এর সুরাগুলো মাক্কী ও মাদানী দু'ভাগে বিভক্ত। এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে তিনটি মত পাওয়া যায়[১২৪]।

এক. মক্কায় যেগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো মাক্কী সুরা, হিজরাতের পরে নাযিল হলেও। অন্য দিকে মদিনায় যেগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী সুরা। এ বক্তব্য অনুযায়ী তৃতীয় প্রকারটি এভাবে সংজ্ঞায়িত হয় যে, সফরের মধ্যে যেগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো মাক্কীও বলা যাবে না এবং মাদানীও বলা যাবে না।

দুই. মাক্কী সুরা হচ্ছে সেগুলো যেগুলোতে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর যেগুলোতে মদিনা বাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো মাদানী সুরা।

তিন. হিজরতের পূর্বে যেগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো মাক্কী এবং হিজরাতের পরে যেগুলো নাযিল হয়েছে মাদানী সুরা, মক্কায় নাযিল হলেও মাক্কী ও মাদানীর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মাক্কী সুরার মধ্যে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং মাদানী সুরায় বর্ণনা বিস্তারিত। মাক্কী সুরার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষের অন্তরে ইমানের সম্প্রসারণ এবং মাদানীর বৈশিষ্ট্য, জীবনযাত্রা ও মুসলমানদের পারস্পরিক এবং মুসলমানের সাথে কাফের ও যুদ্ধকারী মুশরিকদের লেনদেনের ক্ষেত্রের শরিয়াহর

---

[১২৩] জামউল জাওয়ামে এবং তার ব্যাখ্যাসমূহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯০, আল মিলাতু ফিল উসূল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৬।

[১২৪] আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল যারাক্শী, মৃত্যু হিজরি ৭৯৪, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৭।

www.pathagar.com

কার্যকর বিধান প্রণয়ন। মক্কী ও মাদানীর মধ্যে পার্থক্যটা উসূলবিদ আলেমগণের দৃষ্টিতে অনেক বড়, বিশেষ করে নাসেখ-মানসূখের ক্ষেত্রে মাক্কী এক ধরনের সুরা এবং মাদানী অন্য ধরনের। তারা পরস্পর বিপরীতধর্মী বা ভিন্নধর্মী, বরং প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পর সংযুক্ত ও সমন্বয় সাধনকারী অংশগুলোর একটি একক কাঠামো। মাক্কী সুরাগুলো আসল বুনিয়াদ রচনা করেছে এবং মাদানী সুরাগুলো তার শাখা-প্রশাখা হিসেবে তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে। কাজেই মাক্কী সুরাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মনে বিশ্বাসের সঞ্চার ও সম্প্রসারণ এবং তার গুণাবলিতে তাদের মনের মধ্যে দৃঢ় বদ্ধমূল করে দেয়া। অন্যদিকে স্থায়ী শরিয়াহ রচনা করাই হচ্ছে মাদানী সুরাগুলোর লক্ষ্য। দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করার ক্ষেত্রে এই আকীদা বিশ্বাস ও শরিয়াহ উভয়ে সমান অংশীদার।

মাক্কী সুরার আয়াতগুলোর অর্থ অনুধাবনের সাথে মাদানী আয়াতগুলোর অর্থ অনুধাবন সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত। আর এভাবেই উভয়ের প্রত্যেকেই নির্ভরতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবে। কারণ, তাদের মধ্যে যে পিছিয়ে পড়বে তার বুনিয়াদ অবশ্যই তার ওপর রাখা হয়েছে যে এগিয়ে আছে। আরোহ পদ্ধতি তাই প্রকাশ করে। কারণ পশ্চাৎবর্তীটি সংক্ষিপ্তের সুস্পষ্ট বর্ণনা হবে অথবা হবে অধিকাংশ থেকে কিছুকে বিশিষ্টতা দেয়া কিংবা সাধারণকে নির্দিষ্ট করা অথবা যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া বা যার পূর্ণতা প্রকাশ পায়নি তাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করা[১২৫]।

কুরআনে বিধৃত আহকাম

কুরআনে বিধৃত অধিকাংশ বিধানই সংক্ষিপ্ত। যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ, বিবাহ, অঙ্গীকার, কিসাস, অপরাধ দণ্ডবিধি ইত্যাদি। সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহকারে কুরআন শরিয়াহর একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান রচনা করেছে। জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, যাবতীয় অভাব পূরণ, জীবনকে সূচি-সুন্দর ও পূর্ণতা দান করে এমন প্রত্যেকটি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দলিল : সুন্নাত

সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : প্রশংসিত বা নিন্দিত পথ। নবি সা. বলেছেন :

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

---

১২৫ পূর্বোক্ত আল বুরহান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৭, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪৪; শায়খ মুহাম্মদ আলী আসসায়েম লিখিত তারিখ আত্তাশরী, পৃষ্ঠা ১৬; শায়খ মুহাম্মদ আবু যোহরা, কিতাবুল মিলকিয়া ওয়া নায্‌রীয়াতুল আকদ, পৃষ্ঠা ৩-৪।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি কোনো ভালো পদ্ধতির প্রচলন করে সে তার প্রতিদান পাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সে পদ্ধতির অনুসরণ করবে তাদের প্রতিদানও সে পাবে[১২৬]।

ফকীহ্দের পরিভাষায় সুন্নাতের অর্থ হচ্ছে : যা ফরযের মোকাবিলায় আসে[১২৭]। এটা শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীদের অভিমত। অন্যদিকে হানাফীদের মতে যা ফরয ও ওয়াজিবের মোকাবিলায় আসে।

উসূলবিদগণের পরিভাষায় নবি সা.-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদন হচ্ছে সুন্নাত। কথার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, শরিয়াহর আহকামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় তিনি যা বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

নিয়তের ভিত্তিতেই কাজের ফলাফল নির্ধারিত হয়[১২৮]।

তিনি বলেছেন :

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ওয়ারিসের পক্ষে কোনো ওসীয়ত করা যাবে না[১২৯]।

তাঁর কর্মের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাহাবাগণ তাঁর কার্যাবলি থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন। এ উদ্ধৃতি তাঁর ইবাদত ও জীবন-যাপনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত। যেমন তাঁর নামায পড়া, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করা, রোযার নিয়ম-কানুন পালন করা ইত্যাদি।

তাঁর অনুমোদনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে : নবি সা.-এর বিভিন্ন সাহাবা রা.গণ যেসব কাজ করেছেন এবং তিনি সে ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, যা থেকে তাঁর রেজামন্দি বুঝা যায় অথবা সেগুলোকে তিনি ভালো বলেছেন বা সমর্থন করেছেন। এ ধরনের কাজ আসলে তাঁর অনুমোদিত বলে ধরে নেয়া হয়। প্রথমটির ব্যাপারে বলা যায়, নবি সা. তাঁর একদল সাহাবাকে বনু কুরাইযার দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন :

---

[১২৬] মুসলিম বর্ণিত।

[১২৭] নিহায়াতুস সাউল ফী শারহি মিনহাজিল উসূল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬১৯ এবং ইরশাদুল ফুহুল, পৃষ্ঠা ৩১।

[১২৮] বুখারি ও মুসলিম থেকে বর্ণিত।

[১২৯] আদ্দার কুত্নী হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইযায় না পৌঁছে আসরের নামায আদায় করে না।

এতে কেউ কেউ ভাবলেন, এ নিষেধাজ্ঞা শাব্দিক অর্থেই দেয়া হয়েছে। ফলে তাঁরা বনু কুরাইযায় পৌঁছুতে মাগরিব হয়ে যাওয়ার কারণে মাগরিবের পরে আসরের নামায পড়েন। আবার কেউ কেউ ভাবলেন, এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাহাবাগণের দ্রুত চলা, যাতে আসরের ওয়াক্ত শেষ হবার আগে বনু কুরাইযায় পৌঁছানো যায়। ফলে তাঁরা পথে আসরের নামায পড়ে নেন। বনু কুরাইযার যুদ্ধের সময় আসরের নামাযের ব্যাপারে সাহাবাগণের রা. এ ইজতিহাদ নবি সা.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি নীরব থাকেন, কোনোটার প্রতিবাদ করেন না। এভাবে তিনি উভয় দলের ইজতিহাদকে অনুমোদন দান করেন[১৩০]।

দ্বিতীয়টির ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. গুঁইসাপের গোশ্‌ত খেয়েছিলেন। নবি সা.-কে বলা হলো। অথচ তা তিনি খাননি। জনৈক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি গুঁইসাপের গোশ্‌ত খাওয়া হারাম, হে আল্লাহর রসুল? তিনি জবাব দিলেন :

لا ولكن ليس في أرض قومي فأجدني أعافه

না, হারাম নয়। তবে আমার এলাকায় তা পাওয়া যায় না। আমি তা অপছন্দ করি[১৩১]।

উসূলবিদগণ নবি সা.-এর যেসব কথা, কাজ ও অনুমোদনের সাহায্যে শরিয়াহর বিধান প্রমাণিত হয় সেগুলোর সাথে একে বেঁধে দিয়েছেন। সুন্নাতের এ অর্থটি আমাদের উদ্দেশ্যও।

সুন্নাতের প্রামাণিক ক্ষমতা

আলেম সমাজে সর্বসম্মতভাবে সুন্নাত প্রামাণিক ক্ষমতাসম্পন্ন হিসেবে স্বীকৃত, যদিও তা খবরে আহাদ হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

---

[১৩০] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮। হাদিসটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী ও এটি রেওয়ায়েত করেছেন।

[১৩১] মুস্তফা সাবায়ী, আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত্ তাশরী' পৃষ্ঠা ৫৩।

www.pathagar.com

সে কোনো মনগড়া কথা বলে না। এটা তো ওহি ছাড়া আর কিছুই নয়[১৩২]।

তিনি আরো বলেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রসুল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো[১৩৩]।

তিনি আরো বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রসুল সা.-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ[১৩৪]।

আল্লাহর রসুল সা. তাঁর প্রতিনিধিদেরকে বিভিন্ন এলাকায় ও দেশে এককভাবে পাঠিয়েছিলেন শরিয়াহ প্রচার করার জন্য। সুন্নাতের উপর আমল করা ওয়াজিবের দলিল এর মধ্যে পাওয়া যায়, যদিও তা খবরে আহাদ হয়। নবি সা.-এর জামানায় তাঁর অসাক্ষাতে সাহাবাগণ রা. এর ওপর আমল করেছেন এবং তিনি তা অনুমোদন করেছেন, আর তা ছিল খবরে ওয়াহিদ। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবাগণ এর ওপর আমল করার ব্যাপারে একমত হয়ে গেছেন তবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁদের প্রতিবাদগুলোও প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের এই ঐকমত্য এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। সহীহ হাদিস ও সীরাতের কিতাবগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে কুরআন যেসব বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়[১৩৫]।

ইবনে কাইয়িম রহ. বলেন : মুমিনরা আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো পথে অগ্রসর হবে না, এটাকে যখন আল্লাহ তায়ালা ইমানের অপরিহার্য শর্তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তখন তাদের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, তারা তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো কথা বা তাত্ত্বিক মতবাদের অনুসরণ করবে না। এটাই হবে তাদের জন্য

---

[১৩২] সুরা আল-নাজম, ৩-৪ আয়াত।

[১৩৩] সুরা আল হাশ্‌র, ৭ আয়াত।

[১৩৪] সুরা আল আহযাব, ২১ আয়াত।

[১৩৫] ইবনুল হুমাম, তাইসীরুত তাহরীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৮, মুকাদ্দামা ইবনে খালদূন, পৃষ্ঠা ৩৮০, সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত্ তাশ্‌রী, পৃষ্ঠা ৫৫ এবং আল ফিকরুস্ সামী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯।

www.pathagar.com

অপরিহার্য শর্ত। তিনি যে হুকুম দিয়েছেন তার অন্তস্থিত অর্থ ও ইঙ্গিত থেকে যে হুকুম বুঝা যায় সেটিই তাঁর হুকুম[১৩৬]।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবি সা.-এর ইন্তিকালের পরে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল গ্রহণ করার ধারা এগিয়ে চলে। তিনি বলেছেন :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي

> তোমাদের মধ্যে আমি দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি : আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও আমার সুন্নাত। যতদিন তোমরা এ দু'টি থেকে দলিল গ্রহণ করবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না[১৩৭]।

সুন্নাতের উদ্ধৃতি যখন প্রমাণিত হবে এবং রসুল সা. পর্যন্ত তার সনদ তথা বর্ণনা পরম্পরা সঠিক ও নির্ভুল বিবেচিত হবে তখন তার প্রমাণসিদ্ধতার ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো অবকাশ থাকে না। এটিই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কারণ নবিকে গুনাহ থেকে সংরক্ষিত রাখার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই তাঁকে কোনো মনগড়া কথা বলা থেকে বিরত রাখে। শরিয়াহর নির্ভরযোগ্য আলেমদের মধ্যে থেকে যারা এর বিরোধিতা করেন তারা মূলত : হাদিসের সনদ বা তার মতনের[১৩৮] অর্থ ও ইশারা-ইঙ্গিত সম্পর্কেই কথা বলে থাকেন। কিন্তু সনদ যখনই সহীহ প্রমাণিত হয় তখন রসুল সা.-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনের প্রমাণসিদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি উঠাবার কোনোই অবকাশ থাকে না। কাজেই সুন্নাত এমন একটি বিষয় সমষ্টি যা শরিয়াহর দলিল এবং তার মধ্যে যা বিধৃত হয়েছে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব।

শরিয়াহর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের মর্যাদা

শরিয়াহর আইন রচনার ক্ষেত্রে কুরআনের পরে সুন্নাত দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। সুন্নাতকে কুরআনের পরে স্থান দেয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআন হচ্ছে চূড়ান্ত এবং তা থেকে ইল্‌মে ইয়াকীন ও দৃঢ়বিশ্বাস লাভ হয়। অন্যদিকে সুন্নাত চূড়ান্তের কাছাকাছি এবং তা থেকে ইলমে যন[১৩৯] লাভ করা হয়। তা থেকে যে চূড়ান্ত ও

---

[১৩৬] ইবনুল কাইয়েম, ই'লামুল মুয়াককিয়ীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮।

[১৩৭] জামে বায়ানিল ইলম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮০।

[১৩৮] সনদ বর্ণনার পর যে মূল হাদিসটি বর্ণনা করা হয় সেটি হচ্ছে মতন।

[১৩৯] শুনার পরপরই দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মালেও বিশ্বাসের পাল্লা ভারী হলে তাকে হাদিসের পরিভাষায় ইল্‌মে যন্ বলা হয়।

www.pathagar.com

দৃঢ়বিশ্বাস লাভ হয়, তা হয় সামগ্রিকভাবে, বিস্তারিত পর্যায়ে নয়। অন্যদিকে কুরআন থেকে চূড়ান্ত ও দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করা হয় সামগ্রিকভাবে এবং বিস্তারিত পর্যায়ে বর্ণনার প্রেক্ষিতেও। আর চূড়ান্ত ও দৃঢ়বিশ্বাস ইল্‌মে যন্‌ এর ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে।

ফলে কুরআন অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। আবার সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা অথবা তার ওপর অতিরিক্ত ব্যবস্থা। যদি তা ব্যাখ্যা হয়, তাহলে তা হয় দ্বিতীয় সুস্পষ্টকারী। এক্ষেত্রে সুস্পষ্টকারী রহিত হয়ে গেলে ব্যাখ্যাও রহিত হয়ে যায় কিন্তু ব্যাখ্যা রহিত হলে সুস্পষ্টকারী রহিত হয়ে যায় না। এ অবস্থায় কুরআন নিসন্দেহে অগ্রবর্তী হবে। আর যদি হাদিস ব্যাখ্যা না হয় তাহলে তা গৃহীত হবে না যে পর্যন্ত না কুরআনে তার অনুবৃত্তি হয়। এটিই কুরআনের অগ্রবর্তী হবার দলিল[১৪০]।

মু'আয রা. থেকে এ কথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রসুল সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করেন (ইয়ামানের শাসনকর্তা বানিয়ে পাঠাবার প্রারম্ভে) :

> بم تحكم؟ قال بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي.
>
> জনগণের ব্যাপারে ফায়সালা তুমি কিভাবে করবে? জবাব দেন : আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সাহায্যে। জিজ্ঞেস করেন: যদি সেখানে কোনো ফায়সালা না পাও? জবাব দেন : তাহলে আল্লাহর রসুল সা.-এর সুন্নাতের মাধ্যমে করবো। জিজ্ঞেস করেন : যদি সেখানেও কোনো ফায়সালা না পাও? জবাব দেন : তাহলে আমার নিজের রায়ের মাধ্যমে ইজতিহাদ করবো। এ হাদিসে সুন্নাতকে কুরআনের পরে স্থান দেয়া হয়েছে। এটি শ্রুত দ্বিতীয় দলিল[১৪১]।

কুরআনের সাথে সুন্নাতের সম্পর্ক

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুল সা.'র ওপর কিতাব নাযিল করেন মুত্তাকীদের হিদায়াতের এবং মুমিনদের হৃদয়ের রোগ নিরাময়ের জন্য। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার

---

[১৪০] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯ এবং আল ফিকরুস সামী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯০।

[১৪১] মাকানাতুস সুন্নাহ : আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯ ও আল ফিকরুস সামী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯। মুস্তফা সাব্বায়ী লিখিত আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্তাশরী, পৃষ্ঠা ৩৪৩ এবং আবদুল ওহ্হাব খাল্লাফ লিখিত উসূলুল ফিক্হ, পৃষ্ঠা ২২-২৩।

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য। এগুলোকে সামনে রেখে তিনি রসুলদের প্রেরণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে : আইন প্রণয়ন, আচরণবিধি রচনা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, ঘটনাবলী ও তওহীদ-আকীদা-বিশ্বাস। কুরআন সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত পর্যায়ে চূড়ান্ত নির্ভুল। তার কোনো একটি বাক্য, শব্দ বা হরফের ব্যাপারে যে ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করে সে আর মুসলমান থাকে না। আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের ব্যাপারে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ এবং যে ব্যাপারে সবাই একমত সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য কি বিধান, আইন-কানুন ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধি প্রণয়ন করেছেন তা তাঁর কিতাব থেকেই জানতে হবে।

ইতোঃপূর্বে বলা হয়েছে, কুরআনী বিধানের বৃহদংশ সংক্ষিপ্তাকারে রয়েছে। রসুল সা.-এর দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া এ সংক্ষিপ্ত বিধানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ রসুল সা.-এর প্রতি আল্লাহ তায়ালা কিতাব নাযিল করেছেন এ উদ্দেশ্য যে, তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তা তিনি সমগ্র মানবজাতির কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেন।

গুটিকয় বিভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র মুসলিম মিল্লাত এ ব্যাপারে একমত যে, রসুল সা.-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনজনিত সুন্নাত ইসলামি শরিয়াহর অন্যতম উৎস। শরিয়াহর প্রত্যেকটি হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানার জন্য সুন্নাতের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ কুরআনে সংক্ষেপে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে সুন্নাত তার ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা অথবা তাতে ঢালাওভাবে বর্ণিত হুকুমকে সুন্নাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কিংবা সাধারণ হুকুমকে বিশিষ্ট করে দিয়েছে। ফলে সুন্নাতে বর্ণিত বিস্তারিত বর্ণনা বা ব্যাখ্যা অথবা বিশিষ্টতা কুরআনে বিধৃত হুকুমের সুস্পষ্ট বর্ণনায় পরিণত হয়েছে। আর সুস্পষ্ট বর্ণনা তাবলীগ ও প্রচারের অপরিহার্য অংশ। কাজেই রসুল হচ্ছেন কুরআনের মুবাল্লিগ এবং তাতে যা বর্ণিত হয়েছে তাকে সুস্পষ্টকারী। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে এ সুস্পষ্ট বর্ণনার অধিকার রসুলকে দান করেছেন :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

> এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল[১৪২]।

কুরআন রদ করেনি এমন হুকুমকে সুন্নাত কখনো প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে কুরআনে তার সপক্ষে কোনো নস্ না থাকা সত্ত্বেও সুন্নাতের মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়।

---

[১৪২] সুরা আন নাহল, ৪৪ আয়াত।

www.pathagar.com

যেমন স্ত্রীর সাথে তার খালা বা ফুফুকে বিয়ে করা, নখর ধারী পশু ও পাখির গোশ্ত খাওয়া, পুরুষের রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ ব্যবহার করা ইত্যাদি। এ ধরনের বিষয়গুলো কুরআনের বিধানকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোর মধ্যে আলিময়ে কেরাম বিভিন্ন মতের অনুসারী হয়েছেন। তাদের কেউ কেউ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কাজেই তাদের মতে এ ধরনের বিষয় যখনই সুন্নাতে উল্লেখিত হয়েছে, তা একটি অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে অথবা কুল্লী তথা সর্বজনীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কুরআনের সামনে পেশ করা হয়েছে। অন্যদের মতে আইন প্রণয়নে সুন্নাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য। এর দৃষ্টান্ত উপরে উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য এ দু'দলের এ মতবিরোধ নিছক শাব্দিক। কারণ যারা সুন্নাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিরোধী তারা কুল্লী আহকামের সীমানার মধ্যে যা কিছু প্রবেশ করে তাকে শামিল করে নেয় এবং এটি দায়িত্বেরই শ্রেণিভুক্ত। অন্য দিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতিদানকারীরা এ দায়িত্বের সপক্ষে কোনো প্রেরণাদাতা দেখে না[১৪৩]।

সুন্নাতের সাহায্যে কুরআনের বিধান মান্সূখ হওয়া এবং কুরআনের সাহায্যে সুন্নাতের বিধান মান্সূখ হওয়ার ব্যাপারে উসূলবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে[১৪৪]।

তাদের বক্তব্যের সারাংশ

সুন্নাত হচ্ছে দলিল ও হুজ্জাত। আল্লাহ তায়ালার বিধান জানার ব্যাপারে কুরআনের পরে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় উপায় ও মাধ্যম। সুন্নাহ ও কুরআন উভয়ই একই লক্ষ্যাভিমুখে উৎসারিত। তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। মূলত : উভয়ের উৎসও এক। কারণ উভয়ই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহি, যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে[১৪৫]। উৎস যখন এক, উদ্দেশ্যও যখন এক তখন সেখানে তাদের মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্য থাকতে পারে না। বরং সেখানে পাওয়া যাবে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা এবং শরিয়াহর বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একাত্মতা। কাজেই সুন্নাত কুরআনকে শক্তিশালী, সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ করে।

---

[১৪৩] আলমাওয়াফিকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭, আলফিকরুস সামী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১ ও ইমাম শাফেয়ীর আর রিসালা, পৃষ্ঠা ৯, আসসুন্নাতু ওয়া মকানাতুহা ফিততাশরী, পৃষ্ঠা ৩৬।

[১৪৪] কারাফী, তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৩৬, তাইসীরুত তাহরীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬১, আল ফিকরুস সামী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯।

[১৪৫] ভূমিকা অধ্যায়ে প্রথম আলোচ্য বিষয় দেখুন।

www.pathagar.com

তৃতীয় দলিল : ইজ্‌মা

সংজ্ঞা: উসূলবিদগণের মতে ইজ্‌মা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের কোনো একটি বিষয়ে একমত হয়ে যাওয়া[১৪৬]।

একমত অর্থ হচ্ছে, কথায়, কাজে অথবা বিশ্বাসে শরীক হওয়া। আর জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ বলতে বুঝানো হয়েছে শরিয়াহর বিধানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদকারী মুজতাহিদবৃন্দকে। ইমাম আল গাজ্জালী রহ. বলেছেন : মুজতাহিদদের বলে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীয়া। আর কারাফী রহ.-এর মতে, এই কোনো একটি বিষয় হচ্ছে শরিয়াহ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রচলিত বিষয়। ইমামুল হারামাইন তাঁর আল বুরহান গ্রন্থে লিখেছেন : বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়াবলীর ওপর ইজ্‌মার কোনো প্রভাব নেই। সেখানে চূড়ান্ত দলিলই নির্ভরযোগ্য। তা একবার দাঁড়িয়ে গেলে কোনো অনৈক্যই তার মোকাবিলায় টেকে না এবং কোনো ঐক্যই তাকে সাহায্য করতে পারে না। ইজ্‌মা নির্ভরযোগ্য হয় শ্রুত বিষয়াবলির ব্যাপারে। যখন সবাই একমত হয়ে যায় কোনো কাজের ক্ষেত্রে, যেমন কোনো খাদ্য খাওয়া, তখন তাদের এ একমত হওয়াটা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, খাদ্যটি মুবাহ, ঠিক নবি সা.-এর কোনো খাদ্য খাওয়া তার মুবাহ হওয়ার প্রমাণের মতে যে পর্যন্ত না তার মান্‌দুব বা ওয়াজিব হওয়ার কোনো সূত্র পাওয়া যায়[১৪৭]।

কারাফী আল মু'তামিদ গ্রন্থে আবুল হুসাইনের উক্তি বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : তাদের কথা, কাজ ও সম্মতির ব্যাপারে ঐকমত্য বৈধ। আর সম্মতি হবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে। কাজেই তারা যে ভালো বিষয়ে সম্মত হয়েছে তাই অনুমোদিত হবে। আবার কখনো তারা কথা ও কাজ পরিহারের ওপর একমত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সেটি ওয়াজিব নয় তাই বুঝা যাবে। আর মানদুব হিসেবে তারা যা পরিহার করে তা বৈধ। কারণ এই পরিত্যাগ ক্ষতিকর নয়[১৪৮]।

বলা হয়েছে, ইজ্‌মা হচ্ছে এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। আর অন্য উম্মতের মধ্যে এটি সাধারণভাবে প্রচলিত। কাযী আবু বকর বাকেল্লানী বলেন: আমি জানি না অবস্থাটা কেমন ছিল[১৪৯]। তবে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই উম্মতের ইজ্‌মা।

---

[১৪৬] কারাফী, তানকীহুল ফুসুল, ১৪০ পৃষ্ঠা, মুস্‌তাসফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৩, ইবনুল হাজেব লিখিত আল মুন্‌তাহা, পৃষ্ঠা ৩৭, আমাদী লিখিত আল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০১।

[১৪৭] মাকতাবা আযহার সংকলিত আল বুরহান, ৯১৩ নম্বর পাণ্ডুলিপি।

[১৪৮] তানকীহুল ফুসুল, পৃষ্ঠা ১৪১।

[১৪৯] তানকীহুল ফুসুল।

www.pathagar.com

ইজ্‌মার সম্ভাবনা ও তার অনুষ্ঠান

এ উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্যই যখন ইজমা। তখন এ ঐকমত্য সম্ভব কি সম্ভব নয়, তা একটি বিচার্য বিষয়। আর যখন তা সম্ভব হয় তখন বাস্তবে অনুষ্ঠিত হয় কি না?

এক দলের মতে, স্বাভাবিকভাবে ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। অবশ্য অধিকাংশ আলেমের মতে, ইজ্‌মার অনুষ্ঠান সম্ভব। ইমামুল হারামাইন তাঁর বুরহান গ্রন্থে লিখেছেন : একদল লোকের মতে ইজমার অনুষ্ঠান অকল্পনীয় ব্যাপার। এ ব্যাপারে কাযী কঠোর বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য খুব কমই ইনসাফের সীমানা অতিক্রম করে গেছে। অতঃপর ইমামুল হারামাইন রহ. বলেছেন : তবে আমরা সকল পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ করার পদ্ধতি বের করবো, এমনকি যখন না ও হ্যাঁ-এর সীমানা দেখা যাবে তখন সেখান থেকে সত্যের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যারা ইজ্‌মার চিন্তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামের এলাকা অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। শরিয়াহর আলেমগণ বিভিন্ন দেশে এবং অধিকাংশ দূরবর্তী শহরে ছড়িয়ে রয়েছেন। সেখানে খবর পৌছাবার কোনো উপায় নেই। এ অবস্থায় কিভাবে বিশ্বের সমস্ত আলিমদের কাছে একটি বিষয় উপস্থাপন করার কথা কল্পনা করা যাবে এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত নেয়াও সম্ভব হবে? অথচ তাদের মধ্যে বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রতিভা, প্রজ্ঞা, মযহাব ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের পার্থক্য রয়েছে। যখন তাদের ইজ্‌মার কথা চিন্তা করা হবে তখন তাদের মতামতের তাদের থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌনপুণিক বর্ণনা কিভাবে সম্ভব হবে? এ অবস্থায় তাদের বক্তব্যে তিনটি সমস্যা দেখা দেবে।

এক. একটি বিষয় পূর্ণাংগরূপে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা দেখা দেবে।

দুই. তাদের ঐকমত্য কঠিন এবং হুকুম সন্দেহযুক্ত হবে।

তিন. নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌনপুণিক মতামত বর্ণনায় অক্ষমতা দেখা দেবে। তারপর তারা এ কথা বলে এ বিষয়টির ইতি টেনেছেন যে, আলিমদের কেউ যদি কোনো একটি মত পেশ করেন তাহলে অন্যেরা কে তা সমর্থন করবে এবং কে তার নিজের মতের ওপর অবিচল থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এরপর তাদের বিরুদ্ধে কাযীর সমালোচনা উল্লেখ করেছেন। কাযী বলেন : আমরা দেখছি কাফেরদের একটি প্রজন্মের আক্রমণাত্মক ভূমিকা। মুসলমানদের চাইতে

www.pathagar.com

তাদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তারা গোমরাহীর ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে। তাদের বাতিল চিন্তার সামান্যতম জ্ঞানও তারা লাভ করছে। এতে যখন তাদের কোনো বাধা হচ্ছে না তখন দ্বীন ইসলামের অনুসারীদেরও এতে কোনো বাধা হবে না। যদি আমরা শাখা-প্রশাখা ও ছোটখাটো বিষয়ের ক্ষেত্রে এর অপরিহার্যতা প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে আমরা স্থানের পার্থক্য, পরিবর্তন ও দূরত্বের কারণে শাফে'য়ী আলিমগণের তাদের মযহাবের বিভিন্ন বিষয়ে ইজ্‌মার কথা জানি, এগুলো তাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছে, এক্ষেত্রে এগুলোকেও তাহলে বাতিল করতে হয়। এরপর কাযী বলেন : মুসলমানদের দেশে অন্য একটি অমুসলিম দেশ তাদের অভিলাস চরিতার্থ করতে পারছে, সেখানে সুস্পষ্টভাবে অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারছে নিজেদের উন্নত মূল্যবোধের এবং আশপাশের দেশগুলোর ওপর নিজেদের ফায়সালা চাপিয়ে দিতে পারছে। এসবগুলো যদি তারা করতে পারে তাহলে মুসলিম বিশ্বের আলিমদের একটি মজলিসে একত্র হয়ে একটি বিষয়ের আলোচনা করা এবং তার সপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত সুস্পষ্ট করা অসম্ভব হবে কেন? এই ধরনের চিন্তা একটি জাজ্বল্যমান সত্য। এটা কোনো বিরল অলৌকিক ঘটনা নয়।

তারপর ইমামুল হারামাইন রহ. এ বিতর্কিত বিষয়ে নিজের রায় সুস্পষ্ট করে বলেন : এখন আমরা অগ্রবর্তী প্রয়োজনের জন্য যারা ইজ্‌মা নিষিদ্ধ মনে করে না তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করবো। এর আওতায় পড়ে মিল্লাতের আকীদা বিশ্বাসের নিয়মগুলোর সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়। যদি এ ধরনের বিষয়গুলোর সম্পর্কের ফলে মন মানসিকতার উন্নয়ন ঘটে তাহলে বুদ্ধিজীবিদের চিন্তা-ভাবনা দ্বীনের বড় বড় বিষয়ের আওতাধীন থাকবে। কাযী কাফেরদের ধর্মীয় বিষয়ে একত্র হওয়া সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত করেন তা এরই অন্তর্ভুক্ত। আবার ইমামের মযহাবের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একমত হয়ে যাওয়াও এরই অন্তর্ভুক্ত হয়।

যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুসরণ করার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। এভাবে সামাজিক ব্যবস্থা গ্রথিত হয়। সকল সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বিষয়ে এটিই একটি প্রচলিত রীতি। এ থেকে কাযী সমগ্র আলেম সমাজের উপস্থিতির কথা চিন্তা করেছেন। এটা কোনো অস্বীকার করার মতো বিষয় নয়। এ অবস্থায় বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল মহান বাদশাহর জন্য ঠিক এমন পর্যায়ের যেন তিনি স্বচক্ষে সেখানকার সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। কাজেই সে সম্পর্কে যা বলা হয় তা যা চিন্তা করা হয় তা থেকে ভিন্ন কিছু হয় না।

আর যন্নী হুকুমের ক্ষেত্রে কোনো একক বিষয়ে সবার একত্র সমাবেশ ফরয হওয়ার ব্যাপারটি দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। আলেমগণের বিভিন্ন দূর দেশে পৃথক পৃথক অবস্থান, বিশেষ করে তাদের সমাবেশের উদ্যোগ যেখানে অনুপস্থিত সে ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় সংস্কারের আওতায় এটা কল্পনাই করা যায় না।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে ইজ্‌মার চিন্তা করা বা চিন্তা না করা বড়ই অস্থিতিশীল ব্যাপার। আর বিস্তারিত বক্তব্য যখন ঋণাত্মক বা ধনাত্মক হয় তখন তার একটির নিষিদ্ধ হওয়া অন্যটির সিদ্ধতার প্রমাণ উপস্থাপন করে। আমাদের যুগে ব্যাপকতর উদ্যোগের অভাব সত্ত্বেও কোনো যন্নী বিষয়ে ইজ্‌মা অনুষ্ঠানের ধারণা গভীর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। সাহাবায়ে কেরামের জামানা পর্যন্ত বড় বড় বিষয়ে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তখন তাঁদের অবস্থান পরস্পরের নিকটবর্তী ছিল[১৫০]।

কাযী ও অন্যরা ইজ্‌মার অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানের ধারণা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সে ব্যাপারে এটিই হচ্ছে ইমামুল হারামাইনের অভিমত। এ সঙ্গে একক যন্নী বিষয়ের ওপর ইজ্‌মা সম্পর্কে ইমামুল হারামাইন বলেন : তার অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। বিশেষ করে সাহাবায়ে কিরামের জামানার পরে। সাহাবাগণ তাঁদের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে তাঁদের যুগের বড় বড় সমস্যার ওপর ইজ্‌মা অনুষ্ঠানে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এ প্রশ্ন থেকে যায় : তাঁদের সামনে যে সমস্যা পেশ করা হয়েছিল এবং যেটি ইজতিহাদী সমস্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে ব্যাপারে ফতোয়া দেবার জন্য কি কার্যত তাঁরা একত্র হয়েছিলেন?

সম্ভবত এর জবাবে বলা হবে, সে যুগে সাহাবাদের মধ্যে এমন অনেক সমস্যা ছিল যেগুলোর ব্যাপারে তাঁদের মতবিরোধ জানা যায়নি। আহকাম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে এটিই সাধারণ কথা। তবে এক্ষেত্রে তাঁরা একমত হয়ে রায় দিয়েছেন এবং তাঁদের বিরোধী অভিমত নেই, এ দাবী অবশ্যই প্রমাণ সাপেক্ষ।

এ যুগের পরবর্তীকালে ইসলামের বিস্তার ঘটেছে, মুসলিম ফকীহগণ বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন এবং পরবর্তীকালের প্রতিভাবাবন ফকীহগণ, যারা পূর্ববর্তীগণের অনুসারী ছিলেন এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক বিরোধ সত্ত্বেও যাদের সংখ্যা ছিল অগণিত, তাদের ব্যাপারে আমরা উপরোল্লিখিত ধরনের ইজ্‌মার দাবী করি না, যা আমাদের মন সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে। কারণ এ যুগে আবার এমন অসংখ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে যে ব্যাপারে আলিময়ে কিরামের মতবিরোধের কথা জানা যায়নি। ইমাম আহমদের রহ. উক্তি এ ব্যাপারটি আমাদের সামনে আরো পরিস্কার করে দিচ্ছে। তিনি বলেছেন[১৫১] : যে ব্যক্তি ইজ্‌মার দাবী করে সে মিথ্যুক। সম্ভবত লোকেরা মতবিরোধ করেছে কিন্তু তা সবার কাছে

---

[১৫০] মাকতাবা আল আযহার প্রণীত আল বুরহান, ৯১৩ নম্বর পাণ্ডুলিপি।

[১৫১] ইমাম আহমদ ইবনে হামবল আবু আবদুল্লাহ আশ্ শাইবানী। হাম্বলী মযহাবের ইমাম। অত্যন্ত পরিশ্রমী। ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরিতে সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

পৌঁছেনি বলে বলা হয়েছে, লোকদের মতবিরোধের কথা আমরা জানি না। কোনো কোনো হাম্বলী ফকীহ মনে করেন, ইমাম আহমদ রা., সাহাবা রা. ছাড়া অন্যদের ইজমার কথা বলেছেন। সাহাবাগণের ইজ্‌মা একটি দলিল এতে সন্দেহ নেই। কারণ তাঁদের সংখ্যা স্বল্প হবার কারণে সেখানে তাদের জমায়েত হওয়ার ধারণা করা যেতে পারে। অন্যদিকে বর্তমানে ফকীহদের সংখ্যা বিপুল এবং তারা ছড়িয়ে রয়েছেন। রাযী বলেন : আসলে সাহাবাগণের জমানা ছাড়া অন্য কোনো সময়ে এর যথার্থরূপ জানার কোনো পথ আমাদের সামনে নেই[১৫২]।

ইজমার প্রামাণিকতা

ইজ্‌মা একটি বহুল আলোচিত প্রমাণ এবং উসূলবিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে বহুতর মতবিরোধ দেখা যায়। এরপরও অধিকাংশ ফকীহর মতে এটি একটি অকাট্য প্রমাণ। অবশ্য নিযাম, শিয়া ও খারেজীগণ এর বিরোধিতা করেন। ইমামুল হারামাইন তাঁর আল বুরহান গ্রন্থে বলেন : সর্বপ্রথম নিযাম ইজ্‌মা প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর শিয়াদের একটি গ্রুপ তাঁর পথ অনুসরণ করে। অবশ্য তাদের কেউ কেউ ইজমার প্রমাণ হওয়ার কথাও বলে থাকবেন এবং এর ফলে তিনি তাতে জড়িয়ে পড়েন। কারণ তাঁর মতে, মাসূম বা নিস্পাপ ব্যক্তির উক্তির মধ্যেই রয়েছে প্রমাণ। এটা শিয়াদের ধারণা। তারা বলে থাকে, ইমামের উক্তিই প্রমাণ এবং এরি ভিত্তিতে তারা দলিল সংগ্রহ করে[১৫৩]।

সমগ্র মুসলিম উম্মত ভুল করতে পারে না, এ ধরনের চিন্তার ভিত্তিতে ইজ্‌মার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অথচ কুরআন ও সুন্নাতে মুতাওয়াতির ছাড়া একে প্রতিষ্ঠিত করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। কারণ ইজ্‌মার সাহায্যে ইজ্‌মাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

কুরআনের সমস্ত আয়াত চূড়ান্ত অর্থ প্রকাশকারী নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে[১৫৪]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন :

---

[১৫২] উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪।

[১৫৩] মাকতাবা আল আযহার প্রণীত আল বুরহান, ৯১৩ নম্বর পাণ্ডুলিপি দেখুন।

[১৫৪] সুরা আল ইমরান- ১১০ আয়াত।

www.pathagar.com

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ

এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থা জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও[১৫৫]।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন :

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

তোমরা সবাই আল্লাহ্ তায়ালার রশিকে মজবুত করে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না[১৫৬]।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন :

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً

কারো কাছে সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রসুল সা.-এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করবো, আর তা কত মন্দ আবাস[১৫৭]!

এগুলো সবই বাহ্যিক। এগুলোর উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয়। শেষের আয়াতটি এ ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী। এখানে মুমিনদের পথের অনুসরণকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এ পথের বিরোধিতাকারীকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং এর ফলে এর অনুসরণ ওয়াজিব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইমাম গাজ্জালী রহ.র মতে, আয়াতটি উদ্দেশ্যগত নয় বরং বাহ্যিকভাবে নস্ হিসেবে স্বীকৃত। এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি রসুল সা.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগে এবং তাঁর অনুসরণ, তাঁকে সাহায্য ও তাঁর প্রতি শত্রুতা নির্মূল করার ক্ষেত্রে মুমিনদের পথ পরিহার করে অন্য পথের অনুসারী হয় তাকে তার পথেই ফিরিয়ে দেয়া হবে, যেন সে কষ্ট পরিহার করার ওপর নির্ভর না

---

[১৫৫] সুরা আল বাকারাহ- ১৪৩ আয়াত।

[১৫৬] সুরা আলে ইমরান, ১০৩ আয়াত।

[১৫৭] সুরা আন নিসা, ১১৫ আয়াত।

www.pathagar.com

করে। শেষ পর্যন্ত তাকে সাহায্য ও সংরক্ষণ করার এবং আদেশ নিষেধের অনুগত থাকার ব্যাপারে মুমিনদের পথ অনুসরণ তার সাথে যুক্ত হয়। বাহ্যত এ অর্থই এখানে উপলব্ধি করা যায়। আর যদি বাহ্যত উপলব্ধি না হয় তাহলে এটিই সম্ভাব্য অর্থ[১৫৮]।

আর সুন্নাত সম্পর্কে বলা যায় যে, এ ব্যাপারে নবি সা. বলেন,

لا تجتمع أمتي على الضلالة

আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর ওপর একমত হবে না[১৫৯]।

হাদিসটির শব্দগুলো অধিকতর শক্তিশালী এবং উদ্দেশ্যও অনেক স্পষ্ট। কিন্তু এটি কিতাবের মতো তেমন অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য নয়। আর কিতাব অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য নসের ভিত্তিতে নয়। কাজেই এক্ষেত্রে প্রমাণ প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে এভাবে বলা যায় : এ উম্মতের ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা সম্পর্কে রসুল সা. থেকে বিভিন্ন শব্দযোগে হাদিস বর্ণিত হলেও এগুলোর অর্থের মধ্যে অভিন্নতা আছে।

উমর, ইবনে মাসউদ রা., আবু সাঈদ খুদরী রা., আনাস ইবনে মালেক রা., ইবনে উমর রা. ও আবু হুরাইরা রিদওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমায়ীন প্রমুখগণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য সাহাবাগণ বর্ণিত হাদিস থেকে একথা বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন তাদের বর্ণিত হাদিসগুলোতে বলা হয়েছে :

لا تجتمع امتي على الضلالة

আমার উম্মত গোমরাহীর ওপর একমত হবে না।

لم يكن الله يجمع امتي على الضلالة

আল্লাহ তায়ালা কখনোই আমার উম্মতকে গোমরাহীর ওপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না।

سألت الله ألا يجمع امتي على الضلالة فأعطانيها

---

[১৫৮] আল মুস্তাস্ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৫, আল হুজ্জীয়াতুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩, রওদাতুন নাযের, পৃষ্ঠা ৬৭, আলী ইবনুল হাজেব লিখিত শারহুল আদুদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১, আত্ তালবীহ্ এর ওপর লিখিত আলগুনরীর হাশিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৯, তানকীহুল ফুসূল, ১৪১ পৃষ্ঠা এবং তাফসীর ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১৩।

[১৫৯] ইবনু মাজা ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন করলাম আমার উম্মতকে গোমরাহীর ওপর ঐক্যবদ্ধ না করতে। তিনি আমার আবেদন গ্রহণ করলেন।

يد الله مع الجماعة

জামায়াতের সাথে রয়েছে আল্লাহ্ তায়ালার হাত।

ولا يبالى الله بشذوذ من شذ

যে ব্যক্তি দলছুট হয়ে যায় আল্লাহ্ তায়ালার তার কোনো পরোয়া নেই।

এ অর্থে এ ধরনের আরো বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে[১৬০]।

এ বর্ণনা সাহাবা রা., তাবেয়ী ও পরবর্তী লোকদের মধ্যে পরিচিত লাভ করেছে এবং উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণনাকারীদের মধ্যে থেকে একজনও এর প্রতিবাদ করেননি। বরং উম্মতের পক্ষ-বিপক্ষ সকল গ্রুপের কাছেই তা জনপ্রিয় হয়েছে। দ্বীনের মূলনীতি ও খুটিনাটি বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ সবসময় এর মুখাপেক্ষী হয়েছে এবং এটি তার স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে মুসলিম উম্মাহ একযোগে একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, যেখানে স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন এবং শক্তি-সামর্থ ও গ্রহণ-বর্জনের মতামতের ক্ষেত্রে পার্থক্য ও ব্যবধান রয়েছে সেখানে সম্মতির নির্ভুলতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর এ কারণেই খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে তার বিরোধীর বিরোধিতায় এবং তার মধ্যে সন্দেহ প্রকাশের ব্যাপারে হুকুম প্রমাণিত হয় না[১৬১]।

সারকথা হচ্ছে, বিভিন্ন যুগে মুসলিম উম্মাহ ইজ্মাকে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং নির্ভরযোগ্য উলামায়েকেরামও একে আইন প্রণয়নের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এমনকি প্রত্যেক যুগের ফকীহগণ পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের রায় অস্বীকারকারীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আসলে তাঁদের এ ধরনের একাত্মতা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে ছিল না বরং তাঁদের কাছে এর সপক্ষে চূড়ান্ত ও অকাট্য দলিল ছিল।

আর ইজ্মার ওপর আমল করা তার বর্ণনা পরম্পরা জানার ওপর নির্ভরশীল নয়, যদিও কোনো কোনো ফকীহ বলেন : ইজ্মার যুক্তি বা নিদর্শনের বর্ণনা অবশ্যই

---

[১৬০] আল মুস্তাস্ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৫।

[১৬১] উসুলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৩১৬।

www.pathagar.com

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় আসতে হবে। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছাড়া ভুল অবশ্যম্ভাবী। আবার অনেক ফকীহ একথা ভাবেননি[১৬২]।

বিষয়টি যার কাছে হস্তান্তর করা হয় তার পক্ষে ইজ্‌মা হচ্ছে চূড়ান্ত ও অকাট্য নসের মতো। এ ব্যাপারে বিবেচনা করার কোনো অবকাশই নেই। বরং কোনো প্রকার বর্ণনা বা ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। তবে কোনো কোনো ফকীহর মতে, ইজমার প্রমাণ হওয়া দলিল বা সনদের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং এ উম্মতের জন্য তার মর্যাদাপূর্ণ সত্তার এবং শরিয়াহর আহকামের স্থায়িত্বের কারণেই তা প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত[১৬৩]।

ইজমা সংক্রান্ত আর একটি আলোচনা আছে, যা বিপুলভাবে আলোচিত। সে প্রসঙ্গে যাবার ইচ্ছা আমাদের নেই। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরিয়াহর শ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য আলিমগণ যে একে শরিয়াহর নির্ভরযোগ্য দলিল গণ্য করেন একথা বিবৃত করা। কাজেই এর প্রকারভেদ, শ্রেণিভেদ ও মুজতাহিদগণের শর্তাবলি ইত্যাদি বিষয়াবলি ইজ্‌মা সংক্রান্ত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থান লাভের আওতার বাইরে থেকে যায়।

চতুর্থ দলিল : কিয়াস

কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ সমান করা। বলা হয়ে থাকে, দু'টি বিষয়ে যখন, সামঞ্জস্য আছে তখন একটিকে অন্যটির ওপর কিয়াস করো। শরিয়াহর দৃষ্টিতে : হুকুমের ক্ষেত্রে মূলের সাথে শাখার যে সমতা তাকে বলে কিয়াস। কাজেই এটা হচ্ছে, শব্দকে তার কতক নামের ভিত্তিতে বিশেষত্ব দান করা। যেমন দুনিয়ার কোনো এলাকার মালবাহী পশুর মধ্যে থেকে কোনো বিশেষ নামের পশুকে বিশেষত্ব দান করা।

কিয়াসের সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উসূলবিদগণের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকেই বিপক্ষের যাবতীয় আপত্তির জবাব দিয়ে নিজের সংজ্ঞাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। এজন্য আমরা দেখি ইমাম আল-গাজ্জালী রহ. তাঁর শিফাউল গালীল গ্রন্থে এর দু'টি সংজ্ঞা দিয়েছেন। একটি সংজ্ঞার বক্তব্য হচ্ছে, কিয়াসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা এবং দ্বিতীয় সংজ্ঞার বক্তব্য হচ্ছে, কিয়াসের সংজ্ঞার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় আপত্তির জবাব দেয়া প্রসঙ্গে।

---

[১৬২] আলী ইবনুল হাজেব, শারহুল আদুদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯, আল আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৪।

[১৬৩] তালবীহ এর উপর লিখিত আল গুনরীর হাশীয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৮।

www.pathagar.com

তিনি বলেন : কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যাভিমুখে সুস্পষ্ট বক্তব্য এভাবে উপস্থাপন করা যায়। কিয়াস বলা হয় শাখার মধ্যে মূলের হুকুম প্রমাণ করাকে। এভাবে হুকুমের ইল্লাত তথা কার্যকারণের মধ্যে তাদের উভয়ের অংশগ্রহণ হয়। অতঃপর তিনি বলেন : বর্ণনার ক্ষেত্রে এতটুকু মূল্যমানই যথেষ্ট। কিন্তু মুতাকাল্লিম ও ন্যায় শাস্ত্রবিদদের বক্তব্যে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যদি আপনি সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে কোনো বক্তব্য পেশ করতে চান তাহলে আমি বলবো :

এটা হচ্ছে গুণের মধ্যে অংশগ্রহণ অথবা গুণ নির্বাচন করে কিংবা হুকুমের মধ্যে অংশগ্রহণ বা হুকুম নির্বাচন করে হুকুমকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক করার ক্ষেত্রে পরিচিত জিনিসের উপর পরিচিত জিনিসকে উপস্থাপন করা। তারপর তিনি বলেন : সব ধরনের বক্তব্যের জন্য এটি উপযোগী এবং এর সবদিক একত্রকারীও। প্রথমটিই আমাদের চাহিদা মোতাবেক বর্ণনায় সমৃদ্ধ। তাতে কিয়াসের অর্থ বর্ণিত হয়েছে এবং তা হুকুমের কার্যকারণের বর্ণনা সমন্বিত। এককথায় বলা যায়, কিয়াস করা হয় দু'টি জিনিসের মধ্যে সমতা নির্ণয়ের জন্য[১৬৪]।

কাজেই কিয়াসের সংজ্ঞা হচ্ছে : যে বিষয়ে কোনো নস্ নেই শরিয়াহর হুকুমের মধ্যে যার জন্য নস্ রয়েছে এ হুকুমের কার্যকারণে তাদের উভয়কে শরীক করে সে বিষয়ের সাথে তাকে সংশ্লিষ্ট করা।

এ সংজ্ঞা থেকে তার চারটি মূল স্তম্ভ নির্ণীত হয় :

১. যার উপর কিয়াস করা হয়। আর সেটি হচ্ছে এমন একটি ঘটনা যার হুকুম বর্ণনা করার জন্য নস্ আরোপিত হয়েছে এবং তাকে আসল আখ্যা দেয়া হয়।

২. যাকে কিয়াস করা হয়। আর এটি হচ্ছে এমন একটি ঘটনা যার হুকুম বর্ণনা করার জন্য নস্ আরোপিত হয়নি এবং তাকে ফারা বা শাখা বলা হয়।

৩. শরিয়াহর এমন হুকুম যার সাথে মূলত নস্ সংশ্লিষ্ট হয় এবং তা থেকে তার শাখার দিকে ফেরার অর্থ নেয়া হয়।

---

[১৬৪] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১১-১২। আল মুস্তাস্ফা, তারীফুল কিয়াস, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৮। জামউল জাওয়ামে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৮, আল মুতামিদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৯৭। আল আহ্কাম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬১। ইবনুল হাজেব, শারাহ মুখতাসার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫০। বায়দাবী, কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬৮। কারাফী, তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৬৫। রওদাতুন নাযের, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৬। শারহু মুসাল্লামুস সুবুত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৬। নিবরাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ৯-৪৬। আল মিরআতু ফিল উসূল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৫।

www.pathagar.com

৪. ইল্লাত বা কার্যকারণ। এটি হচ্ছে একটি সংহত ও প্রকাশিত গুণ, যা হুকুমের মূল থেকে শুরু হয়েছে এবং শাখার মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

কিয়াসের রূপরেখা

যেমন বলা হয়ে থাকে : হাদিসে বলা হয়েছে لا يرث القاتل অর্থাৎ হত্যাকারী উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে না। এ হাদিসটি এ হুকুম প্রমাণ করে যে, হত্যাকারীর জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি হচ্ছে ঘটনা। মুজতাহিদ তাঁর ইজতিহাদের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে এ হুকুমের সাহায্যে শরিয়াহ প্রণেতার কাংখিত মাসলিহাত হচ্ছে : সময়ের পূর্বে কোনো বিষয়কে ত্বরান্বিত করা থেকে বিরত রাখা এবং অপরাধীকে তার অপরাধ কর্মের লাভ থেকে বঞ্চিত করা। এ থেকে মুজতাহিদ প্রকাশ্য কার্যকারণ নির্ণয়ে সক্ষম হন এবং শরিয়াহ প্রণেতাই সেটিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, আর সেটি হচ্ছে হত্যা। কারণ হত্যা প্রতিরোধের সাথে ঐ মাসলিহাত সম্পাদনের সম্পর্ক রয়েছে।

এখন তার জন্য অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির তথা অসিয়তকারীর হত্যাকারীর ঘটনা সামনে আনা হলো। মুজতাহিদ দেখলেন, তার মধ্যে যে হুকুম আছে একই হুকুম দেয়া হয়েছে হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে। শরিয়াহ প্রণেতা সেখানে মাসলিহাত সম্পাদন করেছেন। শরিয়াহপ্রাপ্ত তথা অসিয়তকারীর হত্যাকারীকে হুকুমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করেছেন। উত্তরাধিকারী তথা উত্তরাধিকার দাতার হত্যাকারীর সাথে তাদের উভয়কে কার্যকারণে সমানভাবে শামিল করার জন্য। আর এভাবে উত্তরাধিকার দাতার হত্যাকারীর উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে থাকে নসের সাহায্যে। এটি একটি ঘটনা, যাকে নসের ওপর আরোপ করা হয়েছে। আর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি তথা অসিয়তকারীর হত্যাকারীর জন্য উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিয়াসের ভিত্তিতে। এটি এমন একটি ঘটনা নস্ যার হুকুম প্রত্যাখ্যান করেনি[১৬৫]।

নস্ থেকে যে ঘটনার হুকুম নির্ণীত হয়েছে তার কার্যকারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে কিয়াসের কার্যক্রম শুরু হয়। উসূলবিদগণ এ কার্যক্রমকে তাখরীজ তথা নিষ্পন্ন নামে অভিহিত করেছেন। তারপর এই কার্যকারণকে এমন একটি ঘটনার মধ্যে প্রয়োগ করার আলোচনা চালিয়েছেন যার পক্ষে কোনো নস্ নেই। এর নাম দেয়া

---

[১৬৫] কারাফী, তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৬৮। জামউল জাওয়ামে আত্তারের হাশিয়াসহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২, আল মিরআতু ফিল উসূল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮২, শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, মাসাদিরুত তাশ্‌রী ফীমা লা নাস্‌সা ফীহ, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

www.pathagar.com

হয়েছে তাহকীক অর্থাৎ প্রয়োগ। এটি এমন একটি কার্যকারণের প্রয়োগ শাখা তথা খুটিনাটি বিষযে যে কার্যকারণ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর এ হুকুমটি এমনভাবে অনুবর্তী হয়েছে যার ফলে ঘটনা দুটি কার্যকারণের মধ্যে সমান পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। আর এরই ওপর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে হুকুমের মধ্যে দু'টি ঘটনার সমতা বিধানের। এটিই কিয়াসের উদ্দেশ্য।

কিয়াসের প্রামাণিকতা

শরিয়াহর নির্ভরযোগ্য আলিমগণের নিকট এটি একটি দলিল। ইবনে হাযম রহ.[১৬৬]-এর ন্যায় যাহের পন্থী ও খারেজীগণ অবশ্য একে শরিয়াহর বিধানের জন্য দলিল মনে করেন না। কারণ তাদের মতে মানবজীবনের সমস্ত ঘটনা আভিধানিক অর্থে নসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এজন্য কোনো কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই। আর দাউদ ইসফাহানী রহ. অনুচ্চ কণ্ঠে কিয়াস নিষিদ্ধ করার কথা বলেন[১৬৭]।

অন্যদিকে কিয়াসের প্রবক্তাগণ কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাগণের ইজ্‌মা থেকে কিয়াস প্রমাণ করেছেন।

কুরআন থেকে কিয়াসের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

হে চক্ষুষ্মানরা, উপদেশ গ্রহণ করা।

এ আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে فَاعْتَبِرُو। শব্দটি। আরবিতে إعتبار শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোনো বস্তুকে তার নজিরের ওপর স্থাপন করা। অথবা এটি عبرة ও عبور অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হয় সুস্পষ্ট করা। কিংবা এটি عبور এর ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হয় স্থানান্তর ও অতিক্রম করা। আর এ তিনটি অর্থেই কিয়াস ব্যবহৃত হয়। পূর্ণ ব্যবহৃত হয় অংশের ওপর। এর মধ্যে শাখা তার

---

[১৬৬] ইবনে হাযম ছিলেন আন্দালুসিয়ার ফকীহ। তিনি কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে সাঈদ ইবনে হাযম। ৪৫৬ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। যরকালী লিখিত আল আ'লাম গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৫৪-৫৯ এবং শায়খ আবু যোহরা লিখিত ইবনে হাযম গ্রন্থটি দেখুন।

[১৬৭] আত্তারের হাশিয়াসহ জামউল জাওয়ামে খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২, আল-মিরআহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮২।

www.pathagar.com

অনুরূপ কার্যকারণের সাহায্যে অনুরূপ হুকুম প্রমাণ করার ক্ষেত্রে মূলের দিকে ফিরে আসে। আর মূলের কার্যকারণের অনুরূপ শাখার হুকুমকে সুস্পষ্ট করে এবং মূলের হুকুম অতিক্রম করে শাখার দিকে যায়। এভাবে সব ধরনের কিয়াসই উল্লেখিত বিষয়ের অধীন হয়[১৬৮]।

এখানে আরো আয়াত উপস্থাপন করা যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ

এরপর যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের মত বিরোধ হয় তাহলে তাকে আল্লাহ তায়ালা ও রসুল সা.-এর দিকে ফিরিয়ে দাও।

বলা হয়ে থাকে, এখানে فَرُدُّوهُ শব্দের মাধ্যমে যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তার তাৎপর্য হচ্ছে কিয়াস করা। কারণ এখানে এমন শাখাকে ফিরানো হচ্ছে যার পেছনে কোনো নস্ নেই এবং তাকে এমন মূলের দিকে ফিরানো হচ্ছে যার পেছনে নস্ আছে। আর এ নস্ই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও রসুল সা.-এর সুন্নাত[১৬৯]।

এটাহলো কুরআন থেকে কিয়াসের প্রমাণ। অন্যদিকে নবি সা.-এর সুন্নাতে বিভিন্নভাবে কিয়াসের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তিনি উমর রা.কে বললেন : যখন উমর রা. রোজা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন :

أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟

যখন তুমি পানি নিয়ে কুল্লি করো তখন কি তুমি পান করো?

এখানে নবি সা. কুলি করার পরে যখন পানি পান করা হয় না তখন তাকে চুম্বনের সাথে তুলনা করেছেন, যার পরে স্ত্রী সংগম করা হয় না। উভয় স্থানেই মূল উদ্দেশ্য সম্পাদন করা হয় না অর্থাৎ পানি পান ও স্ত্রী সংগম করা। এটিই হচ্ছে যথার্থ কিয়াস। খাছআমী মহিলাকে নবি সা. যা বলেছিলেন তা থেকেও কিয়াসের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন :

---

[১৬৮] সুরা আলহাশ্‌র, ২য় আয়াত। আলমিরআতু, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ২৭৮। তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৬৬। উসূলুস সারাখসী।

[১৬৯] সুরা আন নিসা, ৫৯ আয়াত। তাফসির ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪১-২২।

www.pathagar.com

أرأيت لو كان على ابيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى.

যদি তোমার পিতার ওপর ঋণের বোঝা থাকতো, তাহলে তুমি কি তা আদায় করতে? জবাবে মহিলা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে আল্লাহ তায়ালার ঋণ তো সর্বাগ্রে পরিশোধযোগ্য। এটি হচ্ছে যথার্থ কিয়াস[১৭০]।

তবে এ ব্যাপারে সর্বাধিক পরিচিত হচ্ছে মু'আয ইবনে জাবাল রা.এ হাদিস। যখন নবি সা. ইয়ামানে পাঠাচ্ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন :

بم تقض ؟ قال: بكتاب الله تعالى قال: فان لم تجد ؟ قال: بسنة رسول الله قال فان لم تجد ؟ قال أجتهد برأئي. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرض به رسوله.

তুমি কিভাবে সমস্যার সমাধান করবে? জবাব দিলেন : আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সাহায্যে। জিজ্ঞেস করলেন : যদি সেখানে কোনো সমাধান না পাও? জবাব দিলেন : তাহলে আল্লাহর রসুল সা.-এর সুন্নাতের সাহায্যে। জিজ্ঞেস করলেন : যদি সেখানেও কোনো সমাধান না পাও? জবাব দিলেন : তাহলে ইজতিহাদ করে আমার রায়ের ভিত্তিতে সমাধান করবো। নবি সা. বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি তাঁর রসুল সা.-এর প্রেরিতকে তাঁর রসুল সা.-এর ইচ্ছানুসারী করেছেন।

এখান থেকে বুঝা যায়, কিয়াস যদি দলিল না হতো তাহলে নবি সা. মু'আযের রায় অস্বীকার করতেন। বরং যখন তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করলেন তখন এ থেকে বুঝা গেলো কিয়াস একটি দলিল[১৭১]।

সাহাবাগণের অবস্থা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে জানা যায়, তাঁরা কিয়াসের ওপর আমল করেছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আবু মূসা আশআরীকে রা. পত্র লিখেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন : সামঞ্জস্যশীল বিষয় ও নজিরগুলো চিহ্নিত করুন। তারপর আপনার মনে যা নাড়া দেবে তার অনুরূপ বিষয়ের সাথে

---

[১৭০] তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৬৬।

[১৭১] মিরআতুল উসূল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮২।

www.pathagar.com

যথাযথভাবে তাকে সংশ্লিষ্ট করুন আর আসলে এটিই হচ্ছে কিয়াস। ইবনে আকীল হাম্বলী রহ. বলেছেন : সাহাবাগণ কিয়াসের ওপর আমল করেছিলেন, একথা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পরোক্ষ বর্ণনা পরম্পরায় জানা গেছে। এটিই চূড়ান্ত সত্য কথা। সফীউল হিন্দী রহ. বলেছেন : ইজ্‌মার দলিল হচ্ছে, গবেষক উসূলবিদগণের অধিকাংশই এর ওপর আমল করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. তাঁর আল মাহসূল গ্রন্থে বলেছেন : উসূলবিদগণের অধিকাংশই ইজমার ওপর নির্ভর করেছেন। ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. বলেছেন : সমগ্র পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর অংশ কিয়াসের ওপর আমল করে এসেছে। এটিই এর পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। পরবর্তী আলেমদের মধ্যে থেকে ব্যতিক্রমী দু-একজন ছাড়া কেউ একে অস্বীকার করেননি[১৭২]।

উপরিউক্ত দলিলগুলোর ভিত্তিতে আলেমগণের বৃহত্তম অংশ কিয়াসকে দলিল ও প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে একে শরিয়াহ আইন প্রণয়নের উৎস এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অন্যতম মনে করেছেন। যেসব সমস্যার ক্ষেত্রে কোনো নস্ নেই সেগুলোর ব্যাপারে বিধান উদ্ভাবন করার জন্য মুজতাহিদকে প্রথম পদ্ধতি হিসবে এ, কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এটি ইজতিহাদের অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সুস্পষ্টতর। বিশেষ ইজতিহাদের মধ্যে এটি গণ্য। আবার কখনো একে যার জন্য কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে তার ওপর কার্যকারণ আরোপ করার কারণে পরোক্ষ ইজতিহাদ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, কিয়াস ইজতিহাদের মুখাপেক্ষী। এটি তার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু ইজতিহাদ কিয়াসের মুখাপেক্ষী নয়। কারণ বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শরিয়াহভিত্তিক নির্ভরযোগ্য উপাদানের সাহায্যে কিয়াস বা অন্যকিছুর মাধ্যমে সত্য সন্ধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নাম ইজতিহাদ। অধিকাংশ আলিম এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ সঙ্গে তাঁরা একথাও বলেছেন যে, এ দু'টি একই জিনিস। এ উক্তিটি ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে[১৭৩]।

---

[১৭২] তাফসির আল মানার থেকে স্বতন্ত্রভাবে উসুল আত্ তাশরীউল আম, পৃষ্ঠা ৬৭ দেখুন।

[১৭৩] আল ইমাম আশ-শাফেয়ী মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনে উসমান আল হাশেমী আল মুত্তালিবী। ১৫০ হিজরিতে সাবায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্তিকাল করেন কায়রোয় ২০৪ হিজরি সনে। তিনিই প্রথম উসূলুল ফিক্‌হ রচনা করেন। তাঁর আর রিসালা নামক কিতাবটিকে সবচেয়ে পুরাতন কিতাব বিবেচনা করা হয় বরং ইসলামি ফিকহের উসূল সংক্রান্ত কিতাবাদির মধ্যে এটিকে সর্বপ্রথম কিতাব বলা হয়। তারিখে বাগদাদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬, হুলিয়াতুল আউলিয়া খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৩, তাবকাতুশ শাফেয়ীয়া খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৮৫, ইবনে হাতেমের আদাবুশ শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু, আমাদের উস্তাদ শায়খ আবদুল গণী আবদুল খালেকের গবেষণা এবং রাযীর মানাকিবুশ শাফেয়ী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা (পার্ট - ২)

খ. সামাজিক বিজ্ঞান

আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলায়মান	
ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ	৬০/-
ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	২৫০/-
আকরাম জিয়া আল উমরী *পিএইচডি*	
রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খন্ড)	১৫০/-
রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খন্ড)	১৭০/-
আবদুর রশিদ মোতেন	
রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামি প্রেক্ষিত	১৫০/-
তাহির আমিন	
জাতীয়তাবাদ ও আর্ন্তজাতিকতাবাদ : উদারতাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম	১০০/-
মোহাম্মদ হাশিম কামালি *পিএইচডি*	
ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা	২৫০/-
মুহাম্মদ আল ব্যুরে *পিএইচডি*	
প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামি প্রেক্ষিত	৩০০/-
জাফর ইকবাল *পিএইচডি*	
শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামি প্রেক্ষিত	১৫০/-
প্রফেসর আবদুন নুর	
লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা	২৬০/-
অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন মজুমদার (সম্পাদনা)	
আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ	৬০/-
এম আবদুল আযিয *সম্পাদিত*	
গণতন্ত্র ও ইসলাম	১০০/-
সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম	৮০/-
আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান *পিএইচডি* **ও প্রফেসর জেফরি লাং** *পিএইচডি*	
বৈবাহিক সমস্যা ও কুরআনের সমাধান	৩০/-
আল্লামা খররুম জাহ্ মুরাদ	
সুবহে সাদিকঃ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের নির্দেশনা	১২০/-
মূল্যবোধ, ক্ষমতা ও সমাজ পরিবর্তন ইসলামী কর্মকৌশল	২০০/-
মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি *পিএইচডি*	
ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ : ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা	১২০/-
Syed Sajjad Husain *PhD*	
Civilization and Society	৩০০/-
A Young Muslim's Guide to Religions in the World	২০০/-
Shah Abdul Hannan	
Social Laws of Islam	৪০/-

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করে তাদের প্রতি করুণা করেছেন। তাদের একাকী ছেড়ে দেননি। বরং তাদের প্রতি রসুল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে এনেছেন। তাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। এভাবে তাদের রক্ষা করেছেন পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী থেকে।

এ রসুলগণ সবাই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটিমাত্র দ্বীন-জীবনবিধান এনেছেন। তাঁরা বিভিন্ন শরিয়াহ এনেছেন। এর মূলনীতিগুলো অভিন্ন। বড় বড় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে শরিয়াহ প্রদান করা হয়েছে তাতে হত্যা, যিনা ও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করার বৈধতা প্রদান করা হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করার জন্য তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বিধান দিয়েছেন। এ বিধান অনুযায়ী তারা জীবনে শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং এমন আইন-কানুন রচনা করবে যা তাদের জীবনকে সৎবৃত্তি ও কল্যাণে ভরে দেবে।

বান্দাদের জন্য প্রদত্ত আল্লাহ তায়ালার এ শরিয়াহগুলোর চূড়ান্ত লক্ষ একটিই এবং সেটি হচ্ছে ইহকালে ও পরকালে সাফল্য লাভ করা।

একথা নিসন্দেহে বলা যায়, সমস্ত আসমানী কিতাবের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সৎপথ দেখানো এবং অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আনা। এভাবেই সেখানে বিধান ও নিয়ম-কানুনের সমাবেশ করা হয়েছে। কুরআন করীমে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। রসুল প্রেরণ করা, কিতাব অবতীর্ণ করা, বিশেষ করে শেষ নবি মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কুরআনুল করীমে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রসুল প্রেরণ করেছি, যাতে রসুল আসার পর আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে[১০৪]।

---

[১০৪] সুরা নিসা, ১৬৫ আয়াত।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা রসুল সা. সম্পর্কে বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি[১০৫]।

কিতাবসমূহ নাযিল সম্পর্কে বলেছেন :

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বনি ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক[১০৬]।

তিনি বলেছেন :

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ- مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ

তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তওরাত ও ইনজীল- ইতোপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য[১০৭]।

বিশেষ করে কুরআনের মাধ্যমে মুসলমানদের কল্যাণ নির্ধারণ করে বলেছেন :

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে নিয়ে আসতে পার, অন্ধকার থেকে আলোকে।

তিনি বলেছেন :

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً

---

[১০৫] সুরা আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত।

[১০৬] সুরা ইস্‌রা, ২ আয়াত।

[১০৭] সুরা আলে ইমরান, ৩-৪ আয়াত।

www.pathagar.com

এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার[১০৮]।

তিনি আরো বলেন :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

এটি সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ[১০৯]।

এছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সংক্রান্ত ছোট-খাটো অনেক বিষয়ের বিধানও সেখানে দেয়া হয়েছে। যেমন সালাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

অবশ্যই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে[১১০]।

সওম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো[১১১]।

যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

তাদের সম্পদ থেকে সাদ-কা গ্রহণ করবে। এর সাহায্যে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে[১১২]।

হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

---

[১০৮] সুরা ইসরা, ৯ আয়াত।

[১০৯] সুরা বাকারা- ২ আয়াত।

[১১০] সুরা আনকাবুত, ৪৫ আয়াত।

[১১১] সুরা বাকারা, ১৮৩ আয়াত।

[১১২] সুরা তওবা, ১০৩ আয়াত।

www.pathagar.com

আর মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সকল প্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে চড়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে[১১৩]।

কিসাস সম্পর্কে বলেন :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো[১১৪]।

মদ সম্পর্কে বলেন :

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

মদ থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো[১১৫]।

পূর্বোক্ত আলোচনাগুলো থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের একাকী ছেড়ে দেননি। বরং তাদের মেহেরবাণী করে সৃষ্টি করার পর তাদের কাছে রসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সুসংবাদ এনেছেন এবং ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রয়েছে সত্য, ন্যায় ও ইহকাল-পরকালের কল্যাণের দিক নির্দেশনা। আর আছে মানুষের জীবনে এই কল্যাণ সাধনের জন্য ছোট বড় সকল প্রকার বিধান। আল্লাহ্ তায়ালার সমস্ত বিধান মানুষের কল্যাণার্থেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলেমগণের বক্তব্য এ বিধানের ক্ষেত্রে অভিন্ন। তবে তাদের ব্যাখ্যার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে[১১৬]। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

---

[১১৩] সুরা আল হাজ্জ, ২৭-২৮ আয়াত।

[১১৪] সুরা আল বাকারা, ১৭৯ আয়াত।

[১১৫] সুরা আল মায়েদা, ৯০ আয়াত।

[১১৬] আল মাওয়াফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩। নিব্রাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৮। মাজমুআ রাসায়েল ফী উসূলিল ফিক্হ, ৬১২ দারুল কুতুব মিসর, পৃষ্ঠা ৫১। মাকাসিদুশ শারিয়াহ, শায়খ মুহাম্মদ আনিস উবাদাহ, পৃষ্ঠা ৯।

www.pathagar.com

প্রথম অনুচ্ছেদ

লক্ষ্যসমূহ

আলোচনাটিকে তিনটি বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম বিষয় : লক্ষ্যের আভিধানিক ও শারয়ী সংজ্ঞা।

দ্বিতীয় বিষয় : শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী কাজ বাতিল হওয়া।

তৃতীয় বিষয় : লক্ষ্যসমূহের সাথে মুজতাহিদের পরিচয় থাকা জরুরি হওয়ার প্রমাণ।

প্রথম বিষয় : লক্ষ্যের আভিধানিক ও শারয়ী সংজ্ঞা

এখানে শরিয়াহ প্রণেতার আইনগত উদ্দেশ্যসমূহের বিবরণ এবং আইনানুগ ইচ্ছার বিবৃতিসহ লক্ষের আভিধানিক সংজ্ঞা বিবৃত হয়েছে।

লক্ষ্য

আভিধানিক অর্থ : লক্ষ্যকে আরবিতে বলা হয় হাদাফ। আর হাদাফ হচ্ছে প্রত্যেক সুউচ্চ ভিত্তিভূমি বা বালিয়াড়ির শীর্ষদেশ অথবা পর্বতের চূড়া। মূল হাদাফ শব্দটির বহুবচন আহ্‌দাফ যেমন গারায শব্দের বহুবচন আগ্‌রায[১৮৭]।

শরিয়াহর লক্ষ্য বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে, এমন সব উদ্দেশ্য যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য আহকাম প্রবর্তন করা হয়েছে। শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণ সাধন, মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে এগুলো বার বার ফিরে আসে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে এ কল্যাণ অর্জনে সে সফল হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না[১৮৮]।

উদ্দেশ্যগুলো প্রয়োজন পূর্ণকারী অথবা সৌন্দর্য বর্ধনকারীও হতে পারে। তবে আলেমগণ উদ্দেশ্যসমূহকে পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে : দ্বীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ রক্ষা করা। কেউ কেউ মান-সম্মানের হেফাজত করাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে প্রাণ ও বংশরক্ষা মূলত মান-সম্মান ও মর্যাদা রক্ষারই নামান্তর। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। উপরিউক্ত পাঁচটি জিনিসের একটিও যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে জীবন প্রণালী ব্যাহত হতে বাধ্য।

---

[১৮৭] আল কামূসুল মুহীত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০৬ এবং আল মিসবাহুল মুনীর, পৃষ্ঠা ৯৮৩।

[১৮৮] আল গাজ্জালী, শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৩, ডক্টর হাম্‌দ উবাইদ আল-কাবিসী-এর তথ্যানুসন্ধান। আল মওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩, নিবরাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৮। মাকাসিদুস শারিয়াহ আশ শাইখ মুহাম্মদ আনিস উবাদাহ, পৃষ্ঠা ৯।

www.pathagar.com

সম্পদ হারা হলে মানুষ বাঁচে না। বংশহারা হলে সে কিছু দিনের জন্য পৃথিবীতে টিকে থাকলেও পরবর্তী প্রজন্মের বিলুপ্তির সাথে সাথে তারও বিলুপ্তি ঘটে অথবা বংশ পরিচয়হীন হয়ে মানুষের ভীড়ে মিশে যায়। এভাবে প্রত্যেক বস্তুই নিজেকে মর্যাদাশালী করে। আর বুদ্ধি ত্রুটিপূর্ণ হলে সমস্ত পৃথিবীটাই বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। আসলে পৃথিবীটা একটা বোধজ্ঞানহীন পশু, কোনো চিন্তাশীল মানুষ নয়। বুদ্ধির আলোকে পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়। জীবন সত্তায় যদি দেখা দেয় ত্রুটি-বিচ্যুতি, তাহলে জীবনপ্রবাহ হবে বিফল এবং তা আর অব্যাহত থাকবে না। আর দ্বীন ও জীবনবিধান যদি অপসৃত হয় তাহলে অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাকে গ্রাস করবেই। ফলে মানুষ দুর্বিসহ জীবন-যাপন করবে[১৮৯]।

এ কারণে আলেম ও বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত পাঁচটি জিনিসের হেফাজত করা ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা এসব প্রয়োজনীয় জিনিসের হিফাজত ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আহকাম প্রবর্তন করেছেন। দ্বিতীয়ত : এগুলো এমনভাবে রক্ষা করতে হবে যাতে; একবার অস্তিত্ব লাভ করার পর আবার যেন বিলুপ্ত না হয়ে যায়। এসব জিনিসের সংরক্ষণ ওয়াজিব হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এ কথা দিবালোকের মতো পরিস্কার যে, আপন প্রাণ, বুদ্ধি ও ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা শরিয়াহর উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। তাই হত্যা প্রতিরোধের জন্য কিসাস ওয়াজিব করা হয়েছে। মদ হারাম করা হয়েছে, কারণ মদপান করে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফিত্না ও বিপর্যয় রোধের জন্য ব্যভিচার হারাম ও অন্যের অধিকার হরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনিভাবে চুরি ও ডাকাতির শাস্তি হিসেবে জেল ও জরিমানা ওয়াজিব করা হয়েছে[১৯০]।

আলেমগণ এ বিষয়গুলোকে পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় নামে অভিহিত করে এগুলোকে শরিয়াহর মূলনীতিতে পরিণত করেছেন। এর সাধারণ লক্ষ্য হলো এগুলোর সংরক্ষণ করা। যেমন ইমাম শাতবী রহ. বলেছেন : শরিয়াহর যে সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ বিষয়গুলোর হেফাজত করতে হবে তা হচ্ছে পাঁচটি : দ্বীন, প্রাণসত্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদ-সম্পত্তি[১৯১]।

মক্কায় শরিয়াহ্ বিধান অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সীমাবদ্ধভাবে এসব প্রয়োজনীয় জিনিসের সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। কুরআন ও হাদিস যে মূল জিনিসের দিকে

---

[১৮৯] মুহাম্মদ মুস্তফা শিবলী, তা'লীকুল আহকাম, পৃষ্ঠা ২৮২-২৮৩।

[১৯০] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৩, আল-মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮।

[১৯১] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯।

www.pathagar.com

আহ্বান করে সেটি হচ্ছে দ্বীন জীবনবিধান। মক্কায় এ দ্বীন সম্পর্কেই প্রথম হুকুম নাযিল হয়। তবে প্রাণসত্তার সংরক্ষণের কথা কুরআনে এভাবে উল্লেখ হয়েছে :

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

> যে প্রাণ হত্যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না[১৯২]।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

> যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল[১৯৩]?

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

> যা তোমাদের জন্য হারাম তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তবে তোমরা নিরূপায় হলে তা স্বতন্ত্র[১৯৪]।

এ ধরনের আরো বিভিন্ন আয়াত এ প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এগুলো মাক্কী আয়াত। এগুলো প্রাণ হত্যা হারাম ও পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আর একান্ত প্রয়োজনের সময় ছাড়া মানুষ হারামকে প্রাধান্য দিতে পারে না।

আর বুদ্ধি সম্পর্কে বলতে গেলে এক কথায় বলা যায় যে, তাকে যে হরণ করে সে হচ্ছে মদ। মদ যদিও মদিনায় হারাম ঘোষিত হয় কিন্তু সীমাবদ্ধ নিষিদ্ধকরণের কাজ শুরু হয় মক্কায়। কেননা বুদ্ধির সংরক্ষণ মানেই হচ্ছে প্রকারান্তরে নিজের প্রাণসত্তার সংরক্ষণ। যেমন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বললে চোখ, কান, নাক এবং তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া সবই বুঝায়। কাজেই বুদ্ধি শরিয়াহ সম্মতভাবে প্রথমে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় মক্কায় সংরক্ষিত হয়, যদিও তা মুহূর্তকালের জন্য রহিত হয়।

বংশধারা সংরক্ষণ প্রসঙ্গে কুরআনের মাক্কী আয়াতে ব্যভিচার হারাম হওয়া এবং স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের কাছে লজ্জা স্থানের হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। জুলুম

---

[১৯২] সুরা আল ইসরা, ৩৩ আয়াত।

[১৯৩] সুরা আততাকভীর, ৮ - ৯ আয়াত।

[১৯৪] সুরা আল আনআম, ১১৯ আয়াত।

www.pathagar.com

করা, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, অপব্যয় করা, মাত্রাতিরিক্ত খরচ করা, মাপে ও ওজনে কম দেয়া, জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা এবং এ জাতীয় বিভিন্ন কাজকে হারাম ঘোষণা করে ধন-সম্পদ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য মান-ইজ্জতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলো কাউকে কষ্ট না দেয়ার আওতাভূক্ত। উল্লেখ্য, উপরিউক্ত জিনিসগুলোর অস্তিত্ব থাকলেই তার হেফাজত করার প্রশ্ন ওঠে, অন্যথায় নয়। একথা শেষ চারটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে দ্বীন হলো অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং শারিরীক সহায়তায় একে বাস্তবায়িত করার নাম।

অন্তরে বিশ্বাসের অর্থ হলো : আল্লাহ, রসুল ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। মাদানী যুগে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিষয়ের প্রতি ইমান আনাও এর অন্তর্ভুক্ত। তবে ইমানের মূল বিষয় অবতীর্ণ হয় মক্কায়। আর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে ইমানের তাগিদ পূর্ণ করাও এর একটি পর্যায়। এরপর বাড়তি বিষয়গুলো এর সম্পূরক। অর্থাৎ, ইসলামের কার্যকর আরকান হচ্ছে চারটি[১৯৫]।

এ প্রেক্ষিতে মাক্কী যুগে দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে হয় : সালাত ও যাকাত। বস্তুত এভাবে আনুগত্যের অর্থ বুঝা যায়। রোযা ও হজ্জের কথা সম্পূরক হিসেবে মাদানী যুগে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য হজ্জ আদি পিতা ইব্রাহীমের আ. সূত্রে প্রথম পাওয়া আরবদের একটি পুরানো রেওয়াজ ছিল। ইসলামের আগমনে তার মধ্যকার বিপর্যস্ত বিষয়গুলো সংশোধিত হয় এবং সত্য ও সনাতনের দিকে সেগুলোকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এমনিভাবে রোযাও জাহেলী যুগে আশুরার দিনে রাখা হতো। নবি সা. মদিনায় আসার পর নিজে এ রোযা রেখেছেন এবং রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে রমযানের রোযা আসার নির্দেশ আসায় তা রহিত হয়ে যায়[১৯৬]।

এ থেকে আমরা জানতে পারলাম, শরিয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মানুষের কল্যাণ সাধন করা, যেমন মানুষের দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার খলীফা হওয়া এবং সম্মানিত ও নন্দিত বান্দারূপে আল্লাহ তায়ালার কাছে স্বীকৃত হওয়া। এমনিভাবে যে মহাসংকটকালে প্রশান্ত আত্মা ছাড়া ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না সেদিন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং দুনিয়া আবাদ করার জন্য মানুষকে খলীফা করে পাঠিয়েছেন। যে আল্লাহ তায়ালার হিদায়াত অনুসরণ করবে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলবে তার

---

[১৯৫] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯।

[১৯৬] প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০।

www.pathagar.com

দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নিসন্দেহে প্রত্যেকটি শরিয়াহ মানুষের জন্যই প্রবর্তিত। শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরিয়াহর বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে তার লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। অন্যথায়, বিধান প্রবর্তন অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর বুদ্ধিমানদের অর্থহীন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াটা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তির স্রষ্টার ব্যাপারে এ ধরনের কথা কল্পনা করাই অসম্ভব। সর্বশেষ শরিয়াহ ও সুদৃঢ় দুর্গরূপে গণ্য ইসলামি শরিয়াহ কি তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম? নিম্নোক্ত আলোচনায় আমরা এর জবাব দেবার চেষ্টা করেছি :

শরিয়াহ প্রণেতার আইনগত উদ্দেশ্যাবলী

সাধারণত আমরা জানি ইসলামি শরিয়াহ সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ শরিয়াহ। কাজেই এর উদ্দেশ্যসমূহ লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছতে সক্ষম হবে, এতে সন্দেহ নেই।

তাই আমরা বলবো : উদ্দেশ্যসমূহ দু'ধরনের। এক ধরনের উদ্দেশ্য স্রষ্টার সৃষ্টিগত এবং অন্যগুলো আইনগত।

সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যাবলী

সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যসমূহ সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ কথার প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য সৃষ্টি করিনি[১৯৭]।

আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সমস্ত রিসালাতের সাধারণ উদ্দেশ্য এটিই। এ সম্পর্কে কুরআনে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

> আমি প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি, (যারা বলতো) আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো এবং আল্লাদ্রোহী শক্তিকে বর্জন করো[১৯৮]।

---

[১৯৭] সুরা আয যারিয়াত, ৫৬ আয়াত।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

> আমি তোমার আগে এমন কোনো রসুল পাঠাইনি তার প্রতি এই ওহি ছাড়া যে, আমি ছাড়া আর অন্য কোনো ইলাহ নেই, কাজেই আমারই ইবাদত করো[১৯৯]।

তিনি আরো বলেছেন :

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

> তোমার আগে আমি যেসব রসুল পাঠিয়েছিলাম তাদের তুমি জিজ্ঞেস করো, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া কোনো দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদত করা যায়[২০০]?

এসব আয়াত এবং এগুলোর সমার্থবোধক অন্যান্য আয়াত এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদত করতে গেলে মাবুদের পরিচয় লাভ করতে হয়। কাজেই প্রথমেই আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয় লাভ করতে হবে। এটি প্রথম ওয়াজিব। এ দ্বারা যে প্রশংসনীয় লক্ষ্য অর্জিত হয় তা হলো মানবতার পূর্ণতা এবং মানব গোষ্ঠীর কল্যাণ ও মুক্তি। এটাই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য। আর এ তাৎপর্যসহ আল্লাহ্ তায়ালা রসুলগণকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। এছাড়া আত্মসংশোধন ও পরিশুদ্ধি হয় না[২০১]।

যখন সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে হয় সৃষ্টজীব তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না তখন উদ্দেশ্যের ফলাফল উদ্দেশ্য পোষণকারীর দিকে আসতে বাধ্য নয়। এ কারণে আমরা যখন বলি : শরিয়াহ্ প্রণেতা (আল্লাহ্ তায়ালা) ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তখন আমাদের একথা মনে করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয় লাভ করা এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করার ফলাফল সে

---

[১৯৮] সুরা আল নাহল, ৩৬ আয়াত।

[১৯৯] সুরা আল আম্বিয়া, ২৫ আয়াত।

[২০০] সুরা আয যুখরুফ, ৪৫ আয়াত।

[২০১] ইবনুল কাইয়েম, মিফ্তাহু দারুস সা'আদাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৯, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২০।

www.pathagar.com

মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ তায়ালার দিকেই ফিরে যাবে। বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় কর্মসম্পাদনের ফলাফল যিনি কর্ম সম্পাদন করেছেন তার দিকে ফিরে যাবে। এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব জাহানে কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হলো :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

> হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ[২০২]।

এ ধরনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। আর যদি এ ধরনের উদ্দেশ্য আসল হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তাহলে এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার চাইতে চুপ থাকাই ভালো।

আইনগত উদ্দেশ্যাবলী

দ্বিতীয় ধরনের উদ্দেশ্য হলো আইন প্রণেতার আইনগত লক্ষ্যসমূহ। অর্থাৎ এমন চূড়ান্ত লক্ষ্য যা মানুষকে আল্লাহ তায়ালা প্রণীত আহকামের তত্ত্ব ও রহস্যের সন্ধান দিতে সক্ষম। এ কারণে শরিয়াহ সাধারণ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পরিপূরক হয়। আর সে উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধন করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং মানবতার কল্যাণ ও পূর্ণতার সাথে দুনিয়াকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা যাতে দুনিয়া যথার্থই আখেরাতের শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়।

এ কারণেই ইসলামের রিসালাত ছিল হিদায়াত, রহমত, ইনসাফ ও অনুগ্রহ এবং চিরকাল তার এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কঠিন ও জটিলতার স্থলে সহজতা ও সরলতা প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ্য। এভাবে সাধারণ লক্ষ্যে পৌছাবার উদ্দেশ্যেই শুরু থেকে শরিয়াহী বিধানের প্রবর্তন হয়। যেমন সংকীর্ণতা দূর করা, ক্ষতি ও অনিষ্টতা পরিহার করা, ইনসাফ ও পরামর্শনীতি গ্রহণ করা, আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, অধিকার প্রদান করা, আমানত যথাযথরূপে আদায় করা, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সত্য ও বিশ্বস্ততার পথ অবলম্বন করা এবং এ ধরনের অন্যান্য মৌলিক বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আসমানী শরিয়াহসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে।

---

[২০২] সুরা ফাতির- ১৫ আয়াত।

www.pathagar.com

মানবজাতির একাধারে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই শর্য়ী বিধান প্রবর্তিত হয়েছে[২০৩]। শায়খ ইবনে আশূর রহ.[২০৪] বর্ণনা করেছেন : বর্তমান-এর অর্থ হলো আখেরাতে নয় বরং এ দুনিয়ায় কাজের পরিণতি প্রত্যক্ষ করা। এ কথার প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন : শরিয়াহ মানুষকে পরিণতি দেখার জন্য উৎসাহিত করেনি। মানুষ সত্তরই তা প্রত্যক্ষ করবে আখেরাতে। তবে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের আখেরাতের জীবনকে তার দুনিয়ার অবস্থার প্রেক্ষিতে তৈরি করে রেখেছেন। তাঁর ভাষায় : ভবিষ্যৎ বা আজল এর ব্যাখ্যা হলো, শরিয়াহসম্মত কষ্টসমূহ কখনো শুরু হয় দায়িত্বপ্রাপ্তদেরকে কষ্ট ও ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং কল্যাণ রহিত করার মধ্য দিয়ে। যেমন মদ্যপান ও এর কেনাবেচা হারাম হওয়া। কিন্তু একজন সচেতন ব্যক্তি যখন এসব শরিয়াহ বিধান সম্পর্কে চিন্তা করে তখন তার কাছে পরিণামে এর কল্যাণকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে আজল বা ভবিষ্যতের এ ধরনের ব্যাখ্যা করলে তা থেকে কি আখেরাত না হওয়া বুঝায়?

আসলে শরিয়াহর উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন করা। কাজেই আজল-এর অর্থ আখেরাত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

কারণ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণ সাধন করা। আর কল্যাণ হচ্ছে সৎকাজের পরিণাম। সৎ কাজের পরিণাম ফল কখনো দুনিয়াতে পাওয়া যায়। আবার এর প্রতিফল আখেরাতেও পাওয়া যায়। কাজেই একথা বলার সুযোগ নেই যে, শরিয়াহ মানুষের জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। মানুষ আখেরাতে এগুলোর পরিণাম সত্তরই দেখতে পাবে। কাজেই শরিয়াহ বিধানের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করা।

তাই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হবে দুনিয়াতেই। প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের পরিণাম ফল জাগতিক জীবনে লাভ করা জরুরি নয়। এ ব্যাপারে কুরআন-এর ঘোষণা হলো :

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً

[২০৩] আল উস্তাদ শায়খ মুহাম্মদ আনিস উবাদাহ, মাকাসিদুস শরিয়াহ, পৃষ্ঠা ৮-৯ ।

[২০৪] মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশূর। জামে আয্‌যাইতুনার শাইখ। তিউনিসের সমকালীন আলেমগণের অনেকেই ছিলেন তাঁর ছাত্র। তিনি মাকাসিদুশ শারীআতিল ইসলামিয়া নামে কিতাব লেখেন এবং তা তিউনিসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক, সূক আত্তারীনের মাকতাবাতুল ইসতিকামাহ।

www.pathagar.com

কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্ত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ থেকে দূরীকৃত অবস্থায়[২০৫]।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً

যারা মুমিন হয়ে আখেরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালায় তাদেরই প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে[২০৬]।

এসব আয়াত একথা প্রকাশ করে যে, আখেরাতের চেষ্টা সাধনা শরিয়াহ বিধানের দাবী অনুযায়ী দুনিয়াতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এজন্য প্রচেষ্টাকারীকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার দানের যোগ্য হতে হবে। আল্লামা শাতবী রহ. বলেন : শরিয়াহ বিধানের কল্যাণসমূহ বিধান পালনকারীর জীবনে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বার বার আসে একথা ঠিক।[২০৭] এ পরিপ্রেক্ষিতে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যসমূহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্যাণসমূহের দায়িত্ব বহন করে থাকে। আর এটা শরিয়াহ প্রণেতার কল্যাণসমূহের সুস্পষ্টতা ছাড়া প্রাথমিক সিদ্ধান্তের তদারকী করতে নিষেধ করে না।

শরিয়াহর উদ্দেশ্যাবলী প্রমাণিত হওয়ার দলিল

বিভিন্ন দলিলের সাহায্যে শরিয়াহর উদ্দেশ্য আছে একথা প্রমাণ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। যেমন নবিদের প্রেরণ করা, কুরআন-হাদিসভিত্তিক আহকামের উৎসসমূহ পাঠ করা এবং ইজমার সাহায্যে গৃহীত শরয়ী আলেমগণের সার্বিক নিয়মাবলি। কেননা শাখা-প্রশাখা ও খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ এসব নিয়ম-কানুনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে যায়।

নবিদের প্রেরণ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত আছে। এসব আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নবি রসুল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, বান্দার প্রতি করুণা করা এবং সত্য ও ন্যায়ের দিক নির্দেশনা দেয়া। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

---

[২০৫] সুরা আল ইসরা, ১৮ আয়াত।

[২০৬] সুরা আল ইসরা, ১৯ আয়াত।

[২০৭] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৩ সাবীহতে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

তোমাকে কেবল সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি[২০৮]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার প্রতিকার এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত[২০৯]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন :

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রসুল প্রেরণ করেছি, যাতে রসুল আসার পর আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে[২১০]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন :

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

এ কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত[২১১]।

উপরোক্ত আয়াতগুলো সুস্পষ্টভথাবে একথা প্রমাণ করে যে, নবি রসুলগণের প্রেরণ বান্দার ওপর আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হওয়ারই নামান্তর। যে এ রহমত গ্রহণ করবে এবং নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সৌভাগ্যশালী হবে। আর যে এ রহমত প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করবে সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ক্ষতি হবে অপূরণীয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

---

[২০৮] সুরা আল আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত।

[২০৯] সুরা ইউনুস- ৫৭ আয়াত।

[২১০] সুরা আন নিসা, ১৬৫ আয়াত।

[২১১] সুরা আল জাসিয়া ২০ আয়াত।

www.pathagar.com

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করো না, যারা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে[২১২]?

তিনি আরো বলেছেন :

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى- وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

যে আমার সৎপথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। আর যে আমার স্মরণে বিমুখ হবে তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উঠাবো অন্ধ অবস্থায়[২১৩]।

আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, রসুল সা.-এর অনুসরণের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে এবং তাঁদের বিরোধিতা করা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য অকল্যাণকর ও দুর্ভাগ্যজনক। কাজেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিলোক ও নির্দেশাবলীর মধ্যে যে উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করেছেন সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর পক্ষ থেকে রসুল প্রেরণ করে থাকেন। এ থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, বিধান প্রেরণের পেছনে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য রয়েছে।

আহকামের উৎস অনুসন্ধান

কুরআন ও হাদিসে যে সমস্ত আহকাম তথা বিধান দেয়া হয়েছে যখন আমরা সেগুলোর উৎসসমূহ পাঠে ব্রতী হই, আমরা দেখতে পাই সেগুলো সবই শরিয়াহ আহকামের মধ্যে লুকানো শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রথমত : কুরআনভিত্তিক

১. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

[২১২] সুরা ইবরাহীম, ২৮ আয়াত।

[২১৩] সুরা তা-হা, ১২৩-১২৪ আয়াত।

www.pathagar.com

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো[২১৪]।

দু'টি বস্তু বা দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের তাৎপর্য হচ্ছে : তাদের উভয়ের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যেক বিষয়ে দুই প্রান্তিকতায় আক্রান্ত না হয়ে ভারসাম্য ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের প্রবণতা সৃষ্টি করা। কাজেই মানবজাতির মধ্যে এ ধরনের ইনসাফ ও আদল প্রতিষ্ঠা করাই আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য। আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে এ অর্থই প্রতীয়মান হয় যে, আদল ও ইনসাফের বিপরীতে পাপ, নির্লজ্জতা ও জুলুম এ তিনটি অসৎ প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকার দায়িত্ব মানুষের ওপর বর্তেছে। এ তিনটি ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি মানব গোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে জটিলতা সৃষ্টি করে।

এ আয়াতটি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: কুরআনে কল্যাণ ও অকল্যাণ বিষয়ক এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। সমগ্র কুরআনে এ সম্পর্কিত এ আয়াতটি ছাড়া অন্য কোনো আয়াত না থাকলেও শুধুমাত্র এ আয়াতটিই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ও পথ নির্দেশের জন্য যথেষ্ট হতো। এর সমার্থবোধক অন্য একটি আয়াত হলো :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারদের ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে[২১৫]।

২. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

---

[২১৪] সুরা আল নাহল, ৯০ আয়াত।

[২১৫] সুরা আন-নিসা, ৫৩ আয়াত।

www.pathagar.com

হে মুমিনগণ! রসুল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ তায়ালা ও রসুল সা.-এর আহ্বানে সাড়া দাও[২১৬]।

রসুল যে জিনিসের দিকে মানুষকে ডাকেন সেটাকে আল্লাহ তায়ালা হায়াত তথা জীবনের জন্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে হায়াত-এর অর্থ হলো ইহকাল ও পরকারের সঠিক জীবন। কারণ কাঙ্খিত কল্যাণ ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের অংশে অস্তিত্বশীল হওয়া ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষের চিরন্তন কল্যাণকে ইসলামি দাওয়াতের অনুসরণ এবং ইসলামি হিদায়াত আঁকড়ে ধরার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ তাৎপর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপকারী পরবর্তী আয়াত হচ্ছে :

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

মুমিন অবস্থায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো[২১৭]।

৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ- وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ

মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, পার্থিব জীবনে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর বিরোধী। যখন সে কতৃত্ব লাভ করে,

---

[২১৬] সুরা আল আনফাল, ২৪ আয়াত।

[২১৭] সুরা আল নাহল, ৯৭ আয়াত।

www.pathagar.com

> পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা অশান্তি পছন্দ করেন না[২১৮]।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা জাতিদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ তারা ইসলামের হিদায়াত ও শিক্ষা আঁকড়ে ধরার আহ্বানকে মিথ্যা মনে করতো। তারা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও বংশ ধ্বংস করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। এ ধরনের তৎপরতা আইনদাতার সৃষ্টিগত ও নির্দেশগত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কারণ যে জিনিসের ওপর মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল সেই বংশ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত থাকা চরম অর্থহীন কাজ। তাছাড়া আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামি শিক্ষার জন্য শিক্ষা জগতে পরিভ্রমণকে সত্য ও মিথ্যার মাপকাঠিতে পরিণত করেছেন। কারণ শরিয়াহ্ আহকামের বাস্তবায়ন এবং মানব জীবন ও তার কল্যাণ সাধন যে জিনিসের ওপর নির্ভরশীল তা সংরক্ষণ করতে পারে এই শিক্ষা সফর।

৪. এখানে আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলোতে আহকাম প্রবর্তনের কারণ আংশিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব আহকামের মাধ্যমে আইন দাতার উদ্দেশ্যের দিকেও এসব আয়াত আমাদের আহ্বান জানায়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

> আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশ- কর তা চান না[২১৯]।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

> আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান[২২০]।

তিনি আরো বলেন :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ

---

[২১৮] সুরা আল বাকারাহ, ২০৪-২০৫ আয়াত।

[২১৯] সুরা আল বাকারাহ, ১৮৫ আয়াত।

[২২০] সুরা আল মায়েদাহ, ৬ আয়াত।

www.pathagar.com

হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই জীবন রয়েছে[২২১]।

মদ সম্পর্কে তিনি বলেন :

فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

মদ ও জুয়ার মধ্যে রয়েছে বিরাট ক্ষতি এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে। তবে তাদের ক্ষতি তাদের উপকারের চাইতে অনেক বেশি[২২২]।

এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহ তায়ালার স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না[২২৩]?

এসব আয়াত শরিয়াহ আহকামের সাহায্যে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে। সে উদ্দেশ্য হলো : মানুষ থেকে সংকীর্ণতা, কঠোরতা, কষ্ট, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ দূর করা। আল্লাহর স্মরণ ও সালাতের প্রতিবন্ধকতা থেকে তাকে মুক্ত করা। মানুষের প্রাণকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। এগুলো সবই আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য। এসব আয়াত একথাও প্রমাণ করে যে, আইন প্রণয়নের মধ্যে অবশ্যই আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

দ্বিতীয়ত : সুন্নাত বা হাদিস

রসুল সা.-এর বাণী :

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ
الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ.

---

[২২১] সুরা আল বাকারাহ, ১৭৯ আয়াত।

[২২২] সুরা আল বাকারাহ, ২১৯ আয়াত।

[২২৩] সুরা আল মায়েদাহ, ৯১ আয়াত।

www.pathagar.com

> ইমানের সত্তরের বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ না থাকার সাক্ষ্য দেয়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে, কষ্টকর জিনিস রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া[২২৪]।

আল্লাহর রসুল সা. দ্বীনের তাৎপর্য দুটি জিনিসের মধ্যে একত্র করেছেন। প্রথম দিকটি হচ্ছে, তওহীদ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই ইমানের সূচনা বিন্দু। আর এর শেষ সীমানা নির্ধারিত হয়েছে দ্বিতীয় দিক দিয়ে। সেই দিকটি হচ্ছে সাধারণ উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট সৃষ্টিকুলের সেবার প্রকৃষ্ট নমুনা। যেমন পথচারীদের চলাচলের সুবিধার জন্য পথকে কষ্টদায়ক জিনিস থেকে মুক্ত রাখা। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আইন প্রণেতার ছোট হোক বা বড় উদ্দেশ্যাবলী কারণসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

সমার্থবোধক অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসে তিনি বলেন :

> كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

> মানুষের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের অস্থি তার জন্য 'সাদকাহ' স্বরূপ। নিত্যদিনের সূর্যোদয়ে দুই জিনিসের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সাদকাহ্। কোনো ব্যক্তিকে তার বাহনে মালপত্র উঠানো-নামানোর ব্যাপারে সহায়তা দান করা সাদকাহ। ভালো কথা বলাও সাদকাহ। সালাতের উদ্দেশ্যে পথচলা প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকাহ্। পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সাদকাহ[২২৫]।

নবি সা.-এর বাণী :

> الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.

---

[২২৪] সুনান আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

[২২৫] বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এখানে শব্দগুলো উদ্ধৃত হয়েছে মুসলিম থেকে।

www.pathagar.com

সৃষ্টিজগত আল্লাহ্ তায়ালার পরিবার। যারা এই পরিবারের বেশি উপকার করবে তারা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে বেশি প্রিয়[২২৬]।

নবি সা. আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভ করার এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য তাঁর বান্দাদের উপকার ও সেবা করাকে অগ্রাধিকার দান করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্য ও বান্দাদের কল্যাণ পরিপূর্ণ করার মানসে এ ধরনের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন ও জীবিকার কল্যাণ সাধন করার প্রেক্ষিতে ফযীলত ও মর্যাদা নিরূপিত হয়ে থাকে এবং মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির আলামতসমূহ পরিত্যাগ না করার প্রেক্ষিতে অসম্মান ও অবমাননা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোনো মুসলমান একথা বলতে পারে না যে, মর্যাদা ও অইমান এমন দুটি জিনিস যা কেবলমাত্র কাজটি করলেই তার উপযোগী হয়ে যায়; কাজের পরিণাম ও পরিণতির দিকে লক্ষ্য করার দরকার নেই।

৩. নবি সা. বলেছেন :

لاضرر ولا ضرار.

(ইসলামে) কষ্ট দেয়া ও কষ্ট পাওয়ার নীতি স্বীকৃত নয়[২২৭]।

কষ্ট দেয়ার অর্থ হলো, নিজে কিংবা অপরের মাধ্যমে মানুষকে কষ্টকর বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছা করা। কষ্ট পাওয়ার অর্থ হলো, দুর্জনের মধ্যে কষ্টকর বস্তু ছড়িয়ে দেয়ার পারস্পরিক প্রচেষ্টা। হাদিসটি একটি সর্বজনীন নীতি। আল্লাহর রসুল মুসলমানদের সামনে কষ্ট ও বিপর্যয়ের সমস্ত অর্গল বন্ধ করে দেন বাণীর মাধ্যমে। ফলে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত কল্যাণ ইসলামি শরিয়াহর অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত : ইজ্‌মা তথা সর্বসম্মতিক্রমে শরিয়াহ্ রীতিনীতির দলিল গ্রহণ করা

প্রথম নিয়ম : শরিয়াহ্প্রণেতার নিষিদ্ধ পাপকাজগুলোকে সগীরা ও কবীরা নামে ভাগ করা এবং এ বিভক্তি অনুসারে পাপের তারতম্য নির্ণয় করা : আর এর মাধ্যমে আইন প্রণেতার সর্বাধিক আনুগত্য করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা। যেমন সীমানার শেষ প্রান্তে পৌছার ইচ্ছা করা। আসলে সবচেয়ে বড় পাপ দমন করতে চাওয়া সবচেয়ে

---

২২৬ তাবারানী মু'জামে এবং আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন।

২২৭ ইবনে মাজা, দার কুত্‌নী এবং অন্যান্য গ্রন্থ। ইবনে আছীর, আল নেহায়াতু ফী গারীবিল হাদিস, আদ্ দারার ওয়াদ দিরার অর্থ দেখুন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮১।

www.pathagar.com

ছোট পাপ দমন করারই নামান্তর। কাজেই চাওয়া পাওয়ার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কল্যাণকর বস্তু চাওয়া এবং অনিষ্টকর বস্তু রহিত করার মাধ্যমেই কাঙ্খিত বস্তুগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। এ জন্য পূর্ণ এবং অধিক পূর্ণ হিসেবে বিভক্ত হওয়ার ফলে ভালো কাজও উত্তম ও সর্বোত্তম দু'ভাগে বিভক্ত। অনুরূপভাবে পাপ কাজও ক্ষতিকর এবং অধিক ক্ষতিকর হওয়ার ফলে সগীরা ও কবীরা রূপে বিভক্ত[২২৮]।

দৃঢ় ইচ্ছা স্বভাবতই বিভক্ত নয়, যদিও একথা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং সহী হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, গুনাহ্ বা পাপকাজ পাপকারীর ওপর অনিষ্টকর প্রভাবের তারতম্য অনুযায়ী নির্ণীত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নবি সা. কর্তৃক চিহ্নিত সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিসের কথা বলা যায়। তিনি বলেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে দূরে থাকো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসুল! সেগুলো কী? তিনি বললেন : আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ্ তায়ালা হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ আত্মসাত করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা[২২৯]।

এগুলো ছাড়া অন্যান্য পাপগুলোকে কুরআন সাইয়্যেয়াত তথা ছোট গুনাহ্ এবং লামাম তথা সামান্য অপরাধ নাম দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে :

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً

তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে দাখিল করবো[২৩০]।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে ছোটখাট অপরাধ করলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম[২৩১]।

---

[২২৮] ইবনে আবদুস সালাম, কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২-২৩।

[২২৯] বুখারি আবু হুরাইরা রা. থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

[২৩০] সুরা আন-নিসা, ৩১ আয়াত।

www.pathagar.com

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, পাপ ও অপরাধজনিত কাজের প্রভাবের ফলেই পাপ ও অপরাধের তারতম্য হয়ে থাকে। মানুষকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে আকর্ষণ করার হার ও মান অনুযায়ী অপরাধের ধরন চিহ্নিত হবে। অন্যদিকে সৎ ও নেক কাজের পরিণতির ভিত্তিতেই সে কাজের মান ও স্তর নির্ণিত হবে। যে কাজের পরিণতি জনকল্যাণমুখী তার গুণগত মানের তারতম্য অবশ্যই থাকবে।

এরই ভিত্তিতে আলেমগণ দলিল দ্বারা প্রমাণিত সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজের উপর অনুরূপ এমন কতিপয় অপরাধ কিয়াস করেছেন যেগুলো সগীরা হওয়া সত্ত্বেও প্রমাণিত কবীরা গুনাহের নিকটবর্তী করে দেয়। যেমন : ইয্য ইবনে আবদুস সালাম তাঁর কাওয়ায়েদুল আহকাম গ্রন্থে বলেছেন : কবীরা ও সগীরার পার্থক্য জানতে হলে প্রমাণভিত্তিক কবীরা গুনাহের ক্ষতিকর বিষয়ের সামনে তার গুনাহের বিপর্যয়গুলো তুলে ধরতে হবে। যদি গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব কবীরা গুনাহের প্রভাবের চেয়ে কম হয় তাহলে তা হবে সগীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহের ন্যূনতম ক্ষতির সমান হলে কিংবা তার চেয়ে বেশি হলে তা কবীরা হিসেবে গণ্য হবে। তিনি আরো বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বা রসুলকে গালি দেয়া, রসুল সা.-এর অবমাননা করা কিংবা আল্লাহ তায়ালা ও রসুল সা.-এর মধ্যে কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, কাবাঘরকে দুর্গন্ধময় করা অথবা আবর্জনার স্তূপে কুরআন নিক্ষেপ করা ইত্যাকার কাজগুলো সবচেয়ে বড় গুনাহ। অথচ শরিয়াহ প্রণেতা সুস্পষ্টভাবে এগুলোর কবীরা গুনাহ হওয়ার কথা বলেননি। এমনিভাবে কোনো সতী-সাধ্বী মহিলাকে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আটকে রাখা কিংবা হত্যার উদ্দেশ্যে কোনো মুসলমানকে আটক করার ক্ষতিকর পরিণতি এতিমের সম্পদ আত্মসাত করার চেয়েও ভয়াবহ, যদিও এতিমের সম্পদ আত্মসাত করা কবীরা গুনাহ। অনুরূপভাবে কাফেররা যদি মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে উৎখাত করে, তাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে গালিগালাজ করে, তাদের ধন-সম্পদ লুট করে, তাদের মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে এবং তাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করে, তাহলে তাদের এ ধরনের অপতৎপরতার ক্ষতিকর পরিণতি যুদ্ধের মাঠ থেকে বিনা কারণে পলায়ন করার চেয়েও বেশি ভয়ংকর, যদিও এ কাজ কবীরা গুনাহ[২৩২]।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পাপের স্তর ক্ষতিকর পরিণতির ভয়াবহতার সাথে সম্পৃক্ত, যদিও পাপ কাজটির কবীরা গুনাহ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। এ ধরনের

---

[২৩১] সুরা আন নজম, ৩২ আয়াত।

[২৩২] কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩।

www.pathagar.com

পাপ কাজকে কবীরা গুনাহের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাপ কাজের এ ধরনের বিভক্তিকরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য কল্যাণ ও অকল্যাণ ছোট বড়র তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই যখন কাজের কল্যাণ বৃহৎ হয় তখন তা অর্জন করার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং তা অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিরর্থক ঘোরাফেরা করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানব কল্যাণের হেফাজত এবং সংঘটিত বা আসন্ন বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য শরিয়াহর আগমন ঘটে। পাপ কাজের কবীরা ও সগীরা হিসেবে বিভক্ত হওয়া অধিকাংশ আলেমগণের মতে স্বীকৃত ও গৃহীত[২৩৩]।

দ্বিতীয় নিয়ম : জবরমূলক আহকাম রচনার ক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করা : কারণ এ কথা সর্বজন বিদিত যে, বুদ্ধি বিবেকের অধিকারী হওয়া এবং সাবালকত্ব লাভই মানুষকে দায়িত্বশীল করে। তবে যে কাজ করা উচিত নয় এমন কোনো কাজ যখন কোনো ব্যক্তি করে তখন তার পেছনে থাকে কোনো ব্যক্তির কল্যাণ, যা আহকাম তৈরি করার কারণে পরিণত হয়। তাই শরিয়াহ সিদ্ধ জবরের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার হকের যে মাসলিহাত বা কল্যাণগুলো অর্জিত হয়নি তার জন্য জবর প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যার ওপর জবর করা হচ্ছে তাকে পাপী ঠাওরাবার কোনো অবকাশ নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে ও ভুলক্রমে, জেনে ও না জেনে এবং পাগল ও শিশুদের ওপর জবর করা যায়। এ কারণে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, জেনে বুঝে বা ভুলক্রমে মানুষের সম্পদে হস্তক্ষেপ করা সমান কথা। কারণ উভয় ক্ষেত্রে সম্পদের সমান ক্ষতি হয় এবং এটিই তার জামানতের কারণ, যদিও গুনাহর কারণের মধ্যে পার্থক্যভেদ রয়েছে[২৩৪]।

এগুলো শরিয়াহর সাধারণ বিধান। এগুলো ছাড়া জাতীয় কল্যাণ পূর্ণ হয় না। যদি সংঘটিত অপরাধের জামানতের ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে একজন অন্যজনের সম্পদ-সম্পত্তি বিনষ্ট করতো, ভুল হওয়ার দাবী করতো এবং ইচ্ছা না থাকার বাহানা করতো। আর এটি হতো অপরাধ ও দণ্ডবিধির বরখেলাফ। কারণ এগুলোর

---

[২৩৩] তাফসীর ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০৬-২০৯।

[২৩৪] ই'লামুল মুওয়াককিরীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫, কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৮ ড. মুহাম্মদ সাঈদ রামাদান আলবুতী, যাওয়াবিতুল মাসলিহাত, পৃষ্ঠা ৮১।

www.pathagar.com

বিরোধিতা করা এবং বান্দার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার অনুকূল। এ কারণে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মধ্যে শরিয়াহ্ পার্থক্য করেছে[২৩৫]।

তবে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও অদায়িত্ব প্রাপ্তের মধ্যে শরিয়াহ্ বিধানের একত্রকরণ নীতি একটি বিতর্কিত ও ইজতিহাদী বিষয়। শরিয়াহ্ প্রণেতার পক্ষ থেকে উভয়কে সমান করার ও না করার কোনো দলিল নেই। যারা উভয়কে সমান মনে করেন তারা সম্পদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা সম্পদের উপস্থিতিকেই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ নির্ধারণ করেছেন। এ সম্পদের ওপর গরীবের অধিকার রয়েছে, তার মালিক শরিয়াহ্ নির্ধারিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হোক বা না হোক। যেমনিভাবে পশু-পাখি, দাসদাসী, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ব্যয় করার অধিকার স্বীকৃত ও অবধারিত, ঠিক তেমনি সম্পদশালীর সম্পদের মধ্যে গরীব-মিসকিনদের জন্য একটি অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে[২৩৬]।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, আল্লাহ তায়ালা এসব হুকুম ও অনুরূপ আহকাম কাঠামোগত সম্বোধনের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারণ করেছেন, দায়িত্বপ্রাপ্তির শর্তাবলি পূর্ণ হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। এর উদ্দেশ্য হলো, মানব কল্যাণসমূহের তদারকী করা। এ ধরনের বিধানের প্রচলন না থাকলে অনিচ্ছা ও ভুলের মধ্যে মানবাধিকার ও জনকল্যাণ বিনষ্ট হয়ে যেতো। কাজেই শরিয়াহ প্রণেতা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় এসব কল্যাণের হেফাজত এবং এগুলিকে লক্ষ্যবিন্দুতে পৌছিয়ে দিয়ে এসব আহকাম সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন।

তৃতীয় নিয়ম : ব্যবহারিক জীবনের সুস্থতা, গুণাবলি ও প্রভাবের শর্তাবলি মানব কল্যাণসমূহ সাধিত হওয়ার প্রক্রিয়া অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন ইজারাদারী, পশুপালন ও চাষাবাদের চুক্তি করলে মেয়াদ নির্দিষ্ট করতে হয় এবং বিবাহের ক্ষেত্রে তালাকের অবকাশ রাখতে হয়। কারণ এ ধরনের চুক্তির মাধ্যমে কল্যাণ লাভের উপায় হয়। মেয়াদ নির্দিষ্ট করা বিপরীত পক্ষে বৈবাহিক চুক্তির ক্ষেত্রে সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করা ক্ষতিকর। কারণ বৈবাহিক চুক্তির লক্ষ্য হলো বংশ সংরক্ষণ। অন্যদিকে অস্তিত্বহীন বস্তুর বেচা-কেনা ও ইজারা দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ এ ধরনের লেনদেনের মধ্যে প্রতারণা রয়েছে। এভাবে চুক্তিপত্রের বিভিন্নতার ফলে শর্তাবলিও

---

[২৩৫] ই'লামুল, মুওয়াককিরীন খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৫ এবং কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৮।

[২৩৬] ই'লামুল, মুওয়াককিরীন খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৫।

www.pathagar.com

বিভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেক চুক্তির উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট কল্যাণ সাধন করা। যেমন ইজারাদারী, ব্যবসায় ও বিবাহের মধ্যে বিশিষ্ট কল্যাণ রয়েছে[২৩৭]।

চতুর্থ নিয়ম : কল্যাণের সাথে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারে শরিয়াহর বিবেচনা; শরিয়াহ প্রচলিত প্রথার ব্যাপারে বিবেচনা করে থাকে এ শর্তে যে, এ প্রথা যেন তার জন্য বিপদজনক এবং মানুষের কল্যাণ বিনাশক না হয়। এ থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, আরবের জাহেলী যুগের প্রচলিত অবিনাশক প্রথাসমূহ বিজ্ঞ শরিয়াহ প্রণেতার নিকট স্বীকৃত ছিল। যেমন হত্যার বিনিময়ে রক্তপণ নেওয়া বা কসম খাওয়া, বিয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীর খোরপোশ বহন করার শর্ত, ঋণ ব্যবস্থা, কাবার গিলাফ লাগানো ইত্যাকার কাজগুলো জাহেলী যুগেও প্রশংসিত ছিল। এগুলো উত্তম প্রথা এবং উন্নত চরিত্রগুণের প্রতীকরূপে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ছিল[২৩৮]।

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

> উন্নত চারিত্রিক গুণাবলিকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি[২৩৯]।

নবি সা. তাঁর এ বাণীর মাধ্যমে উপরিউক্ত প্রথাগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যেসব প্রথা ও রসম-রেওয়াজ হিতকর ও জনকল্যাণকর সেগুলোর ব্যাপারে বিজ্ঞ শরিয়াহ প্রণেতার বিবৃতি অত্যন্ত সহজাত, সম্মানজনক ও বিজ্ঞতাপ্রসূত। এ কারণে শরিয়াহ আহকামের লক্ষ্যসমূহ মানুষকে এদিকে ধাবিত করে।

উপরিউক্ত দলিলগুলোর ভিত্তিতে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, শরিয়াহ প্রণেতার অবশ্যই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। তাঁর হুকুম পালনের মাধ্যমেই এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যায়। ফিক্‌হ শাস্ত্রের সমগ্র পরিসরে নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট, সাধারণ-অসাধারণ, খুটিনাটি-পূর্ণাঙ্গ বিষয়সমূহের মধ্যে যেসব দলিল রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে গবেষণা করে পূর্ববর্তী আলেমগণ এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, এগুলো সবই শরিয়াহ প্রণেতার লক্ষ্যসমূহ সংরক্ষণে সর্বদা নিয়োজিত।

---

[২৩৭] দাওয়াবিতুল মাসলিহাত, পৃষ্ঠা ৮১ এবং কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৩।

[২৩৮] দাওয়াবিতুল মাসলিহাত, পৃষ্ঠা ৮১ এবং কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৩।

[২৩৯] বুখারি।

www.pathagar.com

এজন্য ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেছেন : অকাট্য দলিলসহ জানা গেছে যে, প্রাণ, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করাই শরিয়াহর উদ্দেশ্য[২৪০]। ইয্ ইবনে আবদুস সালাম বলেছেন : জেনে রাখো, আল্লাহ্ তায়ালা এমন প্রত্যেক ব্যয় খাত বৈধ করেছেন যার সাহায্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদন করা এবং কল্যাণ পূর্ণ হওয়া সম্ভব। কাজেই যার সাহায্যে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কল্যাণ লাভ করা যায় তা সবই বৈধ। যদি কল্যাণ সমগ্র ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ হয় তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ কল্যাণ বিধিসম্মত। আর যদি কল্যাণ সর্বক্ষেত্রব্যাপী না হয়ে কতিপয় খাতে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট খাতেই তা বিধিসম্মত হবে, অন্য খাতগুলোতে নয়। তবে দুটি অধ্যায়ের কল্যাণের প্রেক্ষিতে এমন কতিপয় ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা যায় যেগুলো অন্যকে রহিত করতে সক্ষম[২৪১]।

ইমাম শাতবী তাঁর আল মাওয়াফিকাত গ্রন্থে বলেছেন : শরিয়াহ প্রণেতার অবস্থান এবং তিনি যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন সেই অনুযায়ী মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের নিমিত্ত আহকাম ও বিধানসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে, মানুষের কামনা-বাসনা বা প্রবৃত্তির দাবী অনুযায়ী নয়। কাজেই শরিয়াহর বিধানসমূহের অনুবর্তন ছাড়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বান্দার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়[২৪২]।

আহকামের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী নীতি হচ্ছে এই যে, বান্দার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে আহকাম বৈধ হবে এবং তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ বিরোধী হলে তা হবে অবৈধ।

নাব্‌রাসুল উকুল গ্রন্থে বলা হয়েছে : আল্লাহ্ তায়ালা মহাজ্ঞানী। তাঁর সব কাজই জ্ঞানময়। তিনি উদ্দেশ্যবিহীন কোনো হুকুম দেন না। তার কোনো কারণ থাকবে এবং কারণ ছাড়া তিনি তাকে পূর্ণতা দান করেন না, একথা ঠিক নয়। বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তায়ালার কাজ ও কৌশলের সাথে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত। মোটকথা কুরআন ও হাদিসের যেসব নস্ দ্বারা বিধি-নিষেধ সূচক আহকাম প্রমাণিত সেসব নসের সাথে শরিয়াহ্ কারণ সমন্বিত কল্যাণ ও হিকমতেরও বিবরণ দেয়া হয়েছে। কাজেই যে কাজের সাথে কল্যাণ সম্পৃক্ত কল্যাণ সাধনের জন্য সে কাজ করার নির্দেশ রয়েছে। আর দুষ্টের দমনের উদ্দেশ্যে ধ্বংসাত্মক কাজ করতে নিষেধ

---

[২৪০] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৩।

[২৪১] কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৩।

[২৪২] আল মাওয়াফিকাত, পৃষ্ঠা ১২।

www.pathagar.com

করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, কল্যাণমূলক কাজ করা ওয়াজিব এবং ধ্বংসাত্মক কাজ দমন করা ওয়াজিব। কারণ শরিয়তী বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এটাই।

যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, শর্য়ী বিধান প্রবর্তনের মধ্যে প্রবর্তকের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তখন কর্ম সম্পাদনের সময় এসব বিধানের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় শরিয়াহ প্রবর্তকের দৃষ্টিতে তা বিবেচিত হবে না। এ কারণে শরিয়াহ প্রবর্তকের দৃষ্টিতে যেসব বিরোধমূলক কাজ অগ্রহণযোগ্য আমরা এখানে সেগুলোর একটি বিবরণ দেবো। তাই প্রথম বিষয়ের আলোচনার এখানেই ইতি টানছি।

দ্বিতীয় বিষয় : শরিয়াহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী কাজ বাতিল

একথা সর্বজনবিদিত, শরিয়াহ প্রণেতার শরিয়াহ বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আইনের আওতাধীন করা, যাতে সে প্রবৃত্তির গণ্ডী থেকে বের হয়ে আসতে পারে। এভাবে সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহ তায়ালার বান্দায় পরিণত হয়[২৪৩]। এর স্বপক্ষে অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে। ইতিপূর্বে আইনদাতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণের নিন্দায় কুরআন ও হাদিস থেকে অনেক দলিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও প্রচলিত রীতি প্রমাণ করে যে, কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্ব করতো এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই সে প্রবৃত্তির পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরতো। আইনদাতার ইচ্ছা বিরোধী কাজে, হত্যাকাণ্ডে, অর্থহীন প্রতিযোগিতায় এবং ক্ষেতখামার ও বংশ বিনাশক কাজে অনিবার্যভাবে লিপ্ত থাকতো। প্রবৃত্তির দাসত্ব করা এমন একটি ব্যাপার যার নিন্দা করা হয়েছে কুরআন-হাদিসে এবং সুস্থ বিচার বুদ্ধিতেও।

এহেন অবস্থায় কারো পক্ষে এ ধরনের দাবী করা যুক্তিযুক্ত নয় যে, শরিয়াহ্র বিধান মানুষের কামনা-বাসনা ও স্বার্থ অনুযায়ীই তৈরি করা হয়েছে। তবে ওয়াজিব ও হারামের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা প্রবৃত্তির দাসত্ব ও স্বার্থসমূহের অবাধ চাহিদার প্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, এ কথা সুস্পষ্ট। তুমি অমুক কাজটি করো এবং তুমি অমুক কাজটি করো না- একটি আদেশ সূচক এবং অন্যটি নিষেধ সূচক বাক্য। দুটি বাক্যেরই উদ্দেশ্য আছে অথবা নেই। যদি এ কথায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এ বাক্য

---

[২৪৩] আল-মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২০।

www.pathagar.com

দুটিতে আদেশ ও নিষেধের দাবী অনুযায়ী দায়িত্বশীলের স্বপক্ষীয় উদ্দেশ্য এবং কারণভিত্তিক বাসনা আছে তাহলে সেটা হবে ঘটনাক্রমিক, প্রকৃত অর্থে নয়[২৪৪]।

শরিয়াহ আহকামের অবশিষ্ট প্রকারগুলো দৃশ্যত দায়িত্বশীলের ইচ্ছাধীন হলেও মূলত এগুলো আইন দাতার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাশক্তি থেকে বের হয়ে এলেও এ ধরনের আহকাম আবার মানুষকে সেখানে ফিরিয়ে নেয়। কারণ সে কোনো ইবাহাত (অনুমোদিত হুকুম) রহিত কিংবা পরিবর্তন করতে সক্ষম কিন্তু আইনদাতার বৃত্ত থেকে বের হবার কোনো অবকাশ তার নেই।

যে বিষয়টির ওপর ভর করে প্রবৃত্তি ও অভিসন্ধি বিন্যস্ত হয় সেটি হচ্ছে আইন শৃংখলার বিনাশ। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

> সত্য যদি তাদের কামনা বাসনার অনুগামী হতো তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়তো আকাশ মণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই[২৪৫]।

আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন : প্রবৃত্তির অনুগামিতা তিনটি ধ্বংস নিশ্চিত করে। যেমন মুবাহ জিনিসকে মুবাহ মনে করা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাশক্তিকে মানুষের ইচ্ছাশক্তির আওতাধীন করতে বাধ্য করে না। তবে আইন প্রণেতার ইচ্ছা অনুযায়ী হলে স্বতন্ত্র কথা। এ অবস্থায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি আইন প্রণেতার ইচ্ছাশক্তির আওতাধীন থাকবে এবং শরয়ী অনুমতি থেকেই তার স্বার্থ গঠিত হবে[২৪৬]।

যদি বলা হয়, শরিয়াহর বিধান অনর্থক প্রণীত হয়েছে, তাহলে একথা সর্বৈব মিথ্যা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً

> তোমরা কি মনে করো তোমাদের আমি অনর্থক সৃষ্টি করেছি?[২৪৭]

তিনি আরো বলেন :

---

[২৪৪] শায়খ ঈসা মানুফ, নিবরাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ৩২৪, ৩২৬, ৩২৮, শাইখ মুহাম্মদ আনীস উবাদাহ, মাকাসিদুশ শরিয়াহ, পৃষ্ঠা ১০ ।

[২৪৫] সুরা আল মুমিনূন, ৭১ আয়াত।

[২৪৬] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, ১২২-১২৩ আয়াত।

[২৪৭] সুরা আল মুমিনূন, ১১৫ আয়াত।

www.pathagar.com

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ- مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

আকাশমণ্ডলীও পৃথিবীতে এবং তাদের উভয়ের মাঝখানে যা আছে তাকে আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি বরং সত্যসহকারে এ দুটিকে আমি সৃষ্টি করেছি[২৪৮]।

আর যদি বলা হয়, শরিয়াহ বিধান জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণমূলক, তাহলে একথা ঠিক। এ কল্যাণ আল্লাহ তায়ালা অথবা মানব গোষ্ঠীর জন্য। আল্লাহ তায়ালার জন্য এ কল্যাণ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগতের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন, তিনি এর উর্ধ্বে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই কল্যাণের উপকারিতা আল্লাহ তায়ালার দিকে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কাজেই কল্যাণের উপকারিতা বান্দার জন্য নির্ধারিত হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। আর মানবিক স্বার্থের দাবীও এটিই। কারণ প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের কল্যাণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উপযোগী কামনার প্রত্যাশা করে। শরিয়াহ বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের এ লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাজেই একথা কেমন করে অস্বীকার করা যেতে পারে যে, মানুষের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাবী অনুযায়ী শরিয়াহ প্রবর্তিত হয়েছে[২৪৯]?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে : মানব কল্যাণ শরিয়াহ প্রবর্তনের লক্ষ্য একথা যখন স্বীকৃত এবং এ কল্যাণ শরিয়াহদাতার নির্দেশ অনুসারে বান্দার এবং তাঁরই নির্ধারিত সীমায় প্রত্যাবর্তন করে বান্দার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাবী অনুযায়ী নয়- তখন শরিয়াহর বিধানগুলো পালন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অভ্যাস, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা এ কথার সাক্ষী। কেননা আদেশ ও নিষেধমূলক বিধান মানুষকে তার অভিলাস ও অভ্যাসের চাহিদা থেকে বের করে এনে শরিয়াহর গণ্ডীর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। এটিই আসল উদ্দেশ্য এবং এরূপ করা অভিলাস ও প্রবৃত্তির সরাসরি বিরোধিতা[২৫০]।

অবশ্য বিধানের কল্যাণ বিধান পালনকারীর প্রতি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আরোপিত হওয়াটাই যথার্থ। এ থেকে অনিবার্যভাবে আরোপিত হওয়াটাই যথার্থ। এ থেকে অনিবার্যভাবে একথা বুঝায় না যে, সে এ কল্যাণ শরিয়াহ সীমার বাইরে অর্জন

---

[২৪৮] সুরা আদ দুখান, ৩৮-৩৯ আয়াত।

[২৪৯] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, ১২৩ আয়াত।

[২৫০] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, ১২৩ আয়াত।

www.pathagar.com

করবে। এ তত্ত্বটি আগের আলোচনার সাথে সাংঘর্ষিক ও বিপরীত হওয়াও বুঝায় না। কেননা আগের আলোচনায় আইনদাতার প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী অংশও উদ্দেশ্য প্রমাণ করার কথা বলা হয়েছে, প্রবৃত্তি ও কামনার দাবী অনুযায়ী নয়। আর এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য[২৫১]।

সর্বাবস্থায় দায়িত্বশীলদের কর্মতৎপরতা পরিমাপ করার জন্য যখন শরিয়াহ প্রবর্তিত হয়েছে এবং মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন ও বিপর্যয় রোধ করা আইনদাতার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য তখন এসব উদ্দেশ্য শরিয়াহর বিধিবদ্ধ পন্থা ও শ্রমলব্ধ কর্মসূচী ছাড়া অন্য পন্থায় অর্জন করা যাবে না।

দায়িত্বশীল যখন শরিয়াহ আনীত বিষয়ের বিরোধিতা করে তখন তার এ ধরনের কাজ শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী তৎপরতা হিসেবে গণ্য হবে। বিধানদাতার ইচ্ছা বিরোধী এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজই বাতিল, যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না[২৫২]।

শরিয়াহ বিরোধী কাজ বাতিল হওয়ার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। কারণ মানব কল্যাণ সাধন ও ফিতনা ফাসাদ প্রতিরোধ করার জন্যই শরিয়াহ বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। কাজেই যে কাজে মানুষের কল্যাণ নেই এবং যা অকল্যাণ প্রতিরোধেও সহায়ক নয়, তা বাতিল হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য শরিয়াহর বিধান প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত কাজটি ভালো কি মন্দ তা নির্ণয় করে ভালো কাজটি করা এবং মন্দ কাজটি পরিত্যাগ করার দৃষ্টান্ত পেশ করা দুরূহ ছিল। আলোচনার ভূমিকায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আইন প্রণেতা যখন অনেক কাজের মধ্যে এক ধরনের কাজকে কল্যাণের জন্য এবং অন্য ধরনের কাজকে অকল্যাণের জন্য নির্ধারণ করেছেন তখন কল্যাণের কারণের কথাও উল্লেখ করে কল্যাণমূলক কাজ করার নির্দেশ বা অনুমতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে অকল্যাণের কারণ বর্ণনা করে অকল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা মানুষের জন্য রহমত এ কথাও বলেছেন।

অনুমতি প্রাপ্তির মাধ্যমে আইনদাতার যথার্থ ইচ্ছাই যখন দায়িত্বশীল মানুষের ইচ্ছা হয় তখন কল্যাণের কারণের মধ্যে যে ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটে তা পরিপূর্ণ ইচ্ছারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ অবস্থায় এটি অর্জন করা অধিকতর উপযোগী। অন্যদিকে

---

[২৫১] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, ১২৩ আয়াত।

[২৫২] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, ১২৩ আয়াত এবং জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৫১-৫২।

www.pathagar.com

আইনদাতার যা ইচ্ছা নয় এমন বিষয়ের ইচ্ছা পোষণ করা অর্থাৎ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনমূলক কাজ না হলে তা হবে শরিয়াহর দৃষ্টিতে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য[২৫৩]।

দায়িত্বশীলের শরিয়াহ বিরোধী কাজ বিধানদাতার ইচ্ছা বিরোধী কাজ রূপে গণ্য হওয়ার প্রমাণ হলো :

এক. দায়িত্বশীল ব্যক্তি সাধারণভাবে আদেশদাতার অনিচ্ছাসূচক বিধানের ধারক হয়ে থাকে। এ ধরনের তৎপরতা মূলত অসাংবিধানিক কর্মধারার অংশ হিসেবে গণ্য। কারণ আদেশদাতা কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নির্দিষ্ট হুকুম প্রবর্তন করেছেন। দায়িত্বশীলের ইচ্ছা ঐ নির্দিষ্ট হুকুমের খেলাফ হলে প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছাটি বিধিসম্মত হবে না। ইচ্ছা বা কাজ বিধিসম্মত না হলে কাজটি আদেশদাতার বিরোধী হওয়াই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় দায়িত্বশীল সম্পর্কে বলা হবে, যা করতে বলা হয়নি তাই সে করেছে এবং যা করতে বলা হয়েছে তা সে পরিত্যাগ করেছে। নিঃসন্দেহে এটা স্ববিরোধী কাজ।

দুই. দায়িত্বশীলের ইচ্ছা শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছাকে অর্থহীন গণ্য করা। আর অর্থহীন ও নিস্ফল ইচ্ছা শরিয়াহ প্রণেতার গ্রহণীয় ইচ্ছা হতে পারে না। কারণ শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছার সারৎসার হলো দায়িত্বশীলের কল্যাণ করা অথচ এ কল্যাণ বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে কল্যাণ নয়। শরিয়াহ প্রণেতার দৃষ্টিতে যা অকল্যাণকর দায়িত্বশীলের সেটাকে কল্যাণ মনে না করা শরিয়াহী আইনের সুস্পষ্ট পরিপন্থী।

তিন. আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা অনুসারে দায়িত্বশীলকে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কাজটি সে অনুযায়ী না হয়ে ব্যক্তির অভিলাস চরিতার্থের উপকরণ হিসেবে সম্পাদিত হলে সে কাজ সত্যিকার অর্থে লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে না। বরং এ অবস্থায় শরিয়াহ প্রণেতার বিধানকে মতলব হাসিলের হাতিয়ার বানানোরই নামান্তর হবে। যেমন একজন মতলববাজ লোক অন্যের থেকে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে তার ভালো কাজগুলোকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বস্তুত দুনিয়ায় এ পথেই সব ধরনের বিপর্যয় ও ফিত্‌নার আগমন হয়ে থাকে। কারণ

---

[২৫৩] জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৫১, ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৩ এবং খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৩, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৪।

www.pathagar.com

প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু লোকের অস্তিত্ব দেখা যায় যারা শরিয়াহ প্রণেতার বৈধ আইন কানুনকে নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের উপকরণ কিংবা শুধুমাত্র বৈধ বৈষয়িক ক্ষতিপূরণের আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে[২৫৪]।

চার. এ ধরনের তৎপরতা বন্ধ হবার কুরআন ও হাদিসভিত্তিক প্রমাণ। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً

কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হবার পর সে যদি রসুল সা.-এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করবো, আর তা কত মন্দ আবাস[২৫৫]।

যা রসুল সা. গ্রহণ করেননি তাকে লক্ষ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা এবং তার সাহায্যে কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ রোধ করার ধারণা করা স্পষ্টত রসুল সা.-এর বিরোধিতা। আর রসুল সা.-এর বিরোধী প্রত্যেকটি কাজই তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যা এসেছে তার বিরোধী হওয়াই স্বাভাবিক। এ পর্যায়ে উমর ইবনে আবদুল আযীযের র. ভাষ্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : রসুল সা. তাঁর পরের শাসনকর্তাদের ঘষে মেজে শাণিত করে গিয়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার কিতাবকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, তার পূর্ণ আনুগত্য করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে শক্তিশালী করেছিলেন। তাদের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী যে চলবে সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। যে তাদেরকে সাহায্য করবে তাকে সাহায্য করা হবে। আর যে এর বিরোধিতা করবে প্রকারান্তরে সে ইমানদারদের ও আল্লাহ তায়ালার শাসকদের বিরোধী পন্থার অনুসারী হয়ে যাবে। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে নিকৃষ্ট জাহান্নাম[২৫৬]।

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা বিরোধী কাজ বাতিল হওয়ার হাদিস ভিত্তিক অপর দলিল হলো নবি সা.-এর বাণী :

---

[২৫৪] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৪। কারাফী, আল ফুরুক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২।

[২৫৫] সুরা আন নিসা, ১১৫ আয়াত।

[২৫৬] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৪।

www.pathagar.com

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

নিয়তের ওপর কাজ নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই তার ইচ্ছা বা নিয়ত অনুযায়ী কাজের ফলাফল পাবে। কারো হিজরাত বা দেশত্যাগ আল্লাহ তায়ালা ও রসুল সা.-এর সান্নিধ্য লাভের আকাংখায় হলে সে সেই কাংখিত বস্তুই পাবে। আবার কারো হিজরাত বৈষয়িক কিংবা কোনো মেয়েকে বিয়ে করার অভিপ্রায়ে হলে সে তাই পেয়ে যাবে[২৫৭]।

তিনি সা. আরো বলেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

আমাদের কাজের মধ্যে যে নতুন কিছু আরোপ করবে যা আগে ছিলনা, তা হবে পরিত্যক্ত।

অন্য একটি হাদিসে বলেছেন :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যার ওপর আমাদের কর্ম আরোপ করা যায় না তা হবে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য[২৫৮]।

উপরিউক্ত হাদিস দুটি ইসলামের মহান মূল নীতির অন্যতম। 'নিয়তের ওপর কাজ নির্ভরশীল-হাদিসটি বাতেন বা অপ্রকাশ্য কাজের মানদণ্ড। অন্য হাদিস দু'টি প্রকাশ্য কাজের মানদণ্ড। অন্যকথায় বলা যায়, যে কাজে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা নিহিত থাকবে না সে কাজে সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায় না। এমনিভাবে যে কাজে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা.-এর সম্মতি নেই সে কাজ পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য।

---

[২৫৭] উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে ইমাম বুখারী হাদিসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

[২৫৮] বুখারি ও মুসলিমের রেওয়ায়েত এবং রেওয়ায়েতের শেষ অংশটুকু মুসলিমের।

www.pathagar.com

শেষ হাদিসের ভাষ্যে একথা প্রতীয়মান হয় যে, যেসব কাজে শরিয়াহ্ প্রণেতা তথা আল্লাহ তায়ালার সম্মতিসূচক নির্দেশ নেই তা পরিত্যাজ্য। এখানে নির্দেশের অর্থ হলো দ্বীন ও শরিয়াহর নির্দেশ। কাজেই ব্যক্তির প্রতিটি কাজই শরিয়াহ বিধানের আওতাভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে শরিয়াহ বিধানাবলী মানুষের ওপর কর্তৃত্বশালী হতো। কাজেই মানুষের কাজ যখন শরিয়াহ বিধানের অন্তর্গত ও সমর্থনপুষ্ট হয় তখন তা গ্রহণীয় হয়। আর তা শরিয়াহ বিধানের বাইরে হলে অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত হয়[২৫৯]।

উপরিউক্ত বক্তব্যের উদাহরণ

এক, কালেমার ভাষ্য ও সালাত ইত্যাকার ইবাদতগুলো আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভ এবং মহত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। আনুগত্য ও বশ্যতার ক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে মনের মিল থাকার প্রতি এ ধরনের ইবাদত ইংগিত বহন করে। এটাই শরিয়াহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্য। মানুষ যখন জাগতিক স্বার্থে কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ প্রতিরোধের অভিপ্রায়ে উপরিউক্ত কাজ করে; যেমন অন্য কিছুর জন্য নয় বরং কেবলমাত্র প্রাণ ও ধন-সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে কালেমার ঘোষণা দেয়া কিংবা মানুষের প্রশংসা পাওয়া অথবা দুনিয়াতে মর্যাদা লাভের অভিপ্রায়ে নামায পড়া। এ ধরনের কাজ দৃশ্যত বিধিবদ্ধ মনে হলেও মূলত এগুলো শরিয়াহসম্মত নয়। কারণ যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কাজের প্রবর্তন করা হয়েছে কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য বিকৃত হওয়ায় কাজগুলো বিধিবদ্ধ ও প্রত্যাশিত লক্ষ্যের বিপরীত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

দুই. যাকাত বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো ধনী ব্যক্তিদের মন-মস্তিষ্ক থেকে কৃপণতার অপছায়া হটিয়ে দেয়া, গরীব-দুঃখীদের হৃদয়-মন হিংসা-বিদ্বেষের পংকিলতামুক্ত করা, গরীব-মিসকিনের উপকার করা এবং অবহেলাকারী ও শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদেরকে ত্যাগ-তিতীক্ষার জন্য পুনরুজ্জীবিত করা। যে ব্যক্তির ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে গেছে সে তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বছরের শেষ দিকে যাকাত দান করলো। তারপর বছর অতিক্রান্ত হবার পর সে তার দানকৃত সম্পদ ফেরত চাইলো। এ ধরনের দানে যাকাতের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বরং কার্পণ্য প্রবণতা শক্তিশালী হয়, হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে যায় এবং

---

[২৫৯] জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৫১-৫২ এবং ১০৩-১১১ পৃষ্ঠা, মুসলিমের উপর ইমাম নববীর শারাহ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪ ।

www.pathagar.com

গরীব-দুঃখীদের সাথে আন্তরিকতার পরিবেশ শিথিল হয়ে যায়। এ ধরনের দান-খয়রাত শরিয়াহসম্মত না হওয়া এবং শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী হওয়া সহজেই অনুমেয়। কারণ দানের লক্ষ্য হলো দান গ্রহণকারী ব্যক্তি ধনী হোক বা গরীব তার প্রতি সহানভূতি জ্ঞাপন করা। এ ধরনের অপতৎপরতা শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী হওয়ায় এসব বিধিবদ্ধ আইন-কানুনের জন্য হুমকিস্বরূপ।

তিন. ফিদিয়া আইনসিদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যই হলো, স্বামীর সম্মতিক্রমে স্ত্রীর মান-ইজ্জত বেচাকেনা তথা পদদলিত হওয়া থেকে রক্ষা করা। এরূপ ব্যবস্থা অবৈধ পথে অগ্রসর না হওয়ার জন্য রক্ষাকবচও। আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব হওয়া অবস্থায় ফিদিয়া বিকল্প প্রক্রিয়া।

ফিদিয়ার এটিই শরিয়াহসম্মত ও কল্যাণমূলক লক্ষ্য। সময় ও সম্পদ কোনো দিক দিয়েই এ বিধানে অকল্যাণ নেই। স্বামী ফিদিয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করলে তা হবে শরিয়াহ বিরোধী। কারণ চাপ সৃষ্টি ছাড়াই যখন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অবকাশ রয়েছে চাপ সৃষ্টি করা শরিয়াহর বিধান বহির্ভূত। এ অবস্থায় ফিদিয়া تسريح بإحسان তথা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়া'র তাৎপর্য বহন করে না। কারণ এটা হলো চাপের মুখে আদায় করা ফিদিয়া। চাপ প্রয়োগ করা না করার দিক থেকে যদিও এটা স্ত্রীর জন্য জায়েয কিন্তু স্বামীর জন্য কোনোক্রমেই জায়েয নয়। কারণ এরূপ করা ফিদিয়া প্রবর্তনের উদ্দেশ্য বিরোধী[২৬০]।

চার. ব্যভিচারের দণ্ড বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো বংশ ও গোষ্ঠীর কল্যাণ রক্ষা করা। এ কারণেই এ অপরাধের জন্য নির্মম শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে কোনোপ্রকার দয়া ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অবকাশ রাখা হয়নি। ফলে এ ধরনের শাস্তি হয় রক্ষাকবচ ও দৃষ্টান্তমূলক। এ ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ ক্ষেত্রে আর্থিক দণ্ডাদেশ মূলত অগ্রহণযোগ্য এবং মালিকানা পরিবর্তনেরও অবকাশ নেই। কারণ এরূপ করা শরিয়াহর দৃষ্টিতে অনভিপ্রেত এবং শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধীও। নিম্নোক্ত হাদিসটি এর প্রমাণ। হাদিসটিতে বলা হয়েছে : এক ব্যক্তি রসুল সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ছেলে অমুকের কর্মচারী ছিল। সে মালিকের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করলে আমি অপরাধের শাস্তি স্বরূপ লোকটিকে একশত ছাগল ও একজন খাদেম ফিদিয়াস্বরূপ প্রদান করেছি। তিনি

[২৬০] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২০ এবং জামেউল উলূম ওয়ালহিকাম, পৃষ্ঠা ৫২।

www.pathagar.com

বললেন, একশত ছাগল ও খাদেম তুমি ফেরত নিয়ে যাও। তোমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরী করা হবে[২৬১]।

ব্যভিচারের শাস্তি আর্থিকভাবে প্রদান করা শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী। তাছাড়া এ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে বংশ সংরক্ষণের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ নেই।

আমরা বলতে পারি, মানুষের কাজের তিনটি উদ্দেশ্য থাকে। একটি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত। এ ধরনের কাজ গৃহীত হবে এটাই স্বাভাবিক পূণ্যময় ও বাঞ্ছনীয়। মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব এটিই দাবী করে। কাজের অন্য উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত না হওয়া। এ ধরনের কাজ আপাতদৃষ্টিতে কল্যাণমুখী হলেও প্রকৃতপক্ষে তা গৃহীত পূণ্যময় ও বাঞ্ছনীয় নয়। সামনের দিকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এখন থাকে তৃতীয় উদ্দেশ্যটি। আল্লাহ তায়ালা ও গায়রুল্লাহ উভয়ের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা হয়। এ উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার জন্য নয় আবার সম্পূর্ণ গায়রুল্লাহর জন্যও নয়। এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক কাজের হুকুম কি? যতটুকু আল্লাহ তায়ালার জন্য ততটুকু গৃহীত এবং বাকিটুকু পরিত্যক্ত অথবা সবটুকু বাতিল, এ নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। এর জবাবে বলতে চাই, এই উদ্দেশ্য হয় তিন ধরনের :

এক. কাজের সূচনায় ছিল আল্লাহ তায়ালার প্রতি একাত্মতা ও নিঃস্বার্থপরতা। পরে মাঝপথে প্রদর্শনেচ্ছা, স্বার্থপরতা ও গায়রুল্লাহ প্রীতি ইত্যাকার অসৎ উদ্দেশ্যাবলী প্রারম্ভিক উদ্দেশ্যের সাথে মিশে যায়। এ ধরনের কাজের ফলাফল মধ্যবর্তী সময়ের নিয়তের দৃঢ়তার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, গায়রুল্লাহ তথা অসৎ উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা সৎ উদ্দেশ্যকে রহিত না করা পর্যন্ত কাজটি মূল্যায়নযোগ্য।

দুই. প্রথমটির বিপরীত। অর্থাৎ কাজের সূচনাই হয়েছে গায়রুল্লাহ বা অসৎ উদ্দেশ্যে। পরে গায়রুল্লাহর সাথে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন মিশে যায়। অতীতের এ ধরনের কাজ বিবেচনাযোগ্য নয়। বিবেচনাযোগ্য হয় বর্তমানের এ ধরনের কাজের দৃঢ়তা ও উদ্দেশ্য। ইবাদত যদি এমন পর্যায়ের

[২৬১] জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৫৪ মুসলিমের উপর ইমাম নববীর শারাহ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০, মিসরের আযহারে মুদ্রিত।

www.pathagar.com

হয় তাহলে তার সূচনা সঠিক না হলে সমাপ্তিও সঠিক হবে না। এ অবস্থায় এটি পুনরায় করতে হবে। যেমন সালাত। আর এ ধরনের না হলে পুনরায় করা জরুরি নয়। যেমন কারোর আরাফাতের ময়দানে অবস্থান শুরুতে গায়রুল্লাহর জন্য ছিল। পরে নিয়তের পরিবর্তন ঘটলো এবং এ অবস্থায় অরাফাতে অবস্থানের কাজটি পুনরায় করা ওয়াজিব নয়।

তিন. আল্লাহ তায়ালা ও মানুষ উভয়ের উদ্দেশ্যে কাজ বা ইবাদতের সূচনা করা হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ফরয আদায় করা হয় এবং মানুষের কাছ থেকে তার প্রতিদান ও ধন্যবাদ পাওয়ার প্রত্যাশা করা হয়। যেমন প্রতিদানের বিনিময়ে কারো সালাত আদায় করা। এ ক্ষেত্রে তার সালাত আল্লাহ তায়ালা ও মানুষ উভয়ের উদ্দেশ্যে হবে যদিও সে বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ না করেই সালাত করে থাকে। অনুরূপভাবে ফরযের দায়িত্ব এড়ানোর উদ্দেশ্যে হজ্জ করা। সাথে উদ্দেশ্য এটাও থাকে যে, লোকে বলবে- অমুক হাজী সাব। এমনিভাবে যাকাত আদায় করা। ফরযের দায়িত্ব পালন করার শর্ত থাকলেও এ ধরনের মিশ্র ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। এ পন্থায় আদায়কৃত ফরয কাজ আবার করা ওয়াজিব। কারণ কাজের বিশুদ্ধ ও ফলপ্রসূ হওয়ার শর্ত হচ্ছে যথার্থ আন্তরিকতা ও একমুখিতা। এ শর্তটি এ ধরনের ইবাদতে অনুপস্থিত। এ ধরনের কাজের হুকুম শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। শর্তের অনুপস্থিতিতে হুকুম ও অনুপস্থিত হয়।

ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও একমুখীতা হলো নিখুঁত ও নির্ভেজাল উদ্দেশ্য হওয়া, আনুগত্য মাবুদের জন্য নিবেদিত হওয়া এবং তাঁর ছাড়া আর কারোর জন্য নির্দেশিত না হওয়া। আদিষ্ট বস্তু এ পর্যায়ে পৌঁছলে এবং নির্দেশ দেবার সময়ের মধ্যে আর কিছু অবশিষ্ট না থাকলে ইখলাস পূর্ণতা লাভ করে[২৬২]।

সুস্পষ্ট হাদিস এর প্রমাণ। যেমন নবি সা. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

---

[২৬২] ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪ ।

www.pathagar.com

আমি মুশরিকদের শিরক থেকে মুক্ত। যে এমন কাজ করে যার মধ্যে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমার সাথে শরীক করে আমি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি যে, সে শিরক করতেই থাকবে[২৬৩]।

এ অর্থই প্রতিধ্বনি হয়েছে আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে :

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভের অভিলাসী তার নেক কাজ করা উচিত এবং তার রবের ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা উচিত নয়[২৬৪]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

দ্বীনের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কিছুর জন্য তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়নি[২৬৫]।

একবার রসুল সা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছে, অন্য একজন ক্রোধের বশে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং তৃতীয় জন লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ করছে- এদের মধ্যে কে আল্লাহ তায়ালার পথে যুদ্ধ করছে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কালেমাকে বুলন্দ করার অভিপ্রায়ে যুদ্ধে লিপ্ত সে আল্লাহ তায়ালার পথে যুদ্ধ করছে[২৬৬]। যুদ্ধের প্রকৃতি এক কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। যেমন সিজদার ধরন এক, কিন্তু সিজদা আল্লাহ তায়ালার জন্য হলে হবে ইমান আর গায়রুল্লাহর জন্য হলে হবে কুফরী।

উদ্দেশ্য দু'ভাগে বিভক্ত : মৌলিক ও সহায়ক

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, শরিয়াহর উদ্দেশ্যসমূহ মৌলিক ও সহায়ক হিসেবে দুভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ শরিয়াহ প্রণেতার স্বাভাবিক ও বশ্যতামূলক আহকামের কিছু

---

[২৬৩] ইমাম মুসলিম আবু হুরাইরা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, আত তাজুল জামে' লিল উসূলে ফী আহাদীসির রসূল, খণ্ড ১, ৫৭ পৃষ্ঠা।

[২৬৪] সুরা আল কাহাফ, ১১০ আয়াত।

[২৬৫] সুরা আল বাইয়িনাহ, ৫ আয়াত।

[২৬৬] একদল রাবী হাদিসটি রেওয়ায়েত করেছেন। শাওকানীর নাইলুল আওতারে এবং মুসলিমে এটি উদ্ধৃত হয়েছে এই শব্দাবলী সহকারে।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য মৌলিক এবং কিছু উদ্দেশ্য তাদের সহায়ক। যেমন বিবাহের উদ্দেশ্যের কথা ধরা যায়। বংশ বৃদ্ধিই হচ্ছে বিবাহের মৌল উদ্দেশ্য। বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি করা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধন তৈরি করা। পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনের ইচ্ছা পোষণ করা। স্ত্রীর সম্পদের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া, স্ত্রীকে স্বামীর পরিমণ্ডলে এবং সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বেরাদরের পরিধিতে প্রতিষ্ঠিত করা। চোখ-কান, লজ্জাস্থান ইত্যাকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যৌনতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি হারাম কাজ থেকে হেফাজত করা। এসব বৈশিষ্ট্য হলো বিবাহ কর্মের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য[২৬৭]।

বিবাহ প্রথা প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত বিষয়গুলোর বাস্তবায়নই আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য। এগুলো নস্ (কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশ) অথবা ইশারা (ইঙ্গিতবহ নির্দেশ) দ্বারা প্রমাণিত। এর মধ্যে আবার কতকগুলো রীতি-নীতি এবং নস্ থেকে অনুসৃত ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। এসব আনুসংগিক উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বাড়ায়, কৌশলে শক্তি যোগায় এবং মৌল উদ্দেশ্যের অন্বেষণ ও প্রয়োগকে বিধিবদ্ধ করে। এ ধরনের উদ্দেশ্য শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যের বিপরীত নয় এবং তাতে মূল উদ্দেশ্য বাতিল হয়না, যদিও এ ধরনের উদ্দেশ্যকে মানব মস্তিষ্ক প্রসূতরূপে গণ্য করা হয়। কারণ এসব প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য শরিয়াহ প্রণেতা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যের অধীন থাকে এবং তাকে নিশ্চিত করে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাবিরোধী হলে তা হবে অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত। যেমন : মুতআ বিবাহ ও মুহাল্লাল বিবাহ। কারণ এ ধরনের কাজ সার্বিক আকাংখার বিপরীত। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিধানসম্মত উদ্দেশ্য হলো চিরন্তন সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করা। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে (মুতা বা মুহাল্লাল বিবাহ) বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য চিরন্তন ও সার্বিক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হতে পারে না। এ কারণে অধিকাংশ আলেম মুত্আ বিবাহ বাতিল হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতে বংশ রক্ষার আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

এমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত সম্পর্কেও বলা যায় যে, ইবাদতের মৌল উদ্দেশ্যই হচ্ছে একজন মাবুদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং এককভাবে তাঁরই ইবাদত করা। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার অলী হওয়া বা আখেরাতে মর্যাদা লাভের বিষয়টি হচ্ছে এর অনুবর্তী। এ ধরনের প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক ও

---

[২৬৭] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৬ এবং উসূলুল খিদরী পৃষ্ঠা ২৩২।

www.pathagar.com

শক্তি বর্ধক এবং গোপনে-প্রকাশ্যে চিরন্তন ও সর্বব্যাপী প্রত্যাশার বাস্তবায়নকারী হয়। তাছাড়া ইবাদত করার পেছনে যদি ধন-সম্পদ লাভ, প্রাণের হেফাজত কিংবা মানুষের কাছে সম্মান, মর্যাদা ও পার্থিব বস্তু লাভের সুপ্ত বাসনা থাকে তাহলে এ ধরনের উদ্দেশ্য শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী হওয়ায় এবং মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক ও সম্পূরক না হয়ে বিরোধী হওয়ায় তার পরিত্যাজ্য হওয়ার বিষয়টি সহজেই অনুমান করা যায়। সুপ্ত বাসনাগুলো চিরন্তন নয়, সাময়িক; সর্বব্যাপী নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রীক; উদ্দীপক নয়, হতাশা ব্যঞ্জক। এ ধরনের বাসনা মানুষকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে অক্ষম। এ ধরনের বাসনা সঞ্জাত ইবাদত মানুষকে সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী করে তোলে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
> فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

> মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি[২৬৮]।

কাজ করার সময় ব্যক্তি এ ধরনের মনোবাসনা পোষণ করলে কাজটি মূল উদ্দেশ্য বিরোধী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য হবেনা। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে মনের গহনে এ ধরনের মনোভাবের উদয় হলে তা ক্ষতিকর নয়। যেমন মূল লক্ষ্যকে অব্যাহত রাখার মানসে সাময়িক লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিবাহ করার পর বিচ্ছেদ ঘটে গেলে দৃশ্যত তা মুত্‌আ কিংবা তাহলীল বিবাহের সমপর্যায়ে হয়ে যায়। তেমনি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা পূরণের মানসে সাময়িক ইচ্ছাকে সামনে রেখে ইবাদত করতে গিয়ে জান-মালের হেফাজত এবং মান-মর্যাদা অর্জিত হয়ে গেলে তা দৃশ্যত রিয়া ও খ্যাতি অর্জনের সমপর্যায়ে পৌছে যায়। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা কাজের সূচনায় মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হলে তার পরিণতি শুভ ও কল্যাণকর হতে পারে না। অন্যদিকে মূল লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজের সূচনা করার পর সাময়িক উদ্দেশ্য সাধিত হলে তাতে মূল লক্ষ্য

---

[২৬৮] সুরা আল হাজ্জ, ১১ আয়াত।

www.pathagar.com

কল্যাণ সাধনে বিঘ্ন ঘটায় না[২৬৯]। (কাজেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে তা মুত্আয় এবং সালাতের মাধ্যমে সম্মান লাভ করলে তা রিয়ায় পরিণত হবে না। কেননা এ ধরনের উদ্দেশ্য লাভ কাজের সূচনায় ছিল না)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট জানা গেলো যে, আল্লাহ তায়ালা বিধান রচনা করেছেন তার পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে। দায়িত্বশীলের ইচ্ছা শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছার অনুসারী হলে কাজটি সঠিক, গ্রহণযোগ্য ও শুভ পরিণামবহ হবে। এ পর্যায়ে শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা হবে হুকুমদাতা আর মানুষের ইচ্ছা হবে হুকুমগ্রহীতা। হুকুম গ্রহীতার কাজ হুকুমদাতার ইচ্ছা বিরোধী হলেও তা হুকুমদাতার কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে মূল লক্ষ্যের সহায়ক ও সম্পূরক ইচ্ছা পোষণ করে কাজ শুরু করলে তাতে কাজটি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ কাজটির সূচনা হয়েছে সহায়ক ও সাময়িক উদ্দেশ্য নিয়ে, মূল উদ্দেশ্য টার্গেট করে নয়।

এ আলোচনার ইতি টানার আগে বিজ্ঞ উসূলবিদগণের দৃষ্টিতে একটি প্রখ্যাত বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। কেননা এ আলোচনার সাথে বিতর্কিত বিষয়টির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

বিষয়টি হচ্ছে : নিষিদ্ধ বস্তুর নিষিদ্ধ হওয়ার কার্যকারিতা। নিষিদ্ধ বিষয়টি কোনো কাজ অথবা কথা হতে পারে[২৭০]। নিষিদ্ধ কাজের উদাহরণ হলো, আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ الزِّنَىٰٓ

তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না[২৭১]।

অথবা আল্লাহ তায়ালার এ বাণী :

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

---

[২৬৯] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৬-২৯৮, ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৭ এবং জামেউল উলুম, পৃষ্ঠা ৫৩।

[২৭০] আহমদ ফাহ্মী আবু সুন্না, আল ওয়াসীত ফী উসূলে ফিক্হিল হানাফীয়্যা, পৃষ্ঠা ২১৮, জামউল জাওয়ামে খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯৬ এবং উসূলু মুহাম্মদ খিদরী পৃষ্ঠা ১২১-১২২।

[২৭১] সুরা আল ইস্রা, ৩২ আয়াত।

www.pathagar.com

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না[২৭২]।

কথার অর্থ হলো, শরিয়াহ্ প্রণেতা দু'পক্ষের মধ্যে কথার মাধ্যমে যে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেমন, বাঈ, কিফালত, ওয়াকফ ইত্যাকার শব্দগুলো। বাই শব্দটি দেয়া-নেওয়া তথা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বন্ধন স্থাপন করা বুঝায়। তেমিন নযর (মানত মানা) এবং ওয়াকফ প্রভু ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ বুঝায়।

কর্মমূলক নিষেধাজ্ঞা হলে নিষিদ্ধ কাজটি হবে সহজাত। তখন কর্মটি, যা হুকুমের জন্য নিয়ামতস্বরূপ তার কার্যকারণ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তবে কাজের নিষেধাজ্ঞা তা থেকে আলাদা হওয়া সম্ভব এবং তার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ দলিল থাকলে সেটা হবে স্বতন্ত্র ব্যাপার। যেমন হায়েয অবস্থায় স্ত্রী-সংগম নিষিদ্ধ হওয়ার কাজটি। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

পাক-পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম করো না[২৭৩]।

হুকুমের কার্যকারণ রহিত না হওয়ায় হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। যেমন অনুমতিপ্রাপ্ত কাজের ওপর হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এ কারণে এ দ্বারা প্রথম স্বামীর জন্য বিবাহের বৈধতা, মহর পূর্ণ করা এবং গর্ভধারণ পবিত্র করা প্রমাণিত হয়। তবে সতী-সাধ্বী রমনীদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা বাতিল হয় না। নিষিদ্ধকরণ যদি কথা ভিত্তিক হয় এবং কথাগুলো শরিয়াহ প্রণেতা কর্তৃক আইনের ভিত্তিমূলক আহকামের কার্যকারণ রূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হয় এবং সেগুলো শরিয়াহ সম্বন্ধে অনধিকার চর্চারূপে গণ্য হয় তাহলে এটিও তিন ধরনের হতে পারে :

প্রথমত, যে জিনিসের ওপর নিষিদ্ধ কথা প্রযোজ্য হবে তার স্বতঃই নিষিদ্ধ হওয়া। এমতাবস্থায় কথাটি গ্রহণ করা যাবে না। যেমন মৃত দেহ বিক্রি, স্বাধীন ব্যক্তির বেচা-কেনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, কথা প্রয়োগের কারণে জিনিসটির স্বতঃই হালাল হওয়া। তবে জিনিসের ওপর আরোপিত প্রভাবটি কিন্তু হালাল। যেমন খালা ও চাচীকে বিবাহ করা। মেয়েরা আক্দ-এর বন্ধনে আবদ্ধ হলে স্বতঃই হালাল হয়ে যায়। আক্দ এর ফল

---

[২৭২] সুরা আল বাকারাহ, ১৮৮ আয়াত।

[২৭৩] সুরা আল বাকারাহ, ২২২ আয়াত।

www.pathagar.com

কিংবা তার ওপর আরোপিত প্রভাব এমন বৈধতা অর্জন করে যা আক্‌দ করার আগে অর্জন করা যায় না।

তৃতীয়ত, কথাভিত্তিক জিনিসটি গ্রহণযোগ্য তবে কথার অন্য একটি প্রভাবে তা অবৈধ হয়ে যায়। যেমন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনির্ধারিত মূল্যে পশু বেচা-কেনা করা। বেচাকেনার আক্‌দ হওয়ায় পশুটি হালাল হলো এবং এ বেচাকেনার ফলে তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু এখানে অন্য একটি প্রভাব জিনিসটি থেকে উপকৃত হওয়াকে ঠেকিয়ে রেখেছে। সেটা হলো মালিকানা সত্ত্ব। কেননা এ ধরনের বেচাকেনায় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তবে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে অন্য প্রভাবে কোনো কিছুই তাদের ওপর আরোপিত হবে না। প্রথম অবস্থায় হবেনা সেটা আদৌ বৈধ না হওয়ার কারণে আর দ্বিতীয় অবস্থায় কোনো উপকার না থাকার কারণে। কারণ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া হলো হালাল বা বৈধ হওয়া। নিষেধের সাথে হালালের সংমিশ্রণ হয় না। কাজেই মুহরাম তথা যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদেরকে বিবাহ করা অস্তিত্বহীনের ক্রয়-বিক্রয়ের মতই বাতিল বলে গণ্য।

অবশ্য তৃতীয় অবস্থায় জিনিসটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়ার পশ্চাতে কারণ রয়েছে। সে কারণ হলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালিকানা সত্ত্ব থাকা, কিন্তু এর প্রভাব হারাম হওয়া তখনো অব্যাহত থাকে। তখন এ ধরনের মালিকানা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যায়। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকে এই অসততা যথা সম্ভব দূর করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। হানাফীগণ এ ধরনের আক্‌দকে ফাসেদ বা ক্ষতিকর আক্‌দ নামে অভিহিত করেছেন। এ ধরনের আকদ মূলগতভাবে বিধিবদ্ধ হয়েও গুণগত দিক দিয়ে বিধিবদ্ধ নয়। এ জন্য হানাফীগণ একে আক্‌দে ফাসেদ ও আক্‌দে বাতিল এ অপনামে অভিহিত করেছেন। যেক্ষেত্রে কার্যকারণের প্রয়োজন কিংবা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের অপরিহার্যতা দেখা দেয় সেসব অবস্থায় এগুলো আরোপ করার অবকাশ রয়েছে, অন্যথায় নয়।

এ হচ্ছে হানাফীগণের পদ্ধতিগত দিকদর্শন।

এক্ষেত্রে অন্য উসূলবিদগণ ভিন্নপ্রকার রায়ও প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে নিষেধাজ্ঞার অর্থ হলো, কার্যকারণ সাধারনভাবে রহিত করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। এই নিষিদ্ধকরণ হালাল করার অবকাশ না থাকার দরুণ হোক কিংবা আবশ্যকীয় অথবা বিচ্ছিন্ন বা বহির্ভূত কোনো বৈশিষ্ট্যের দরুণ হোক তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়।

www.pathagar.com

এ মতের অনুসারী আলেমগণ জুম্‌আর আযান হওয়ার পর বেচাকেনাকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

জুমু'আর দিন যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় তখন বেচাকেনা ত্যাগ করে আল্লাহ্ তায়ালার যিকরের দিকে দ্রুত চলে এসো[২৭৪]।

কালাম শাস্ত্রবিদগণের অধিকাংশের তৃতীয় একটি মত পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে : বস্তুর নিষিদ্ধকরণ তার নিজ সত্তার জন্য বা তার অংশের জন্য অথবা তার কোনো গুণের জন্য হোক, যা তার অংশ বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, মূলত তার কারণ রহিতকরণে হস্তক্ষেপ বুঝায়। তবে নিষিদ্ধ বস্তুতে যদি বাইরের কোনো কিছু থাকে তাহলে নিষিদ্ধকরণ রহিতকরণে হস্তক্ষেপ করবে না। কাজেই তাদের মতে মৃত দেহের বেচাকেনা করা যার বিক্রিযোগ্য দ্রব্য হওয়ার অবকাশ নেই আর শরিয়াহ প্রণেতার নিকট স্বীকৃতও নয় এমন কোনো শর্তযুক্ত বস্তুর বেচাকেনা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ধরনের বেচাকেনাই বাতিল। শরিয়াহর হুকুম তথা মালিকানা সত্ত্ব তার ওপর এ ধরনের বেচা-কেনায় প্রযোজ্য হবে না। প্রথমটিতে মালিকানা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা উপকার সাধিত হয় না। অথচ তাদের মতে সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং উপকার সাধিত হওয়া অত্যাবশ্যক। অন্যদিকে হানাফী কালাম শাস্ত্রবিদগণ এই অত্যাবশ্যকীয় সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেন।

বিষয়টি বিতর্কিত হওয়ার কারণ হলো, নিষিদ্ধ বস্তুটির তার গুণগত কারণে কিংবা স্বতই নিষিদ্ধ হওয়া এবং এ অবস্থায় তার শরিয়াহ্ প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া।

যাদের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধকরণ শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক তারা বস্তুর নিষিদ্ধকরণ সহজাত কিংবা গুণগত হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না এবং এ সুবাদে বাতিল ও ফাসেদের মধ্যেও তারা পার্থক্য স্বীকার করে না। আর যাদের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধকরণ শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তারা বলেন, বাতিলের অস্তিত্বহীনতায় এবং হুকুম প্রণয়নের ক্ষেত্রে বস্তুর হারাম অব্যাহত থাকার কথা স্বীকার করেই নিষিদ্ধ বস্তুর ওপর কোনো কোনো হাদিসভিত্তিক দলিল প্রযোজ্য হতে পারে।

[২৭৪] সুরা আল জুম্‌আ, ৯ আয়াত।

www.pathagar.com

এখানে মতপার্থক্যের দরুণ বস্তুর হারাম হওয়া নির্ধারণে কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ, হারাম পাওয়া গেলে এ ধরনের হারাম কাজ পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য হবে এবং সওয়াবের আশায় করা যাবে না। এ কারণে বিরোধ ফিরে আসবে মূলের দিকে। অর্থাৎ মূলের কোনো কোনো ফলাফল ও জাগতিক পরিণাম প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা এবং হারাম হওয়ার অস্তিত্ব বজায় রেখে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা না থাকা। অবশ্য হারাম হওয়ার অস্তিত্বসহ পরকালীন ফলাফল প্রযুক্ত না হওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

শরিয়াহ প্রণেতার মহান উদ্দেশ্যসমূহ যখন স্বীকৃত ও প্রমাণিত এবং তাঁর উদ্দেশ্য বিরোধী কর্মতৎপরতা বাতিল ও পরিত্যক্ত তখন তাঁর এসব উদ্দেশ্যের পরিচয় লাভ করা বিশেষত ফকীহ মুজতাহিদদের জন্য অপরিহার্য।

তৃতীয় বিষয় : মুজতাহিদের জন্য শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যসমূহের পরিচয় লাভ করার প্রয়োজনীয়তা এবং তার পন্থা

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, মানুষের কাজ শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী হলে তা বাতিল হয়ে যায়। মানুষের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই শরিয়াহ প্রবর্তিত হয়েছে। বিতর্কের ক্ষেত্রে এটা নির্ণীত হবে শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছানুসারে, বান্দার ইচ্ছানুসারে নয়। কারণ শরিয়াহর লক্ষ্য হলো, মানুষকে তার প্রবৃত্তির বেড়াজাল থেকে বের করে আনা এবং তাকে আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করানো, যাতে সে যথার্থ অনুগত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

এ বাস্তবতার আলোকে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এমনভাবে অবগত হওয়া বান্দার জন্য জরুরি যার ফলে মানুষের উদ্দেশ্য শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যের অনুগত ও অধীনস্ত হয়।

দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুকাল্লিদ (অন্যের উদ্ভাবিত বিধানের অনুসারী) হবে অথবা হবে মুজতাহিদ (নিজেই বিধান উদ্ভাবনকারী)। যদি সে সাধারণ একজন মুকাল্লিদ হয়, তাহলে মূলত শরিয়াহর বিশদ ব্যাখ্যামূলক উদ্দেশ্যাবলীর সাথে পরিচয় লাভ করা ছাড়াই সে শরিয়াহর বিধান মেনে চলবে। কারণ শরিয়াহর উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হওয়া একটি জ্ঞানগত সূক্ষ্ম তত্ত্ব। জ্ঞানের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাওয়া, অন্যান্য ধী-শক্তির অধিকারী হওয়া এবং তীক্ষ্ণ ও সুদৃঢ় অনুধাবন ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া ছাড়া এ সূক্ষ্ম তত্ত্বের সাগরে সাঁতরানো সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

কাজেই এ ধরনের মুকাল্লিদের জন্য নেতৃত্ব দেয়ার মতো একজন নেতা, নির্দেশ দানের জন্য একজন হুকুমদাতা এবং অনুসরণ করার মতো একজন বিজ্ঞ আলেম দরকার। একজন সুস্থ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জ্ঞাতসারে কোনো ব্যাপারে অযোগ্য লোকের অনুসরণ করা বৈধ নয়। যেমন একজন রোগীর জ্ঞাতসারে নিজেকে চিকিৎসার জন্য এমন একজনের কাছে সমর্পন করা অসম্ভব যে আদৌ চিকিৎসক নয়। তবে মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার[২৭৫]।

আর দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি মুজতাহিদ হয় তাহলে তিনি নস্ তথা কুরআন ও হাদিসের মৌল নির্দেশ, নিয়ম-কানুন ও মৌলিক উপাদান থেকে আহকাম উদ্ভাবন করে শরীয়তে সংযোজন করতে এবং ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল করতে পারেন। শরিয়াহর উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে এমন ব্যক্তির সুস্পষ্ট ধারণা হওয়া জরুরি। কারণ যেসব বিষয়ে তিনি ইজতিহাদ করবেন সেগুলোর দলিল সুস্পষ্ট নয়, যার সাহায্যে সেগুলোকে ফরযের মধ্যে গণ্য করা যায়। এ অবস্থায় চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলীর সবচেয়ে নিকটবর্তী যে হুকুমটি পরিদৃষ্ট হবে সেটির অনুসরণ করা কর্তব্য হবে। প্রথম মুজতাহিদের গবেষণালব্ধ নয় বরং শরিয়াহর দলিলভিত্তিক হুকুম মানতে হবে এবং পরবর্তীতে উদ্দেশ্যের কাছাকাছি গবেষণালব্ধ নির্দেশ মানতে হবে।

মুজতাহিদগণ শরিয়াহতে পাঁচ প্রকারের সংযোজন করেন

এক. কুরআন হাদিসে বর্ণিত যেসব শব্দ দলিল রূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলোর কাঠামোগত আভিধানিক তাৎপর্য গ্রহণ করেন এবং ফিক্হী দলিলের দাবী অনুযায়ী ব্যাপকভাবে সেগুলো ব্যবহার না করে উসূলবিদ আলেমগণ এ ধরনের বিশেষ বর্ণনার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন। বস্তুত মুজতাহিদগণ শরিয়াহ উদ্দেশ্যাবলি সম্পাদনের অভিপ্রায়ে এ ধরনের বিবরণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ, শব্দের আভিধানিক অর্থকে গুরুত্ব দেন এবং আইনগতভাবে তা প্রয়োগ করেন।

দুই. আভিধানিক দাবী কিংবা শরিয়াহ প্রয়োগের দাবী থেকে শব্দটির নিরাপদ থাকার গুরুত্বের পর চিন্তা করতে হবে, সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ এবং পরিচয় লাভের সন্ধানে পরিপূর্ণ গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন দলিলগুলো দ্বন্দ্বমূলক কিনা। এটা এজন্য করতে হবে,

---

[২৭৫] আল ই'তিসাম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫২, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬-১৩৭, ইবনে আশুর, মাকাসিদুশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ১২ এবং কারাফী, তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৯৭।

www.pathagar.com

যাতে ধারণা করা যায় যে, ঐসব দলিল পরিচয় বা নিদর্শন বাতিল হওয়া থেকে মুক্ত এবং যা বাতিল হওয়ার যোগ্য তা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। কিংবা সেগুলো সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট দলিল দ্বন্দ্বমূলক বা সাংঘর্ষিক হওয়া থেকে মুক্ত হওয়ার ধারণা হলে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আর দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলে একই সাথে দুটি দলিলকে অথবা একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজের ধরণ নির্ণয় করে নিতে হবে[২৭৬]।

উদ্দেশ্যাবলির সাথে পরিচয় লাভের ব্যাপারে মুজতাহিদগণ ১ম প্রকারের চাইতে ২য় প্রকারের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। কারণ একজন গবেষক গবেষণা কাজ করতে গেলে দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের সম্মুখীন হন। এ অবস্থায় গবেষক তার সামনে উপস্থিত দলিলসমূহ সম্পর্কে গবেষণার সময় যতটুকু স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ ধারণা নিজে লাভ করতে পারবেন তার ভিত্তিতে গবেষণা কাজটি দুর্বল কিংবা সবল হবে। গবেষক তার নিজের মনে দলিল সম্পর্কে যে পরিমাণ সন্দেহ বা দৃঢ়তা পোষণ করবেন সে অনুযায়ী দলিলের ভিত্তি গড়ে উঠবে। অর্থাৎ, গবেষক যদি দ্বিধা ও বিতর্ক সম্পর্কে আশ্বস্ত হন তাহলে কোনো নির্দেশ প্রয়োগের জন্য দলিলকে যথেষ্ট মনে করবেন। আর পূর্ণ আশ্বস্ত না হওয়ার ক্ষেত্রে ধারণা দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক।

তিন. কারণ উদ্ঘাটনের সকল পন্থায় প্রমাণিত শরিয়াহর কারণগুলো চেনার পর শরিয়াহ প্রণেতার উক্তিসমূহে যে হুকুম রদ করা যায় না তাকে অবতীর্ণ হুকুমের উপর অনুমান করা[২৭৭]।

শরিয়াহর উদ্দেশ্যসমূহ চেনার ব্যাপারে এ ধরনের আলোচনার প্রতি মুজতাহিদগণের মুখাপেক্ষিতা স্বাভাবিক। কারণ অনুমান করা নির্ভর করে কারণসমূহ সাব্যস্ত হওয়ার উপর। শরিয়াহ উদ্দেশ্যাবলি চেনার জন্য কারণসমূহ প্রমাণ করা কখনো জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। যেমন পারস্পরিক সম্বন্ধ বজায় রাখা, ঝুলন্ত বিষয় বের করে দেয়া, ধারণাকে ইতস্ততভাব থেকে মুক্ত করা এবং পার্থক্যের বিলোপ সাধন করা। এ কারণে মুজতাহিদগণ প্রজ্ঞা বা কৌশল অবলম্বনের জন্য কারণকে একটি কানুন বা

---

[২৭৬] কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শরিয়াহ, পৃষ্ঠা ১২, জামউল জাওয়ামে' আত্তারের হাশিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০০ আমাদী, আল আহকাম, ৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৫, উসূলুল খিদরী পৃষ্ঠা ৩৯৪।

[২৭৭] জামউল জাওয়ামে, আত্তারের হাশিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৫, আত তুজ্জারিয়াল কুবরা ও শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১৫। ডক্টর হামদ উবাইদ আল কাবিসীর তথ্যানুসন্ধান, উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৩৫৭ এবং তা-হা আবদুল্লাহ আদদাসুকী, উসূলুল ফিক্হ, পৃষ্ঠা ২৭৮।

www.pathagar.com

নিয়ম হিসেবে গণ্য করেছেন। ফলে শরিয়াহ হুকুমের কারণসমূহ উদ্দেশ্যাবলির আওতাভূক্ত হয়ে যায়।

চার. কোনো কাজ বা জনগণের মধ্যে সংঘটিত কোনো ঘটনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা, মুজতাহিদের কাছে প্রতীয়মান শরিয়াহ দলিলের মধ্যে এর হুকুম সম্পর্কে না জানা এবং এই হুকুমের ওপর অনুমান করার কোনো নজিরও না থাকা। শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার অভিপ্রায়ে একজন মুজতাহিদের জন্য এ ধরনের গবেষণা বা চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ এ ধরনের চর্চা করা শরিয়াহ আহকামের স্থায়িত্ব এবং মুহাম্মদ সা.-এর জামানার পর থেকে সৃষ্টির লয় পর্যন্ত সকল যুগ ও কালের জন্য তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। ইমাম মালেক র. ও তাঁর অনুসারীগণ এ ধরনের চর্চাকে মাসালিহে মুরসালাহ তথা প্রেরিত কল্যাণসমূহের দলিলরূপে গণ্য করেছেন। ইমামগণ বলেছেন : এটা হলো শরিয়াহর জরুরি অবস্থার আশ্রয়স্থল। তাঁরা এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এর প্রামাণ্যতা ও সৌন্দর্যকে। তাঁরা সবাই এর নাম দিয়েছেন মুনাসিব তথা সময়োপযোগী বা যুগোপযোগী হাতিয়ার। ইমামুল হারামাইন এ ধরনের চর্চাকে আবার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন[২৭৮]। কল্যাণ অনুচ্ছেদে এর বিশদ বিবরণ জানা যাবে। যারা রায় বা যুক্তির ওপর নির্ভর করেন এবং যারা নসের দলিল ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে এ প্রকারটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব রয়েছে।

পাঁচ. শরিয়াহর আহকামের মধ্যে এ ধরনের গবেষণার নাম তাআব্বুদী অর্থাৎ, সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত ও সমর্পিত হওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, শরিয়াহর বিধিবদ্ধ আইনের রহস্য ও তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে গবেষক ও চিন্তাবিদদের আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে হয়েছে। এ অবস্থায় বিধিবদ্ধ আইনের প্রতি গবেষক তথা মানুষের অনীহা কিংবা সংশয় অথবা দুর্বলতা দেখা দেয়া মোটেই বিচিত্র নয়। অথচ শরিয়াহ প্রণেতা আল্লাহ তায়ালা প্রবর্তিত আইন রহস্য, তাৎপর্য, তত্ত্ব ও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। কারণ তিনি আহকামুল হাকেমীন- সর্বোচ্চ হুকুমদাতা। তাঁর প্রবর্তিত আইন সত্য মহাসত্য। সত্য সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত থাকা মূর্খতা কিংবা বালখিল্যতার নামান্তর। এ অবস্থায় নিজের কালের সীমাবদ্ধতা এবং আল্লাহ তায়ালার আইনের অসীম ক্ষমতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হওয়ার কথা চিন্তা করে সে হুকুমের কাছে আত্মসমর্পন এবং নতি স্বীকার করে তাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতে হয়।

---

[২৭৮] আযহার সংকলিত আল বুরহান, ৯১৩ নম্বর, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারিয়া, পৃষ্ঠা ১২, শিবলী, তালীলুল আহ্কাম, পৃষ্ঠা ২৮৫।

www.pathagar.com

বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে যতটুকু গভীরে পৌঁছুবে সেই অনুপাতে সে আত্মসমর্পিত ও নিবেদিত হতে পারবে। আলেমগণ শরিয়াহর উদ্দেশ্যাবলী বুঝার ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন[২৭৯]।

আগের আলোচনা অনুযায়ী এটাই যখন প্রতিভাত হলো যে, শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলি চেনার জন্য মুজতাহিদের ইজতিহাদী (গবেষণা) ও ইস্তিম্বাতী (উদ্ভাবন) শক্তির আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন তখন প্রশ্ন জাগে কিভাবে উদ্দেশ্য জানা যাবে এবং তা জানার কোনো উপায় আছে কি?

শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায়

আল্লাহ তায়ালার দিকে মানুষকে ডাকা, রসুল সা.-এর বাণী প্রচার করা এবং দুনিয়াবাসীর তাঁর আনুগত্য করা সফলকাম দলের নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাবলীগ বা প্রচার হতে হবে হুবহু শব্দের এবং সঠিক অর্থ ও তাৎপর্যের আর দ্বীনেযেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক সেভাবেই। এ ব্যাপারে আলেমগণ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন :

তাদের একটি দল হলো, কুরআন ও হাদিসের হাফেজগণ, যাঁরা দ্বীনের উৎসের সংরক্ষণ করেছেন এবং পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে তাদেরকে এমনভাবে রক্ষা করেছেন যার ফলে মানুষের কাছে তা সব রকমের আবর্জনা ও কলুষমুক্ত হয়ে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নরূপে পৌঁছে গেছে।

দ্বিতীয় দলটি হলো, ফিক্হশাস্ত্রবিদগণের। তাঁরা আহকাম ও আইন-কানুন নির্ধারণ করে হালাল ও হারামের বিধান বেঁধে দেন। তার আলোকে জনগণকে ফত্ওয়া বা দিকদর্শন দিয়ে সংস্কারের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা পৃথিবীর মাটিতে আকাশের তারকা যেমন। তাঁদের মাধ্যমে অন্ধকারে পথহারা মানুষেরা পথের দিশা পায়। মানুষ পানাহারের চাইতেও তাদের বেশি মুখাপেক্ষী। তারাই হচ্ছেন মুজতাহিদ। রসুল সা.-এর সা. ইন্তিকালের পর আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের আহকাম প্রচারের গুরুদায়িত্ব তাঁরাই সার্থকভাবে পালন করেন। তাঁরা অত্যন্ত আস্থা ও সতর্কতার সাথে তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেন। অন্যথায় দ্বীনের তাবলীগের কাজ যথাযথ মর্যাদায় বিরাজমান থাকা সম্ভবপর হতো না[২৮০]।

---

[২৭৯] আল ই'তিসাম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০১ ও ২৫১, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, পৃষ্ঠা ১৩, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২।

[২৮০] ইলামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬-৯।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন : জ্ঞান লাভ না করে কোনো বস্তুর হালাল বা হারাম হওয়ার কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। আর এ জ্ঞান অর্জন করতে হবে কুরআন ও হাদিস অথবা ইজ্‌মা ও কিয়াস থেকে[২৮১]।

তাছাড়া একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা নির্ভর করে শাব্দিক ও অর্থগত দিক দিয়ে আরবি ভাষা জানা, নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসুখের (রহিত) পরিচয় লাভ করা এবং ফরয, আদব-কায়দা, নির্দেশ ও অনুমোদন সম্পর্কে জানার ওপর। অর্থাৎ যে নির্দেশটি মূলত ওয়াজিব এবং যে পদ্ধতিগত কারণে ওয়াজিব আবার যে নির্দেশটি দলিলের ভিত্তিতে ওয়াজিব নয়- সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

আরো জানতে হবে অবকাঠামো সম্পর্কে। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মর্তের মাটিতে নবি-রসুল পাঠিয়েছেন এবং মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত যে আহকাম অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোর অবকাঠামোগত রহস্য কী? যাবতীয় ফরয কাজ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য কি সমগ্র মানবজাতি অথবা কোনো মানুষ? মানুষের জন্য যেসব আনুগত্য ফরয করা হয়েছে এবং তাঁর নির্দেশের যেখানে সমাপ্তি ঘটেছে ইত্যাদি বিষয়ের অবকাঠামোগত দিকের পরিচয় লাভ করা কি এর উদ্দেশ্য? পাপাচার থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে, অলসতা ও জড়তা দূরীকরণে এবং আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা যেসব উপমা ও রূপক বর্ণনা করেছেন সেগুলো সম্পর্কে জানা এবং কল্যাণকর নফল কাজ অধিক পরিমাণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আর কিয়াস (অনুমান) হলো, কুরআন বা হাদিসের প্রথম সংবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল দলিল অন্বেষণ করা ফরয। এই সামঞ্জস্য দুভাবে হতে পারে :

এক. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা. কোনো জিনিস হারাম করেছেন কিংবা কোনো অর্থে সেটিকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। এখন আমরা যদি অনুরূপ অর্থবোধক এমন কোনো জিনিস পেয়ে যাই যার ওপর কুরআন বা হাদিসের হুবহু দলিল প্রযুক্ত নয়, তাহলে কুরআন বা হাদিসের পূর্ববর্তী নির্দেশের উপর কিয়াস করে আমরা সে জিনিসটিকে হারাম বা হালাল বলতে পারি।

দুই. এমন জিনিস পাওয়া যা আগের পাওয়া জিনিস থেকে ভিন্নতর এবং আগের পাওয়া দুটি জিনিসের কোনো একটির কাছাকাছি অনুরূপ জিনিসও পাওয়া না

[২৮১] আর রিসালাহ, পৃষ্ঠা ৩৯, আহমদ মুহাম্মদ শাকেরের তথ্যানুসন্ধান।

www.pathagar.com

গেলে এই জিনিসের সাথে অনুরূপ জিনিস সম্পৃক্ত করতে হবে। যেমন শিকারীর প্রতিদান[২৮২]।

কাজেই কিয়াসের বাস্তবতা প্রচলনের জন্য কুরআন বা হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যশীল খবর (দলিল) অন্বেষণ করা মুজতাহিদের উদ্দেশ্য। কারণ কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান চিরন্তন এবং মহাসত্য বলে সমাদৃত ও গণ্য। এ চিরন্তন জ্ঞান রসুল সা. তাঁর প্রভুর নিকট থেকে এনেছেন।

দালালাতুন নুসুস (দলিল ভিত্তিক সুস্পষ্ট নির্দেশ) দুই প্রকার

মৌলিক ও আপেক্ষিক। বক্তার (মুতাকাল্লিম) উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার অধীন হয়ে থাকে মৌলিক নস্। মৌলিক নসের ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। অন্যদিকে আপেক্ষিক নস্ শ্রবণকারীর বুদ্ধিশক্তি, বোধশক্তি, চিন্তা-গবেষণার তীক্ষ্ণতা ও মেধাশক্তির প্রখরতা এবং শব্দাবলী ও শব্দবিন্যাসের পরিচয় ইত্যাকার বিষয়ের অধীন। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সকল শ্রবণকারীর মধ্যে সমভাবে পরিদৃষ্ট না হওয়ার কারণে এ ধরনের দলিল উপস্থাপনে শ্রবণকারীদের গুণাবলির পার্থক্য অনুপাতে মতভেদ হয়ে থাকে।

এ ধরনের প্রকারভেদ কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন করার ব্যাপারে সাহাবাগণের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার রহস্য আমাদের সামনে তুলে ধরে। সাহাবাদের অনেকে হাদিস বেশি সংরক্ষণ এবং বেশি পরিমাণে রেওয়ায়েত করেছেন। অথচ তাঁদের মতো যারা বেশি বেশি হাদিস সংরক্ষণ ও রেওয়ায়েত করেননি তাঁরা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি হাদিসের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তত্ত্বজ্ঞান বুঝেছেন[২৮৩]।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করছি। সেটা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শ্রবণকারী বক্তার উদ্দেশ্য পরোক্ষ শ্রবণকারীর তুলনায় বেশি সচেতনভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। আবার কখনো প্রত্যক্ষ শ্রবণকারীর চেয়ে পরোক্ষ শ্রবণকারী বেশি সচেতন হয়ে থাকে। তবে এরূপ ঘটনা বিরল এবং কদাচিৎ ঘটে থাকে। এ কারণে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য সাহাবাগণই বেশি জানতেন ও বুঝতেন। পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

---

[২৮২] আর রিসালাহ, আহমদ মুহাম্মদ শাকেরের তথ্যানুসন্ধান, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০।

[২৮৩] ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৫, আহমদ আবদুর রহীম দেহলবী শাফেয়ী (মৃত্যু ১১৮০ হিজরি), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃষ্ঠা ১৩৯।

www.pathagar.com

বক্তা তার মনের বাসনা কখনো কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। কখনো এই অব্যক্ত বাসনা তার অভ্যাস ও আচরণের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। আবার কখনো তার প্রকাশ বক্তার পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। যদি কেউ বলে, আমি বাগদাদ যাচ্ছি, তাহলে তার কথায় বুঝতে হবে যে, সে বাগদাদ যাচ্ছে। তবে যাওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অজ্ঞাত। আর যদি সে বলে, আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাচ্ছি, তাহলে তার কথার উদ্দেশ্য জানা গেলো। এ উদ্দেশ্য আবার লোকটির অভ্যাস ও আচরণের মাধ্যমেও জানা যায়। যেমন লোকটি কেবল বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই বাগদাদ ভ্রমণ করে থাকে। আবার লোকটির কথাবার্তা, পরিবেশ পরিস্থিতি এবং কর্মতৎপরতার ধরনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, লোকটি বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যই বাগদাদ যাচ্ছে।

শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলীর সাথে পরিচয়ের পন্থাগুলোর উপরিউক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, আমাদের কথা শুধুমাত্র তিনটি পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল।

এক : সুস্পষ্ট দলিল।

দুই : বিধিসম্মত অভ্যাস ও আচার অনুষ্ঠান।

তিন : শরিয়াহ বুঝার ব্যাপারে সাহাবাদের দিকদর্শন।

প্রথম পদ্ধতি : কারণভিত্তিক সুস্পষ্ট দলিল

একথা সবাই জানেন যে, শরিয়াহ প্রণেতার হুকুম কাজের দাবী অনুযায়ীই হয়ে থাকে। হুকুমের মর্মানুযায়ী কাজের বাস্তবায়ন শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে কাজের দাবী ঋণাত্মক বা বিরত থাকা হলে সেটা হবে নিষেধাজ্ঞা। সে অবস্থায় কাজের বাস্তবায়ন না হওয়াই শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য এবং কাজের বাস্তবায়ন হবে উদ্দেশ্য বিরোধী। যেমন আদিষ্ট বা নির্দেশিত জিনিসের অনুকরণ না করা উদ্দেশ্য বিরোধী। যারা কার্যকারণের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধুমাত্র আমর বা নাহী-এর ওপর নির্ভর করে এবং যারা কার্যকারণ ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে তাদের কাছে উপরিউক্ত কথাগুলো পরিস্কার। যখন শুধুমাত্র আমর ও নাহী শরিয়াহ প্রণেতার ইচ্ছা প্রমাণ করে তখন কার্যকারণসহ এ দু'টির ইঙ্গিত ও লক্ষণসমূহ যে তাঁর ইচ্ছা প্রমাণ করবে একথা সহজেই অনুমান করা যায়[২৮৪]।

---

[২৮৪] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯০।

www.pathagar.com

একথা সুস্পষ্ট যে, আহকাম সম্বলিত আয়াত ও হাদিসমূহের অধিকাংশই কার্যকারণের সাথে সম্পৃক্ত। এ ধরনের কতিপয় আয়াত ও হাদিসের বিবরণ নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ

আর তোমরা যতদূর সম্ভব বেশি শক্তিমত্তা ও সদাসজ্জিত বাঁধা ঘোড়া নিয়ে তাদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হও, যাতে আল্লাহ তায়ালার দুশমন ও তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারো[২৮৫]।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে যুদ্ধংদেহী কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে অভিষ্ট লক্ষ্য হলো, জিহাদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের সহায়তা করা, তাঁর কালেমা বুলন্দ করা এবং মুসলমানদের দেশ-ভূখণ্ড, জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করা।

২. আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

হে নবি! মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটিই তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি[২৮৬]।

তিনি আরো বলেন :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

আর যখন নবির স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাইতে হয় তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য উত্তম পন্থা[২৮৭]।

---

[২৮৫] সুরা আল আনফাল, ৬ আয়াত।

[২৮৬] সুরা আন নূর, ২০ আয়াত।

[২৮৭] সুরা আল আহযাব, ৫৩ আয়াত।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন :

وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ

আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা[২৮৮]।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

আর তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে[২৮৯]।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন :

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

তারা যেন বাক্যালাপে কোমলতা প্রকাশ না করে, যাতে দুষ্ট মনের কোনো লোক লালসা করতে পারে[২৯০]।

উপরের আয়াতগুলোতে ইমানদার নর-নারীর অন্তর কলুষমুক্ত করার জন্য সবচেয়ে বেশি পবিত্র উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্যমূলক কাজের প্রতি। আর এরূপ পবিত্রতম উপায়ইবা হবে না কেন? কারণ আয়াতে উল্লেখিত উপকরণগুলো অশ্লীলতা, ফিতনা-ফাসাদ, হিংসা-দ্বেষ, সম্পর্কচ্ছেদের তৎপরতা ইত্যাকার যাবতীয় অসৎকর্মের পথ রোধ করে। আল্লাহ্ তায়ালা উপরিউক্ত উপায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এ ধরনের বিপর্যয় দমনের ব্যবস্থা করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষের বংশধারা, ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও প্রাণের হেফাজত করা।

৩. আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

---

[২৮৮] সুরা আন নূর, ২৮ আয়াত।

[২৮৯] সুরা আন নূর, ৩১ আয়াত।

[২৯০] সুরা আল আহযাব, ৩২ আয়াত।

www.pathagar.com

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর নাপাক শয়তানের কাজ। তোমরা এগুলো পরিহার করো। তাতে তোমরা সাফল্য লাভের আশা করতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদের আল্লাহ তায়ালার স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না[২৯১]?

মদপান থেকে বিরত রাখার কারণ বিবিধ। বৈষয়িক ও নৈতিকতার দিক দিয়ে মদপানের পরিণাম এতটা ভয়াবহ যে, বিবেকবান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই তা বুঝতে সক্ষম। কারণ সুরা বাকারার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন : মদপানের উপকারিতার চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশি।

৪. আল্লাহ তায়ালা বলেন :

مَّا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ

আল্লাহ তায়ালা এই জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ তায়ালার, তাঁর রসুল সা.-এর স্বজনগণের এবং ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে[২৯২]।

আয়াতে উল্লেখিত খাতে ধন-সম্পদ বণ্টন করে দেয়ার কারণ হলো : এর ফলে ধন-ঐশ্বর্য অভাবগ্রস্ত ফকির মিসকিনদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হবে না। কারণ ধনবানদের মধ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূত ও কেন্দ্রীভূত হওয়া অভাবগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিকর, এমনকি ধনীদের জন্যও।

---

[২৯১] সুরা আল মায়েদাহ, ৯০-৯১ আয়াত।

[২৯২] সুরা আল হাশ্‌র, ৭ আয়াত।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত আয়াতগুলো ছাড়াও আরো আয়াত রয়েছে যেগুলোর আহকামের কারণ সুস্পষ্টভাবে কিংবা ইশারা ইংঙ্গিতে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কার্যকারণ সম্বলিত হাদিসও রয়েছে। যেমন :

১. যেসব ইমাম সালাতে দীর্ঘ সুরা পাঠ করেন তাদের জন্য হুকুম স্বরূপ রসুল সা.-এর বাণী:

> يايها الناس انكم منضرون إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف و السقيم و ذي الحاجة
>
> ওহে লোকেরা! তোমরা বিচ্ছিন্নকারী। তোমাদের কেউ সালাতের ইমামতি করলে কিরাআত হালকা বা নাতিদীর্ঘ হওয়া উচিত। কারণ জামায়াতে রোগী, দুর্বল এবং তারাও আছে যাদের বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন[২৯৩]।

এ হাদিসটি বাস্তবতা উপলব্ধির কারণসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছে[২৯৪]। হাদিসটিতে এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দ্বীনের ভিত্তি হলো সহজতার ওপর। সৎকাজ যখন কল্যাণ বিনষ্টকারী হয় অথবা মানুষের হক নষ্ট করে তখন তা শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যায়। কারণ এ ধরনের কাজ ত্রুটি, অলসতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।

২. রসুল সা. বলেন :

> يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا
>
> হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম তার বিয়ে করা উচিত। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে আনত করে এবং গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে। আর যে সক্ষম নয় তার রোযা রাখা উচিত। কারণ রোযা তার জন্য হাতিয়ার[২৯৫]।

উপরিউক্ত হাদিসে বিবাহিত জীবন যাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিয়ে করার নির্দেশ রয়েছে। মানুষের জন্য কল্যাণকর জীবন পদ্ধতির ব্যাখ্যাও

---

[২৯৩] উমদাতুল কারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০১, শওকানী, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৪।

[২৯৪] আল ইলালুল বায়েছা আলাল আমরি বিত্ তাখ্ফীফ, যেমন আদ্ দা'ফ ওয়াস মাকাম ওয়াল কিবার ওয়াল হাজাহ ওয়া ইশ্তিগালু খাতেরু আমিস সাবিয়্যু বিবুকায়িহি ইত্যাদি।

[২৯৫] ইমাম মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

হাদিসে দেয়া হয়েছে। এখানে কল্যাণের যে উপকরণগুলোর কথা বলা হয়েছে তাহলো : দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করা। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আয়াতে এ দুটির হেফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুটির হেফাজতের মধ্যে অনেক কল্যাণ ও সফলতা নিহিত আছে। বেশির ভাগ পাপ কাজ এ দুটি থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। বৈবাহিক জীবন যাপনের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম ব্যক্তির জন্য যে চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা দেয়া হয়েছে তা একটু ভিন্ন রকমের এবং তা হচ্ছে সওম বা রোযা রাখা। কারণ রোযা বিবাহে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তার যৌন ক্ষুধাকে প্রশমিত করতে সহায়তা করবে।

৩. মুগীরা ইবনে শু'বা বিয়ে করার ইচ্ছা করলে নবি সা. তাঁকে বললেন :

أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.

> তোমার হবু স্ত্রীকে দেখে নাও। কারণ তোমার এ দেখা তোমাদের দুই জনের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টিতে অধিকতর সহায়ক হবে[২৯৬]।

হাদিসের শব্দ আহ্‌রা অর্থ হচ্ছে অধিকতর যোগ্য, সবচেয়ে ভালো, যথোপযোগী ইত্যাদি। আর يؤدم শব্দের অর্থ আকর্ষণ, আন্তরিকতা ইত্যাদি। হাদিসটিতে পাত্রীকে পাত্রের নিজের দেখার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, পাত্রীকে দেখতে গিয়ে উভয়ের দেখার কাজ হয়ে যায় এবং এর ফলে শুভ কার্য সম্পন্ন হলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা চিরন্তন ও সুখের হয়। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার এটাই শরিয়াহ প্রণেতার মৌল উদ্দেশ্য।

৪. স্ত্রীর খালা বা ফুফুকে বিয়ে না করার কারণ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। খালা বা ফুফূ শ্বাশুড়িকে বিয়ে করা খুবই ক্ষতিকর। কারণ তাতে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। হাদিসে বলা হয়েছে: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم অর্থাৎ, যদি তোমরা এটা করো তাহলে তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। ইবনে আদি থেকে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে এরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, যখন লোকটি স্ত্রী ও তার খালা বা ফুফুর সাথে সংগম করবে তখন তারা দু'জনে পরস্পরের সতীন হয়ে যাবে। ফলে তাদের আত্মীয়তা তথা ফুফু-ভাতিজীর যে বন্ধন ছিল তা আর অক্ষুন্ন থাকবে না। ইবনে হিব্বান থেকে অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে : স্ত্রীর ফুফু বা খালাকে বিয়ে করা নিষেধ। তিনি বলেছেন : إنكن إذا فعلتن

[২৯৬] বুখারি, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ এবং শাওকানী, নাইলুল আওতার।

www.pathagar.com

قطعتن أرحامكن অর্থাৎ, তোমরা যখন এরূপ করবে তখন তোমাদের আত্মীয়তা বা রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে[২৯৭]।

জাতীয় ঐক্য ও পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করাই শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য। অনৈক্য ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী। কাজেই স্ত্রীর বর্তমানে তার খালা বা ফুফুকে বিয়ে করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসগুলো শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এবার আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যেতে চাই।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : শরিয়াহ প্রণেতার রীতি ও হস্তক্ষেপ অনুসন্ধান করা

এটি হলো জানার জন্য অনুসন্ধান করা। ইয্ ইবনে আবদুস সালাম বলেন : যে ব্যক্তি কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দুর করার জন্য শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলী অনুসন্ধান করে সে সমগ্র ব্যবস্থা থেকে একটা বিশ্বাস বা পরিচিতি লাভ করে। এ ধরনের কল্যাণকে গুরুত্বহীন মনে করা ঠিক নয় এবং একেবারে বিসর্জন দেয়াও জায়েয নয়। এ ব্যাপারে নস্, কিয়াস ও ইজ্মা নেই তবুও শরিয়াহর অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও বোধ একে ওয়াজিব করে তোলে[২৯৮]।

শরিয়াহর অন্তর্নিহিত জ্ঞান শরিয়াহ প্রণেতার অভীষ্ট কল্যাণ-অকল্যাণ চেনার ব্যাপারে সুতীক্ষ্ণ দক্ষতার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে এ দক্ষতা শরিয়াহ প্রণেতার হস্তক্ষেপের অনুসন্ধান ছাড়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ভিত্তিক অনুসন্ধান শরিয়াহ প্রণেতার সঠিক ও ব্যাপক উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। অনুসন্ধান কাজটি দু'প্রকার :

প্রথম প্রকার : আহকাম জানার জন্য অনুসন্ধান। আহকাম সম্পর্কিত আমাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে আহকামের কারণসমূহ জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় অনুসন্ধানের কাজ কার্যকারণ নিরূপণের পদ্ধতিতে প্রমাণিত কারণ অনুসন্ধানের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। কারণ কার্যকারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য সহজে জানা যায়। কেননা যখন আমরা সমপর্যায়ের অনেকগুলো কারণ সম্বন্ধে সম্মিলিত কৌশলের একটি নিয়ম হওয়ার কারণে অনুসন্ধান করি তখন একটিমাত্র কৌশলের জন্য সেগুলোকে নির্দিষ্ট করা আমাদের জন্য সম্ভব হয়। ফলে আমাদের

---

[২৯৭] নাইলুল আওতার, ৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৬।

[২৯৮] কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৯, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫।

www.pathagar.com

নিরূপিত কৌশলটিই বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য বলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। যেমন তর্কশাস্ত্রের নীতি অনুসারে শাখা-প্রশাখার অনুসন্ধানে একটি ব্যাপক অর্থ অর্জিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :

১. ইশারা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা মাযাবিনা (অজানা কেনা-বেচা) জাতীয় বেচা-কেনা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ জানতে পারি। এ সম্পর্কিত হাদিসটি হলো : এক ব্যক্তি শুকনা খেজুরের বিনিময়ে পাকা খেজুর বিক্রি করা যায় কিনা জিজ্ঞেস করলে নবি সা. বলেন :

اينقص الرطب اذا جف؟ قال السائل نعم قال: فلا اذن.

> খেজুর শুকিয়ে গেলে কি কমে যায়? প্রশ্নকারী বললেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে এরূপ করার অনুমতি নেই।

হাদিসটিতে ইঙ্গিতে মাযাবিনা হারাম হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। কারণটি হলোঃ অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত বস্তুর বিনিময়ে অথবা এক জাতীয় অজ্ঞাত বস্তু অজ্ঞাত বস্তুর বিনিময়ে লেনদেন হওয়া। কারণ এক্ষেত্রে দেখা যায়, বিনিময়কৃত দুটি বস্তুর একটির পরিমাণ অজানা। অর্থাৎ কাঁচা খেজুর শুকানোর পর কমে যায়। কমে যাওয়ার পরিমাণ অজানা থাকায় বেচাকেনা কার্যক্রম হারাম হয়ে যায়[২৯৯]।

অনুমানের ভিত্তিতে বেচাকেনা করা (جزاف) নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ আমরা গবেষণা ও উদ্ভাবন পদ্ধতির মাধ্যমে জানতে পারলাম। এটা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, বিনিময়কৃত বস্তুর একটির পরিমাণ অজ্ঞাত থাকা। আর শরিয়াহ প্রণেতার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব প্রতারণা থেকে রক্ষা করা[৩০০]। এমনিভাবে রসুল সা. নিষেধ করেছেন- প্রসব না করা পর্যন্ত পশুর পেটে যা আছে তার বেচাকেনা করা, পরিমাপ ছাড়া স্তনের দুধ বিক্রি করা, পলাতক দাস-দাসীর কেনা-বেচা করা, বণ্টনের আগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিক্রি করা, গ্রহণের আগে সাদকায় পাওয়া মাল বিক্রি করা, মনিমুক্তা আহরণ করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ডুব দেয়ার শ্রম বিক্রি করা[৩০১]। এ জাতীয় বেচাকেনায় অজ্ঞতা ও প্রতারণা থাকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে একপক্ষ তা মেনে নিতে

---

[২৯৯] ইবনে মাজাহ ও আসহাবুস সুনান।

[৩০০] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫০, দারদীরী, আশ্ শারহুল কবীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬০, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, পৃষ্ঠা ১৫-১৬ ।

[৩০১] আহমদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী, শিরাউল মাগানিম, পৃষ্ঠা ১২, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৮।

www.pathagar.com

সক্ষম হয় না। মণিমুক্তা আহরণ করার উদ্দেশ্যে সাগরে ডুব দেয়ার বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ডুবুরী এভাবে চুক্তি করেঃ আমি সাগরে এতগুলো ডুব দেবো, তাতে যা পাওয়া যাবে সব তোমার এবং এই সম্পদের বদলে আমাকে এত টাকা দিতে হবে। এর মধ্যে প্রতারণা ও অজ্ঞতা থাকার কারণে এ ধরনের বেচাকেনা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে[৩০২]।

উপরিউক্ত জিনিসগুলো ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণসমূহ জানার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, শরিয়াহ প্রণেতার এখানে যে একটিমাত্র লক্ষ্য তা হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ যেন প্রতারণার শিকার না হয়। কাজেই যেসব পণ্য বা বিনিময় দ্রব্য অথবা সময় নির্ধারণে প্রতারণা, বিপদ ও অজ্ঞতা থাকবে সেগুলোর বিনিময় বাতিল গণ্য হবে[৩০৩]।

অবশ্য আলেমগণ কতিপয় প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন এ কারণে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলোর দলিল পরস্পর বিরোধী অথবা প্রতারণার নিয়ম থেকে তা ভিন্ন ধরনের কিংবা পণ্যদ্রব্যটি আসলে প্রতারণামূলক হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে[৩০৪]।

প্রতারণা হলো, শরিয়াহ প্রণেতার নির্ধারিত সীমা সহজে লংঘন করা। এ কষ্টদায়ক বিষয়টি থেকে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার রহমত স্বরূপ। কাজেই মাযাবানাহ তথা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া নিঃসন্দেহে একটি কল্যাণমুখী কৌশল। এ থেকে আমরা এক কথায় জানতে পারি যে, ক্রেতা-বিক্রেতাকে যথা সম্ভব প্রতারণা থেকে রক্ষা করাই শরিয়াহ প্রণেতার মূল লক্ষ্য। আর এর সুদূর প্রসারী ও সর্বসম্মত উদ্দেশ্য হলো ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা।

২. আমরা জানি একজন মুসলমান ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অপর ভাইয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করা নিষিদ্ধ। কারণ রসূল সা. বলেছেন :

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

---

[৩০২] নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৯।

[৩০৩] নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৯।

[৩০৪] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড ২, ১৫১ পৃষ্ঠা, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, ১৬৯ পৃষ্ঠা, কারাফী, আল ফুরুক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২।

www.pathagar.com

> একজন মুমিন অন্য মুমিনের ভাই। কাজেই একজন মুমিন তার অন্য মুমিন ভাইয়ের ক্রয়ের ওপর প্রতিযোগিতামূলক দরদাম করবে না যতক্ষণ না সে পণ্য দ্রব্যটি পরিহার করে এবং অপর ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাব দেবে না যতক্ষণ না সে তার প্রস্তাব তুলে নেয়[৩০৫]।

এক্ষেত্রে নিষেধ করার কারণ হলো, এ ধরনের প্রতিযোগিতা করার কারণে প্রতিহিংসা, বিচ্ছিন্নতা, অসহযোগিতা, অবজ্ঞা ইত্যাকার অসৎ গুণাবলি প্রসার লাভ করে। ফলে মুমিন ভাইদের মধ্যে যে চিরন্তন ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বিদ্যমান থাকার কথা তা ব্যাহত হতে বাধ্য হয়। মানুষের কল্যাণকর ও সুখময় জীবন যাপনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করাই এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার মৌল উদ্দেশ্য। এক ভাই পণ্য দ্রব্য কেনার আশায় বিক্রেতার সাথে আলাপ করছে কিংবা এক ভাই কোনো মেয়েকে বিয়ে করার অভিপ্রায়ে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। প্রথম ব্যক্তির সাথে বিক্রেতার বা মেয়েটির একটি ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কারোর এ ব্যাপারে দর কষাকষি করা কিংবা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির মহিলার পাণিপ্রার্থী হওয়ার কথা বলা হারাম। কারণ এ ধরনের প্রতিযোগিতার ফলে মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্কে ফাটল ধরতে বাধ্য। এ ধরনের প্রতিযোগিতা গীবত, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাকার সব ধরনের অসৎ কাজের মতই অনিষ্টকর। এ অনিষ্ট ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে কিংবা পারস্পরিক সহযোগিতা ও কার্যক্রমেও হতে পারে। খালা শ্বাশুড়ি ও ফুফু শ্বাশুড়িকে বিয়ে করাও এ পর্যায়ের অন্যায়ের মধ্যে গণ্য। কারণ তার ফলে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট থাকে না[৩০৬]।

এ ধরনের প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ করে শরিয়াহ প্রণেতার মানব জীবন সংরক্ষণ করার সাধারণ ইচ্ছাকেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে। কারণ প্রতিহিংসা ও ক্রোধ অনেক সময় মানুষকে হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য ক্ষতিকর কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে হিংসা ও ক্রোধ সৃষ্টি হতে পারে সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করে তার মর্মমূলে আঘাত হানা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার : জানার জন্য অনুসন্ধান। একক উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত আহকামের দলিল অনুসন্ধান করা। উদাহরণের সাহায্যে আমরা এগুলো সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।

---

[৩০৫] আহমদ ও মুসলিম, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২১।

[৩০৬] মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, পৃষ্ঠা ১৫-১৭ ।

www.pathagar.com

১. ক্রীতদাস ও তাদের মুক্তি সংক্রান্ত অবতীর্ণ আহ্কামের দলিলগুলো নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করি তখন এগুলোকে একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যাভিসারী দেখি। এটি কিতাবাত, তাদবীর, উম্মেওয়ালাদ (সন্তান দানকারী ক্রীতদাসী), কোনো সংখ্যা বা শর্তের চুক্তি ছাড়া মুক্ত করার অনুমোদন, স্বাধীন পুরুষের ক্রীতদাসীকে বিয়ে করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা যদি স্বাধীন পুরুষদের যথেষ্ট সামর্থ থাকে ইত্যাকার বিষয়ের আহ্কামের অনুরূপ।

কোনো কোনো কাফ্ফারায় দাস-দাসী মুক্ত করাকে ওয়াজিব করা, এমন নিকটবর্তী দাস-দাসী মুক্ত করাকে যাকাতের ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত করা যারা শুধুমাত্র যাকাতদাতার মালিকানায় প্রবেশ করেছে এবং অংশীদারীত্বের ক্ষেত্রে অর্ধেক মূল্য আদায় করার পর পূর্ণ মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে অবশিষ্টাংশের মূল্য আদায় করার জন্য অংশীদারকে তাগিদ দেয়া এবং ক্রীতদাসের সম্মতির তদারকী ছাড়া মুক্তির আদেশ জারী করা ইত্যাদি আহ্কাম দাসদাসীদের মুক্ত করার ব্যাপারকে উৎসাহিত করা তথা আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায় উপকরণ বৈকি।

দাসদাসীদের মুক্ত করা সম্বলিত অধিকাংশ দলিল এবং এ বিষয়ের উপর শরিয়াহর অন্যান্য কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো গোটা মানব সমাজ মুক্ত ও অবাধ জীবন-যাপন করবে। শরিয়াহ্ প্রণেতার এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণের বিরাট অংশ স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা স্বাধীনতাকে দাসত্ব ও অধীনতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ মানুষ মূলগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। দাসত্ব ও অধীনতা সাময়িক বা অনন্যোপায় অবস্থার একটি ব্যবস্থামাত্র[৩০৭]।

২. খাদ্য জাতীয় দ্রব্যের মজুতদারী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসুল সা. বলেন :

من احتكر طعاما فهو خاطئ.

যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য মজুতদারী করবে সে অপরাধী গণ্য হবে[৩০৮]।

বাজারে খাদ্য জাতীয় দ্রব্যের অভাব সৃষ্টি করে জনগণের ক্ষতিসাধন করার পথ রোধ করার উদ্দেশ্যেই মজুতদারী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এগিয়ে গিয়ে বিক্রেতাকে প্রলুব্ধ করা এবং বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত করার আগেই বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এর ফলে বাজারে খাদ্য দ্রব্যের অবাধ চলাচলের ওপর প্রভাব বিস্তার করা হয়। কোনো কোনো ফকীহের মতে বাকীতে খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য

[৩০৭] তাফসীর আল ফাখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৮।

[৩০৮] বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে নাইলুল আওতারে বর্ণিত।

www.pathagar.com

বিক্রি করা এজন্য নিষিদ্ধ যে, তাতে খাদ্য একজনের জিম্মায় চলে যায় এবং বাজারে তার চলাচল (circulation) বন্ধ হয়ে যায়। অনুরূপ কারণে গ্রামবাসীর মধ্যস্বত্বভোগী দালালের হাতে পণ্য বেচা-কেনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে[৩০৯]।

এ ধরনের অনুসন্ধানের জন্য উপরিউক্ত দলিলগুলো পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারলাম, খাদ্য জাতীয় দ্রব্যের চলমানতা এবং এগুলোর সহজলভ্যতা শরিয়াহ প্রণেতার অভীষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আমরা বলবো : বাজারে প্রচলিত রীতি পণ্য বিনিময়ের একটি পদ্ধতি, দ্রব্যের ঘাটতি হওয়াও একটি পদ্ধতি। কারণ বিনিময় ছাড়া মানুষ বেচাকেনা পরিত্যাগ করে না। ফলে খাদ্য দ্রব্যের চলমানতা রহিত হওয়ার ভয় থাকে না। কাজেই তারা অংশীদারীত্ব, অভিভাবকত্ব এবং খাদ্য পণ্য হস্তগত করার আগে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয মনে করতেন[৩১০]।

ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত উপরিউক্ত দলিলের সমন্বয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা শরিয়াহ প্রণেতার পাঁচটি শরিয়াহ উদ্দেশ্যের সার্বিক লক্ষ্যে পৌছুতে সক্ষম যেগুলো শরিয়াহ প্রণেতার সমগ্র বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলীকে কেন্দ্রীভূত করে থাকে। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোকপাত করবো।

এ বিষয়ে উপরিউক্ত উদাহরণ দিয়ে ক্ষান্ত হলাম। এবার তৃতীয় ও শেষ পদ্ধতি অর্থাৎ, শরিয়াহ প্রণেতার বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্যসমূহের সাথে পরিচয় লাভের ব্যাপারে সাহাবাগণের হিদায়াত সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।

তৃতীয় পদ্ধতি : শরিয়াহ বুঝার ব্যাপারে সাহাবাদের দিকদর্শন

কুরআন ও হাদিসের আহকাম বুঝা এবং সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাহাবাগণের অনুসরণ করা আর তাঁদের হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ করা হলো শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলীর সাথে পরিচয় লাভের তৃতীয় সোপান। কারণ তাঁরা ছিলেন বিশ্বাসে দৃঢ়, ভাষায় সমৃদ্ধ, বর্ণনায় পরিপক্ক, কুরআন অবতীর্ণকালের সমসাময়িক এবং কুরআনের বিবরণ কার জন্য প্রযোজ্য রসুল সা.-এর বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

তাঁরা ছিলেন অনন্য স্মৃতিশক্তি ও প্রখর মেধার অধিকারী। মননশীলতা, পবিত্রতা, আন্তরিকতা, পরিশীলিত মানসিকতা ছিল তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শরিয়াহ তথা

---

[৩০৯] নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৫, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৫৫, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, পৃষ্ঠা ১৬।

[৩১০] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৯, আল মাওয়াফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১৩, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

www.pathagar.com

ইসলামের জন্য তারা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। রসুল সা.-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন উপমার অধিকারী। তাঁরা ছিলেন জাতির কর্ণধার, মুজতাহিদদের সিপাহসালার, বিজ্ঞজনদের পথিকৃত এবং সৃষ্টির সেরা। ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন অতুলনীয়। কাজেই তাঁদের কর্মতৎপরতা ছিল সর্বজন গৃহীত ও নন্দিত।

ইবনে কাইয়িম তাঁর ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন গ্রন্থে বলেন : নবির সা. কথা ও কাজ বুঝার ও আনুগত্যের ব্যাপারে সাহাবাগণ ছিলেন উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যোগ্যতার অধিকারী। তাঁরা রসুল সা.-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বেষ্টনীর সবচেয়ে কাছে অবস্থান করেছেন। রসুল সা.-এর উদ্দেশ্য তাঁরা সরাসরি বুঝতে পারতেন। উদ্দেশ্য বুঝার জন্য তাদের কারোর কিছু প্রকাশ করার দরকার হতো না। কখনো শব্দের সাধারণ প্রয়োগ আবার কখনো কার্যকারণ সাধারণ হওয়ার মাধ্যমে বক্তার উদ্দেশ্য জানা যায়। তবে শব্দের দৃষ্টিকোণ্ থেকে প্রথম ধরনের এবং অর্থ, তৎপর্য ও কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় ধরনের পদ্ধতিকে অধিকতর সুস্পষ্ট মনে করা হয়[৩১১]।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে বলা হয়েছে

আহকামভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহের পরিচয় লাভ করা একটি সূক্ষ্ম কাজ। তীক্ষ্ণ মেধা ও দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া এগুলোর রহস্য উদঘাটন সম্ভব নয়। সাহাবিগণের মধ্যে যারা ফকীহ ছিলেন তাঁরা সৎকাজ এবং আরব দেশীয় মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারাদের মতো জাতীয় ঐকমত্য ভিত্তিক বদ কাজের হেতুগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম বস্তুর সাথে পরিচয় লাভের প্রয়োজনীয়তা তাদের জন্য দেখা দেয়নি।

অবশ্য শরিয়াহর বিধি-বিধান ও দ্বীনের হুকুম-আহকাম বিধি-নিষেধের প্রত্যক্ষদর্শীগণ সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন- চিকিৎসা বিশারদগণের ঔষধ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যের পরিচিতি সর্বোচ্চ ধরনের পরিচয় বলে গণ্য হয়ে থাকে[৩১২]।

যে ব্যক্তি কোনো নীতিবান লোকের কথার প্রতি অতি উৎসাহী ও আগ্রহী সে তার নীতি ও আচরণের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং তিনি অমুক বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন বা কথা বলেছেন বলে বর্ণনা করতে পারে। আর যদি তার কথায় স্পষ্টভাবে কিছু না জানা যায়, তাহলে সে বলবে না যে, তিনি অমুক

[৩১১] ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৬ ।

[৩১২] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬।

www.pathagar.com

ফতোয়া দিয়েছেন বা কথা বলেছেন। ইমামগণসহ তাদের সমস্ত অনুসারীদের অবস্থা যখন এই পর্যায়ের তখন তারা কেমন করে জাতির হিদায়াতের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবেন এবং নবি সা.-এর বাণীর বাহক হবেন? কাজেই যিনি নেতৃত্ব দেবেন তাঁকে নীতি নির্ধারকের কথা ও আদিষ্ট বস্তু উপলব্ধির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের অধিকারী হতে হবে।

শরিয়াহ অবতীর্ণ হওয়ার সূচনালগ্ন থেকে তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত সাহাবাগণ ছিলেন শরিয়াহর জন্য নিবেদিত এবং তার সাহায্যকারী। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

> আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দ্বীন হিসেবে ইসলামের উপর আমি রাজি হলাম[৩১৩]।

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সাথে পরিচিতির ব্যাপারে সমগ্র মানবসমাজে তাঁদের নজির নেই। তাঁদের মাধ্যমে শরিয়াহ পৌঁছে যায় তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তী এবং আজকের প্রজন্মের কাছে।

শরিয়াহর উৎস, উপকরণ ও তার আহকামের ভিতর বাহির এবং শরিয়াহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার ব্যাপারে সাহাবাদের ছিল অসাধারণ জ্ঞান। রসুল সা. কল্যাণের স্বার্থে তাৎপর্য, আহকাম ও সমন্বিত কার্যকারণের অনুসরণ করতেন। কাজেই তাঁর নির্ধারিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য তাৎপর্যে ধাবিত হওয়ার সুযোগ নেই[৩১৪]।

সাহাবাগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শরিয়াহ প্রণেতার বিধান থেকে তাঁরা যে অর্থ অনুধাবন করেছেন তারই ভিত্তিতে তিনি তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করা বৈধ করেছেন।

اجتهد برأى.

> আমার বুদ্ধির ভিত্তিতে আমি ইজতিহাদ করবো

হযরত মু'আয এর এই উক্তির উপর নবি সা.-এর মৌন সমর্থনই এর প্রমাণ। এর অর্থ হলো, যুক্তিসঙ্গত তাৎপর্য একত্র হলে নজির ও সমতার ভিত্তিতে বিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। এ কারণে সাহাবীগণের ইজমা শরিয়াহর কিয়াসভিত্তিক একটি

---

[৩১৩] সুরা আল মায়েদাহ, ৩ আয়াত।

[৩১৪] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১২২ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৭।

www.pathagar.com

দলিল[৩১৫]। শরিয়াহ প্রণেতা কখনো কার্যকারণ উল্লেখ করে আইনের ব্যাখ্যা দেন। আবার কখনো এমন ব্যাখ্যা করেন না। তবে শরিয়াহর উৎসসমূহ অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন কার্যকারণের সাথে পরিচিতি লাভের মাধ্যমে মানুষ শরিয়াহর বিধান প্রয়োগের তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হয়।

কোনো ব্যক্তি তার কর্মচারীকে বললো, অমুককে মারো কারণ সে আমার টাকা চুরি করেছে। এ ক্ষেত্রে মারার কারণ সুস্পষ্ট। আর যদি সে বলে, অমুককে মারো। কিন্তু সেখানে মারার কারণ উল্লেখ নেই তাহলে উপস্থিত লোকদের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে, নিশ্চয়ই লোকটি তাকে গালি দিয়েছে। তাই তাকে মারার হুকুম দিয়েছে। মারার হুকুমদাতা সম্পর্কে এরূপ ধারণা তখনই জন্মে যখন লোকদের পূর্ব থেকেই জানা থাকে যে, প্রতিশোধ নেয়া বা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে লোকটি যেমন কুকুর তেমন মুগুর নীতি অবলম্বনকারীদের দলভুক্ত। তবে লোকটি সম্পর্কে যদি সাধারণভাবে এরূপ পরিচিতি থাকে যে, অসৎ আচরণের বিপরীত সে সৎ আচরণ এবং হিংসার মোকাবিলায় স্নেহ ও সম্প্রীতির পথ অবলম্বন করে থাকে, তাহলে অমুককে মারার কারণ হিসেবে গালিগালাজ করার কথা প্রমাণ করা যাবে না। কারণ কার্যকারণ, হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজন অভ্যাসের বিভিন্নতার দরুণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

একজন দানশীল মুত্তাকী লোকের কাছে যখন একজন লোক বিনয়ী হয় তখন সম্ভাবনা থাকে তার তাকওয়ার দরুণ লোকটি তার কাছ থেকে কিছু বরকত লাভ করবে। আবার দানশীল হওয়ার দরুণ কিছু টাকা পয়সা লাভেরও সম্ভাবনা থাকে। বিনয় প্রকাশকারীর আনুগত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা ছাড়া কারণ নির্ণয় সম্ভব নয়। যদি বিনয়ী লোকটির অভ্যাসই হয় এভাবে পয়সা বাগানো, তাহলে তো তার বিনয় প্রকাশ ও খাতির-তোয়াজ করার কারণ এটা হওয়া সহজেই অনুমান করা যায়। আর যদি বিনয়ী লোকটির প্রকৃতি হয় পরহেজগারী, তাকওয়া ও মুত্তাকী লোকের সাহচর্য নেয়া এবং মানুষের কাছে হাত পাতাকে ঘৃণ্য মনে করা, তাহলে তার বিনয়ের কারণ তাকওয়া ও দুনিয়ার লালসা না হওয়াই স্বাভাবিক। আর যদি বিনয় প্রকাশকারীর অভ্যাস ও প্রকৃতি অজানা থাকে তাহলে বিষয়টি সংশয়িত হয়ে থাকবে[৩১৬]।

আহকামের অর্থ উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সাহাবায়ে কেরাম কখনো দুটি ভালো জিনিসের ব্যাপারে বক্তব্যের স্বচ্ছতায় ও ভাষার অলংকারীত্বে নিশ্চিত হয়ে গেলে তাদেরকে একত্র করেছেন। কুরআন ও সুন্নাতের শব্দ, অর্থ,

---

[৩১৫] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১২২, কাযী আবদুল জাব্বার, আল মুগনী, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ২৯৬ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬ ।

[৩১৬] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১২২-১২৩।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য, বাণী, কর্ম বিবরণী ও অনুমোদনের তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে লোকদের জন্য এটিই যথোপযুক্ত পদ্ধতি। সাহাবাগণের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাদের মতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল। যেমন উমর রা. বলেন : আমি আমার রবের সাথে তিনটি বিষয়ে একাত্ম হয়েছি। তাঁদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যিনি তাঁর রায় উদ্ভাবন করেছেন এবং রসুল সা. তাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। অথবা এমন সাহাবা আছেন যিনি নিজের রায়ের অনুকূলে রসুল সা.-এর সা. হাদিস পেয়েছেন এবং তার ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম নাসায়ী এবং অন্য হাদিস সংগ্রাহকগণও এ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে রা. এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যার স্বামী মারা গিয়েছিল কিন্তু তার মোহরানা নির্ধারিত হয়নি। তিনি জবাবে বলেছিলেন : আমি এ ব্যাপারে রসুল সা.-এর কোনো সিদ্ধান্ত পাইনি। ফলে একমাস ধরে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে থাকেন তারপর নিজে এ সম্পর্কে ইজতিহাদ করেন এবং এই সিদ্ধান্ত দেন যে, তার মোহরানা তার আত্মীয়াদের মোহরানার সমপর্যায়ের। তার চেয়ে কম নয় এবং বেশিও নয়। তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে স্বামীর মীরাসও পাবে। একথা শুনে মা'কল ইবনে ইয়াসার উঠে দাঁড়ান এবং তিনি সাক্ষ্য দেন, নবি সা. এক মহিলার ব্যাপারে অনুরূপ ফায়সালা দিয়েছিলেন। একথা শুনে ইবনে মাসউদ এত বেশি খুশী হন যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর কোনো বিষয় তাঁকে এত বেশি খুশী করেনি[৩১৭]।

কিছু কিছু বিষয়ে তাঁদের মতবিরোধ এ সত্যকে প্রভাবিত করে না। কারণ তাঁরা মানুষ ছিলেন। তাঁদের বুদ্ধি-জ্ঞান উপলব্ধি, যুক্তি সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য ছিল। প্রত্যেক যুগ ও প্রতিটি প্রজন্মের এ ধারাই অব্যাহত আছে।

শরিয়াহ অনুধাবন করা নাকী তার আহকাম জানা এবং তার উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করার ব্যাপারে, তাঁরা ছিলেন আদর্শ ও বিশ্বস্ত। এ ব্যাপারে কেউ তাঁদের কোনো ত্রুটি নির্দেশ করতে পারবে না। শরিয়াহর তাৎপর্য অনুধাবন করা, তার বিধান উদ্ভাবন এবং বাস্তব অবস্থা ও ঘটনাবলীর ওপর তার প্রয়োগ অথবা তার নস্ মুলতবী করার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো ভুল চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তাঁদের এসব কিছু কল্যাণের স্বার্থে এবং অকল্যাণ ও বিপর্যয় প্রতিরোধে নিবেদিত।

---

[৩১৭] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬-১৪১।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

প্রথম আলোচ্য বিষয় : মাসলিহাত বা কল্যাণ

আহ্‌কামের কার্যকারণ

تعليل শব্দটি عَلَّ ধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। শব্দটির বিভিন্ন রূপ হলো : — علّه- يَعُلُّهُ — اعتل- يَعِلُّهُ وتعلل .

বলা হয়ে থাকে, وهذا علة هذا- অর্থাৎ, এটা এটার কারণ[৩১৮]।

যুক্তিবিদ্যা বিশারদদের পরিভাষায় তা'লীল হলো কোনো কিছুর কারণ বর্ণনা করা। যে জিনিসের ওপর কারণ প্রযোজ্য সেটিকেও তা'লীল অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তখন তা'লীলকে যুক্তিগ্রাহ্য দলিলরূপে আখ্যায়িত করা হয়[৩১৯]।

উসূলবিদগণ কখনো একে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণার্থে রচিত আল্লাহ তায়ালার আইন কানুন অর্থাৎ, কল্যাণ অনুযায়ী কার্যকারণ নির্ণয় করা মনে করেছেন। আবার কখনো তারা এর সাহায্যে শর্‌য়ি আহকামের এবং তার উদ্ভাবনের অবস্থা মনে করেছেন।

মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার আহকাম সৃষ্ট হয়ে থাকলে তর্ক শাস্ত্র মতে এ ব্যাপারে বিতর্ক দেখা দেয়। কারণ আল্লাহ তায়ালার কাজের মধ্যে কার্যকারণের উপস্থিতি বাস্তবতা বিরোধী। বিষয়টিকে উসূলে ফিক্‌হের আওতায় এনে কেউ কেউ বলেছে : আল্লাহ তায়ালার কাজগুলো কার্যকারণভিত্তিক নয়। কাজেই তাঁর আহকামও কার্যকারণ ভিত্তিক হবে না। এ অভিমত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর। এ কারণে শর্‌য়ী আহকামের কারণসমূহের অর্থ হবে, বিশেষ আহকামের আলামতের পরিচয় পাওয়া[৩২০]।

ইমাম শাতবী রহ. বলেন : এটিই যথেষ্ট যে, মানব কল্যাণের জন্য সৃষ্ট শরিয়াহ জানার জন্য আমরা অনুসন্ধান করি। জানার জন্য অনুসন্ধান কাজে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম রাযী বা অন্য কারোর দ্বিমত নেই[৩২১]।

---

[৩১৮] লিসানুল আরব, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৪৬৭, বৈরুত থেকে প্রকাশিত, তাজুল উরুস, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩২

[৩১৯] সা'দউদ্দীন তাফতাযানী, শারহুল খাবিসী আলাত তাহযীব, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাশিয়াতুস সিবান আলা শারহিল মালবী আলাস সালাম পৃষ্ঠা ১৩৯।

[৩২০] মুহাম্মদ শালবী, তালীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ৯৫।

[৩২১] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে তা'লীল-এর দ্বিতীয় অর্থ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালার আহকাম মানব কল্যাণের জন্য নিশ্চিত করা। ইতিপূর্বে উদ্দেশ্যসমূহ অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে তা'লীল বিভিন্ন হয়ে থাকে।

যে নির্দেশের স্পষ্ট দলিল নেই তার ঘটনা সম্পর্কে কিয়াসের মাধ্যমে জানতে হবে। কিয়াস হলো, নির্দেশের কার্যকারণে মূল ও শাখার শরীক হওয়ার ভিত্তিতে মূলের জন্য যে নির্দেশ শাখার জন্যও সেই নির্দেশ সাব্যস্ত করা[৩২২]।

নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার অর্থ কখনো এটা হয় যে, মুজতাহিদ শর্য়ী নির্দেশটি এক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্ট ঘটনা সম্পর্কে গবেষণা করবেন। এ ধরনের গবেষণা কাজ ইলাহী কল্যাণ নামে অভিহিত। ইলাহী কল্যাণ হলো, গ্রহণ বা বর্জনের সাক্ষ্য ছাড়া প্রতিটি কল্যাণের কাজই শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যে হওয়া[৩২৩]।

আবার কখনো কার্যকারণ বর্ণনা করার অর্থ হয়, ফায়দার জন্য দলিল ভিত্তিক আহকামের কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা করা। হুকুমটি নিঃশর্ত আনুগত্যমূলক, যা অপূর্ণাঙ্গ কারণ সম্পন্ন। তা'লীল নামে অভিহিত হোক, কিংবা তা'লীল জায়েয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে উসূলবিদদের মধ্যে যে মতভেদ আছে তার হিকমত বর্ণনা করা হোক[৩২৪]।

কুরআনের অনেক আয়াত ও সুন্নাতভিত্তিক দলিল কার্যকারণ সম্বলিত। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে- তাবেঈনদের অনুসৃত নীতিগুলোও আল্লাহ তায়ালার আহকাম মানব কল্যাণের নিমিত্তে হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলিল রূপে গণ্য। যেসব ঘটনা প্রবাহ দলিলভিত্তিক নয় সেগুলো দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যশীল প্রক্রিয়ায় দলিলভিত্তিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং আহকামের তা'লীলের ব্যাপারে অবশেষে কোনো বিরোধিতার অবকাশ থাকবে না।

ইমামুল হারামাইন তাঁর বুরহান নামক গ্রন্থে লিখেছেন : আমি বিশ্ব নন্দিত সাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল। তাঁদের আদর্শ ও চরিত্র অপূর্ব-

---

[৩২২] শিফাউল গালীল, ১০ পৃষ্ঠা, ড. হামদ উবাইদ আল কাবিসীর তথ্যানুসন্ধান, রিসালাদ দাকতুরাহ।

[৩২৩] দাওয়াবিতুল মাসলিহা, পৃষ্ঠা ৩৩০।

[৩২৪] আল মুসতাস্ফা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৫, উসূলূল ফিক্‌হ, যাকিউদ্দীন শা'বান, পৃষ্ঠা ১৪০ ।

www.pathagar.com

অনন্য। তাঁদের মধ্যে কাউকে এরূপ দেখা যায়নি যে, পরামর্শ সভায় বসে ভূমিকা স্বরূপ কিছু আলোচনা করে তার ওপর ভিত্তি করে একটি ঘটনা রচনা করেছেন। বরং তাঁরা রায় ও মতামতের কারণ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছেন। মতামতের কারণসমূহের ভিত্তি আছে কি নেই সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না[৩২৫]।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থে বলা হয়েছে : দলিল অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে শুধুমাত্র মনের প্রশান্তি লাভই সাহাবাগণের মতে প্রকৃষ্ট উপায়। যেমন দেখা যায়, আরবরা ব্যাখ্যা অথবা ইশারা-ইংগিতের মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক কথাবার্তা ও আচার-আচরণের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হতো।

পরবর্তীতে নবি সা.-এর ইন্তিকালের পর সাহাবাগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইসলামি দেশসমূহে তাদের প্রত্যেকেই অনুসরণীয় হয়ে ওঠেন। ইসলামের প্রসার ও প্রচারের সাথে সমস্যা ও ঘটনা প্রবাহ বাড়তে থাকে। রসুল সা.-এর বাণী তাঁরা যেভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন সেই অনুযায়ী অথবা নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা সেসব সৃষ্ট সমস্যার সমাধান বা ফাত্ওয়া দিতে থাকেন। যেসব ব্যাপারে সংরক্ষণ বা অনুসৃত নীতি সমাধানের জন্য যথোপযোগী নয় সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের রায়ের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন। নবি সা. কোনো হুকুমের সাথে যে কার্যকারণ সম্পৃক্ত করেছেন সে ধরনের কারণ সম্পৃক্ত সমস্যার সমাধান তাঁরা নবির উদ্দেশ্যের সাথে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রদান করেছেন। অন্যথায় সে ধরনের হুকুম বর্জন করেছেন[৩২৬]।

এটাই ছিল সাহাবাগণের বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী প্রজন্ম অর্থ অনুধাবন, উদ্ভাবন ও শরিয়াহ দলিলের তা'লীলের ব্যাপারে তাদের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে থাকেন। হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত তাদের নীতিমালা অব্যাহত থাকে। তখনো পর্যন্ত তাদের মত ও নীতিমালা বিরোধী কোনো কার্যকলাপ দেখা যায়নি। কেননা এ দুই যুগের আলেমগণ বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামের বিধিবদ্ধ বিধান মানব কল্যাণ বাস্তবায়ন ও অকল্যাণ দূরীকরণার্থে রচিত হয়েছে এবং তা বান্দার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার অফুরন্ত নিয়ামত স্বরূপ।

শরিয়াহ হুকুম কেবলমাত্র কল্যাণ কার্যকর করার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো মানবসত্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, দ্বীন, বংশ ও সম্পদ রক্ষা করা। সমস্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে শরিয়াহর বর্হিপ্রকাশ ঘটবে। শরিয়াহর বিধান এ দৃষ্টিকোণ বহির্ভূত

---

[৩২৫] মাকতাবা আযহার সংকলিত ৯১৩ নম্বর আল বুরহান।

[৩২৬] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ।

www.pathagar.com

হওয়া অসম্ভব[৩২৭]। নসের তা'লীলের মূল উদ্দেশ্য যখন শরিয়াহ আহকামকে দলিলবিহীন অনুরূপ ঘটনা প্রবাহের দিকে ধাবিত করা হয় তখন এরূপ শরিয়াহর জন্য প্রয়োজন হয় নসের তা'লীল এমনভাবে সমুজ্জ্বল করা যাতে নবসৃষ্ট সমগ্র ঘটনা প্রবাহ এর আওতায় এসে যায়। শরিয়াহ বিধান চিরন্তন হবার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত রয়েছে।

স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে নসের তা'লীল করার উপর তৃতীয় হিজরি শতকের আগে কোনো ধরনের বিরোধিতা দেখা দেয়নি। হিজরি তৃতীয় শতকে শরিয়াহর নস্‌সমূহ তা'লীল করার উপর নিষেধাজ্ঞার আওয়াজ ওঠে। নির্দেশের কারণ অনুসন্ধান ছাড়া এবং নস্ না থাকার ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত না করে শুধুমাত্র শর্‌য়ী দলিলের উপর ভিত্তি করে কাজ করার আহ্বান আসে।

দাউদ ইবনে আলী ইস্ফাহানী র. এ আওয়ায তোলেন। যাহেরী মতাবলম্বীদের তিনি ছিলেন ইমাম। তাঁর মৃত্যু হয় ২৭০ হিজরিতে। তিনি কিয়াস উপেক্ষা করে সর্বপ্রথম সরাসরি কুরআন ও হাদিসভিত্তিক কাজ শুরু করেন[৩২৮]।

জাম্‌উল জাওয়ামে গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন যে, দাউদ যাহেরী প্রকাশ্য ও স্পষ্ট কিয়াস সমর্থন করেছেন এবং ইবনে হাযম রহ. সব ধরনের কিয়াস অস্বীকার করেছেন[৩২৯]।

এ মতের প্রতিষ্ঠাতার ওপর আপাতত কঠোরতা ও অক্লান্ত শ্রমের কারণে মতটির প্রচার ও প্রসারে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে সমকালীন লোকদের অনেকেই মতটি অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে।[৩৩০]

তাঁর মতে বিশ্বাসী লোকদের উপর এসব আপতিত কঠোরতা ও ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব সৃষ্টি হয়। তারা তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে, সাহায্য-সহায়তা দেয়।

ফলে এ মতটি সে সময় রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে এবং অতি সন্তর্পনে ফিক্‌হী মতবাদের দোরগোড়ায় উপনীত হয়।

---

[৩২৭] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮, আল ফিকরুস সামী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২।

[৩২৮] তাবকাতুশ শাফেয়ীয়া, সাবাকী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৪, ইবনুন নাদীম, হালবী ওয়াল ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ৩১৭ এবং যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬, শাহরিস্তানী, আল মিলাল ওয়ান নিহাল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৬, মুহাদারাহ, শায়খ আবদুল আল দাউদ যাহেরী হতে।

[৩২৯] জামউল জাওয়ামে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২ ।

[৩৩০] যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮২, আল ই'লাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৪।

www.pathagar.com

যাহেরী মতবাদের ব্যাপারে বলা যায় : রায়, কিয়াস ও শরিয়াহ্ আহকামের তা'লীলের উপর যখন শরিয়াহ্ আহকাম গ্রহণ ও বাতিল নির্ভরশীল ছিল তখন ইবনে হাযমের র. আবির্ভাব ঘটে। ৩৪৬ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি শক্তিপ্রয়োগ করে শিক্ষানীতির আওতাভূক্ত করে তার মতটি শক্তিশালী করেন। এ বিষয়ে আল মুহাল্লা ও আল আহকাম নামে দুটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ দুটিই যাহেরী মতাবলম্বীদের সমস্ত মূল ও খুঁটিনাটি বিষয়ের উৎস[৩৩১]।

কিয়াস অস্বীকারকারী প্রসিদ্ধ লোকদের মধ্যে নিযাম অন্যতম। তবে তাঁর অস্বীকৃতি বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক গৃহীত হয়নি। মু'তাযিলা সম্প্রদ্রায়ের সকল ইমাম এটা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন প্রথম দিকের কিয়াস অস্বীকারকারীদের একজন[৩৩২]।

কিয়াসের ব্যাপারে ইমামীয়া শিয়াগণ দু'দলে বিভক্ত। একদল উদ্ভাবিত কার্যকারণ এবং দলিল দ্বারা প্রমাণিত কার্যকারণ সম্বলিত কিয়াসের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা উদ্ভাবিত কার্যকারণ সম্বলিত কিয়াস অস্বীকার করে কুরআন, হাদিস ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দ্বিতীয় ধরনের কিয়াস সম্পর্কে তাদের ভাষ্য হলো, এটা নিছক কিয়াস নয়। বরং নস্ বা দলিলকে প্রচলিত অর্থের প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক করা[৩৩৩]।

অপর দলটি নস্ ভিত্তিক কিয়াস এবং উদ্ভাবিত কিয়াসের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। তাদের মতে উভয় ধরনের কিয়াসই পরিত্যাজ্য, এগুলো গ্রহণ বা এগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না[৩৩৪]।

কিয়াস নিয়ে কথার সূত্রপাত হয় এ কারণে যে, শরিয়াহর নস্ প্রান্তিক কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের কোনো প্রান্তিক সীমারেখা নেই। চলমান ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশের বর্ণনা মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

---

[৩৩১] ড. হামদ উবাইদ আল কাবিসী, মাবাহিসুত তা'লীল, ৬ পৃষ্ঠা।

[৩৩২] আস সারাখ্সী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৮, দারুল কুতুব সংকলিত বাহরুল মুহীত, ৪৮৩ নম্বর, কাযী আবদুল জাব্বার, আল মুগনী, ১৭ খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, ইবনুল হুসাইনী আল বাসরী, আল মু'তামাদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭২৪-৭২৫, ৭৪৫-৭৪৮।

[৩৩৩] হাল্লা, আত্ তাহযীব, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩৩০৭, আসলুশ শীয়াহ ওয়া উসূলুহা, পৃষ্ঠা ১২০, আল মাবাদিউল আম্মাহ লিল ফিকরেজ জাফরী, পৃষ্ঠা ২৯০।

[৩৩৪] তুসী, আল ইদা, পৃষ্ঠা ৮৬, হাল্লী, আত্তাহযীব, পৃষ্ঠা ৩০২।

www.pathagar.com

শিয়া ইমামীয়াগণ নসের প্রান্তিকতা স্বীকার করেছেন। অথচ রায়, কিয়াস ও নসের কার্যকারণের মাধ্যমে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। বরং তারা মনে করেন, একজন ইমাম বা নেতৃত্ব দেবার মতো লোকের আবির্ভাব মূলতই আল্লাহ তায়ালার বিরাট মেহেরবাণী। তাদের ধারণা, আবির্ভূত ইমাম জন্মগতভাবে মাসূম। নবিগণ যে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, ইমামগণ তা মীরাসীসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। প্রত্যেক ইমামই পরবর্তী সময়ের জন্য একজনের থেকে ইমামতির শপথ নেন। তিনি কৌশলের সাথে পরবর্তী সময় তার মিশন চালিয়ে যান[৩৩৫]।

এরূপ চিন্তাধারাই কিয়াস ও তা'লীল অস্বীকার করার যুক্তি। তারা মনে করেন, তা'লীল ও কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত বস্তুর অনুসরণের চেয়ে একজন নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ লোকের অনুসরণ করা অধিকতর শ্রেয়। তবে তাদের মতে এই নিষ্কলুষতা ও নেতৃত্ব ইমাম মাহদীর জন্য নির্ধারিত। তাদের ধারণা অনুযায়ী এই ইমাম মাহদী ২৬৫ হিজরিতে সারাদীবে অদৃশ্য হয়ে যান[৩৩৬]।

ইমামের অদৃশ্য হওয়ার ফলে তাদের অনুসরণযোগ্য বিশেষ নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। কাজেই তাদের মতে প্রতিযুগেই ইজতিহাদ করা জরুরি[৩৩৭]।

এ কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের কিয়াস সম্বলিত কথা এবং মুজতাহিদদের গৃহীত মৌল উৎস সম্পর্কে নীরবতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মৌল উৎসগুলো হলো : কুরআন, হাদিস, ইজ্‌মা ও বুদ্ধি[৩৩৮]।

ইমামীয়া শিয়াগণ মনে করেন, কোনো কাজ বা ঘটনার ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ হওয়া না হওয়ার প্রসঙ্গটি নির্ণয় করতে পারে মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। কাজেই যেসব বাপারে সুস্পষ্ট নস্ নেই সেসব ব্যাপারের আদেশে নিষেধ প্রসঙ্গটি কেবলমাত্র জ্ঞানই নির্ণয় করতে সক্ষম। বস্তুত মুতাযিলাগণও এমত পোষণ করে থাকেন[৩৩৯]।

---

[৩৩৫] আসলুশ শী'আহ ওয়া উসূলুহা, পৃষ্ঠা ১১৮।

[৩৩৬] শাহারিস্তানী, আল মিলাল ওয়াল নিহাল এবং সাইস ও সাবাকী, তারীখুত তাশ্‌রী, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

[৩৩৭] আসলুশ শী'আহ ওয়া উসূলুহা, ১ পৃষ্ঠা ২০-১২১, ড. হামদ উবাইদ আল কাবিসী, মাবাহিসুত তা'লীল, খণ্ড ১, দিরাসাতুন আম্মাহ।

[৩৩৮] আসলুশ শীআহ, পৃষ্ঠা ১২১।

[৩৩৯] হাল্লী, আত্ তাহযীব, পৃষ্ঠা ১৭-১৮, তুসী, আল-ইদ্দাহ পৃষ্ঠা ১১৭, উস্তায শাইখ আবদুল গনীর উসূলুল ফিক্‌হে ভালো ও মন্দের আলোচনা, পৃষ্ঠা ৬১-৬৫।

www.pathagar.com

তবে শরিয়াহ্ বিশেষজ্ঞগণের অধিকাংশই শরিয়াহ্‌র আহ্‌কামের নসের তা'লীল করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মৌলিক তা'লীল করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে হুকুম স্থানান্তরিত করা (تعدية) জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আরোপিত শর্তাবলি সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের চার ধরনের বক্তব্য আছে :

এক. তা'লীল করার দলিল দাঁড় করানোর পূর্ব পর্যন্ত নস্ তা'লীলবিহীন হওয়াই মূল কথা।

দুই. অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে তা'লীল করা নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নসের হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক কল্যাণমূলক বৈশিষ্ট্যময় তা'লীল যুক্ত হওয়াই মূলকথা।

তিন. নস্ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তা'লীল যুক্ত হওয়াই মৌল কথা। তবে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী দলিল থাকা বাঞ্ছনীয়।

চার. নস্ তা'লীল যুক্ত হওয়াই মৌলিক কথা। তা'লীল তবে বৈশিষ্ট্য যা কারণরূপে গণ্য তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী দলিল থাকা বাঞ্ছনীয়। এর সাথে আরো কথা হলো, তা'লীল ও পার্থক্য করার আগে যে দলিলের কারণ নির্ণয় করার প্রয়োজন সে দলিলটি কার্যকারণ সম্বলিত হওয়ার দলিল থাকা জরুরি।

উপরোক্ত চার ধরনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা

প্রথম ধরনের বক্তব্যের কারণ

নস্ বা দলিল তার কারণসহ নয়, বৈশিষ্ট্যসহ হুকুমকে ওয়াজিব করে থাকে। কেননা শরিয়াহ্ কারণসমূহ নস বা দলিল হওয়ার নিদর্শন নয়। হুকুম কখনো তা'লীলের ছত্রছায়ায় কাঠামো থেকে কারণের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে, যাকে আসল থেকে রূপক অর্থে গণ্য করা যায়। দলিল ছাড়া এ ধরনের স্থানান্তর ঠিক নয়। কারণ দলিলের অবকাঠামোর পরিচয় শ্রবণ এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য জানার উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে দলিলের শরিয়াহ্‌সম্মত অর্থের পরিচয় লাভ করা তার প্রকৃত তাৎপর্য জানার ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন পরোক্ষ অর্থ জানা। বরং এর থেকেও অনেক দূরে। কেননা কোনো জিনিসের পরোক্ষ অর্থ এক ধরনের দর্শন বৈকি! অবস্থার বাস্তবতার আলোকে মূল কথা হলো; দলিলের কাঠামোগত দৃষ্টিতে কাজ করতে হবে, অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কাজেই এরূপ মৌলিকতা পরিহার করা

www.pathagar.com

এবং দলিল ছাড়া এর অর্থ পরিবর্তন করা বৈধ নয়। যেমন হাকীকাত পরিত্যাগ করা এবং হাকীকাতের অর্থ দলিল ছাড়া পরিবর্তন করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় ধরনের বক্তব্যের কারণ

নস্ ও নসের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য নির্ণয় করা ছাড়া কিয়াসের যুক্তির উপর দলিলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ফলে তা'লীলটি মৌলিক বা আসল হওয়ার সক্ষমতা লাভ করে। সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ তা'লীল করা সম্ভব নয়। আবার কিছু বাদ দিয়ে এবং কিছু গ্রহণ করেও তা'লীল করা যায় না, যাতে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ তা'লীল নির্দিষ্ট হতে পারে। তবে নস্ কিংবা ইজমা বিরোধী কিংবা বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিকূলে কোনো বাধা থাকলে সেটা হবে স্বতন্ত্র ব্যাপার।

যেমন হাদিস বর্ণনা করার ব্যাপারে নিয়ম আছে, হাদিস হুজ্জত বা দলিলরূপে প্রমাণিত হলে তদনুযায়ী কাজ করা ওয়াজিব। রাবীগণের বিবরণ ছাড়া হাদিস প্রমাণিত হয় না। রাবীগণ একথায় একমত যে, রাবী কর্তৃক বর্ণিত প্রতিটি হাদিস অভিযোগমুক্ত হওয়ায় প্রতিটি বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দলিলরূপে গণ্য, যা কোনো প্রতিবন্ধক ছাড়া পরিত্যাগ করা যাবে না। অকাট্য দলিলরূপে গণ্য হাদিস, নস্ বা ইজমার বিরোধিতা অথবা রাবীর পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কথা প্রকাশ পাওয়া ইত্যাকার কাজগুলো হলো প্রতিবন্ধক। এমনিভাবে নসের তা'লীল যখন তার সবকিছুসহ অভিযোগমুক্ত হবে তখন সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্য কার্যকারণরূপে পরিগণিত হবে, যদি কোনো বাধা না থাকে[৩৪০]।

তৃতীয় ধরনের বক্তব্যের কারণ

সেটা হলো, সমস্ত গুণাবলিসহ তা'লীল করা এবং প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যসহ তা'লীল করা অসম্ভব হওয়া। কেননা এগুলোর মধ্যে যা অসম্পূর্ণ তার হুকুম আসল থেকে স্থানান্তর করা অবশ্যই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যা স্থানান্তরযোগ্য তা শাখা-প্রশাখায় স্থানান্তর করা ওয়াজিব। এটা হচ্ছে পারস্পরিক প্রতিকূলতা। কাজেই কিছুকে নির্ধারণ করতে হবে। তা'লীল কখনো কিয়াসের জন্য আবার কখনো নসের জায়গায় হুকুম অসম্পূর্ণ থাকার কারণে প্রযোজ্য হয়। সবকিছু সহ তা'লীল করা যখন অসম্ভব তখন সমুদয় থেকে একটিসহ তা'লীল করা কর্তব্য। আর এরূপ করা অজ্ঞাত। অজ্ঞতাসহ তা'লীল করা বাতিল। কাজেই তালীলের জন্য সমগ্র গুণাবলির মধ্যে কোনো একটি গুণ নির্ধারক দলিল হওয়া বাঞ্ছনীয়[৩৪১]।

---

[৩৪০] কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬ এবং আত তাল্‌বীহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪।

[৩৪১] কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬ এবং আত তাল্‌বীহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪।

www.pathagar.com

চতুর্থ ধরনের বক্তব্যের কারণ

একথা স্পষ্ট যে, নস্‌সমূহের মূল হচ্ছে তা'লীল। তা'লীল হচ্ছে, দোষারোপ ও ভুল-ত্রুটির সংশোধনী। এ কারণে তা'লীল শুরু করার আগে মূল দলিল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অর্থাৎ, এমন নস যার তা'লীল দ্বারা দলিলটি বর্তমানে কারণ সম্বলিত হওয়াই হচ্ছে উদ্দেশ্য। দলিলটি তার উৎস দ্বারা সংকুচিত নয় বরং তার হুকুম অন্যদিকেও সম্প্রসারিত হবে।

এগুলো ইস্তিহ্‌সাবে হাল-এর উদাহরণ। যখন প্রকাশ্য প্রক্রিয়ায় এটা প্রমাণিত হলো, তখন যুক্তি প্রতিশেধক হওয়া দোষারোপ সূচক না হওয়া সঠিক হয়ে গেলো। এমনকি নিখোঁজ ব্যক্তির বেঁচে থাকা এই প্রক্রিয়ায় যখন প্রমাণিত তখন তার অধিকার চাওয়ার দাবী নাকচ করার এটা একটা যুক্তি বা দলিল। এ অবস্থায় নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদের কোনো ওয়ারিস দাবী করা যাবেনা এবং দাবী করার কারণও সঙ্গত হবে না। এমন কি যদি তার কোনো নিকটাত্মীয় মারা যায় তাহলে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়া সংশয়পূর্ণ হওয়ায় সে তার ওয়ারিস হতে পারবে না। অনুরূপভাবে অজ্ঞাত অবস্থার (মাজ্‌হুলুল হাল) হুকুমও একই রূপ। কোনো ক্রীতদাসের সাক্ষ্য তার ক্রীতদাস হওয়ার কারণে সংশয়পূর্ণ হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কেননা মানুষ মূলত স্বাধীন। যদি কোনো শত্রু তার স্বাধীনতার অপবাদ দেয় তাহলে মৌলিকভাবে তা নিরসনের সম্ভাবনায় অপবাদের যুক্তি ধোপে টিকবে না। এভাবে যখন মৌলিক বিষয় কারণ সম্বলিত হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায় তখন আর সন্দেহ বাকি থাকে না। ফলে বিষয়টি একটি যুক্তি বা দলিলের রূপ পরিগ্রহ করে[৩৪২]।

একথা স্মর্তব্য যে, তালীলের অর্থ হচ্ছে নস্‌-এর কারণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। কারণের মাধ্যমে হুকুম নসের স্থান ছাড়া অন্যত্র সংক্রমিত করার প্রসঙ্গটি এ থেকে এড়িয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে কারো এমনকি যাহেরীয়াদেরও কোনো দ্বিমত নেই। কেননা এ ধারাটি কুরআন ও হাদিস সমর্থিত[৩৪৩]।

তা'লীল সম্বলিত বক্তব্য যে কিয়াস সম্বলিত বক্তব্য হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কিয়াস সম্বলিত বক্তব্য তা'লীল সম্বলিত বক্তব্য হতে বাধ্য

---

[৩৪২] কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬ এবং আত তাল্‌বীহ্‌, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪ এবং খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৭।

[৩৪৩] ইবনে হাযম, কিতাবুল আহকাম, পৃষ্ঠা ১১৩০, নুযহাতুল মুশতাক, পৃষ্ঠা ৭০৫।

www.pathagar.com

করে। কেননা সকল তর্কশাস্ত্রবিদের মতে ইল্লাত বা কারণ কিয়াসের একটি স্তম্ভ। এটা ছাড়া হুকুমের জন্য তা সম্প্রসারিত হতে পারে না।

আমরা জানতে পারলাম উপরিউক্ত চারটি অভিমত কিয়াস কিংবা তালীলের দিক থেকে মূলত পারস্পরিক সাংঘর্ষিক নয়। তবে দলিলের মধ্যে প্রকৃতিগত মতপার্থক্য আছে। দলিলটি তালীলের ওপর নির্ভরশীল দলিল ছাড়া মূলত তা'লীল বিহীন নাকি তালীলের প্রতিবন্ধকতার কারণ ছাড়া দলিলটি মূলত তা'লীল সম্বলিত। এ স্বাভাবিকতা কিছুটা বিতর্কিত। বিতর্কের এ বিন্দুর একদিকে অবস্থান করেছেন প্রথম ধরনের প্রবক্তাগণ এবং অন্যদিকে অপর তিনটি মতের সমর্থকগণ। এ বিতর্ক সাধারণভাবে তা'লীল কিংবা কিয়াসের অন্তরায় নয়। বরং প্রথম ধরনের প্রবক্তাদের মতানুযায়ী কিয়াসের সীমানা চিহ্নিত করা কিংবা দ্বিতীয় ধরনের মতানুযায়ী সম্ভাবনাকে বিস্তীর্ণ করা হয় মাত্র।

তৃতীয় ও চতুর্থ মতাবলম্বীগণ দ্বিতীয় মতের সাথে একাত্ম হয়ে তা'লীলকে নসের মূল বলেছেন। তবে তারা কারণরূপে গণ্য এমন গুণাবলিকে সম্পৃক্ত হওয়ার অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেছেন। তৃতীয় মতাবলম্বীগণ অন্যের সাথে পার্থক্য নির্ণয়কারী বৈশিষ্ট্যকে দলিল হিসেবে শর্ত গণ্য করেছেন। চতুর্থ মতাবলম্বীগণ অতিরিক্ত একটি শর্ত আরোপ করেছেন। শর্তটি হলো, যে নস্ দ্বারা তা'লীল করা উদ্দেশ্য তার কারণ সম্বলিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বর্তমান ঘটনাকে পূর্ববর্তী অনুরূপ প্রমাণিত ঘটনার ওপর কিয়াসের প্রক্রিয়ায় এবং অবতীর্ণ সংশোধনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁরা সাধারণ সঠিক নিয়মাবলির প্রক্রিয়ায় ইস্তিহ্সান-এর নীতি অবলম্বন করেছেন।

তাদের মতে যেসব ক্ষেত্রে কোনো নস্ নেই সেসব ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করাই হচ্ছে প্রথম প্রক্রিয়া। কেননা আংশিক অর্থের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা সঠিক অর্থের অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। যেমন শ্রেণির অংশীদারিত্ব জাতির অংশীদারিত্বের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

নবসৃষ্ট ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে কিয়াস ও তালীলের ভূমিকা যার কাছে অজ্ঞাত তিনি এটাকে বাধার প্রাচীর মনে করে পরিত্যাগ করবেন না। বরং হুকুম ও নির্দেশ হিসেবে একে স্থানান্তরিত করবেন। তবে প্রশ্ন হলো, এ কাজটি তিনি করবেন কেমন করে?

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞগণ বলেন, নস্, কিয়াস বা ইস্তিহসাবের মুখাপেক্ষী না হয়ে শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থের স্বাভাবিকতায় পূর্ববর্তী পরবর্তী সব ধরনের ঘটনাপ্রবাহকে শামিল করে থাকে[৩৪৪]।

ঘটনাপ্রবাহের দোষত্রুটি অনুসন্ধানের ব্যাপারে যাহেরীয়াদের নীতির চেয়ে জমহুরের নীতি অধিকতর স্বীকৃত ও যুক্তি সঙ্গত। কারণ শরিয়াহ বা আইনগত অর্থ কখনো আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন করে দেয়। এজন্য অবস্থার ইঙ্গিত, আচার-অনুষ্ঠান, অভ্যাস ছাড়া এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। সাহাবীদের নীতি জমহুরের প্রক্রিয়ার সমর্থক। এ মতের অনুসারীদের মতে কিয়াস প্রয়োগ করার ক্ষেত্র সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বীগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে[৩৪৫]। কিয়াস সংক্রান্ত ইতিপূর্বেকার আলোচনায় এ কথা বলা হয়েছে।

ইল্লাত : পরিভাষাবিদদের মতে শব্দটি তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে :

এক. যে কাজ ভালো কিংবা মন্দকে বিন্যস্ত করে। যেমন ব্যভিচার কর্ম বংশে সংমিশ্রণ করে এবং হত্যা কর্ম হানাহানি ও মারামারির কাজ করতে উৎসাহিত করে। মালের বিনিময়ে মালের পরিবর্তন ধরনের বেচাকেনার দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপকার সাধন করে এবং উভয়ের মধ্যকার ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করে যদিও বিনিময় না হয়ে থাকে।

দুই. যে আইনানুগ হুকুম কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ প্রতিরোধ করে। যেমন - পূর্ববর্তী কল্যাণ সাধনে বেচাকেনা অনুমোদন করা, ব্যভিচার ও হত্যাকে হারাম সাব্যস্ত করা এবং কিসাস ও দণ্ডবিধি প্রবর্তনের মাধ্যমে বংশ ও মানবসত্তা রক্ষা করা।

তিন. বাহ্যিক নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য, যা আইনানুগ হুকুমের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য কল্যাণকর। যেমন কতল ও বিনা শব্দদ্বয় এবং ইজাব-কবুলের শাব্দিক প্রতিক্রিয়া (যেমন আমি বিক্রির প্রস্তাব করলাম বা আমি ক্রয় করলাম)।

উপরোক্ত তিনটি কাজকেই ইল্লাত বা কার্যকারণ নামে সঠিকভাবে আখ্যায়িত করা যায়। কাজেই বলা যায়, মালিকানা স্বত্ত্বা স্থানান্তরিত করা এবং বেচাকেনার কল্যাণ অনুমোদন করার কারণ হলো ইজাব-কবুল অথবা এ কার্যক্রমের মধ্যস্থ কল্যাণ

---

[৩৪৪] জামউল জাওয়ামে শারাহ সহকারে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২।

[৩৪৫] আমাদী, আল আহকাম, ৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬।

www.pathagar.com

সাধন কিংবা অকল্যাণ, অনিষ্টকারিতা ও অসুবিধা দূরীকরণ। এমনিভাবে কিয়াস ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো হত্যা কর্ম অথবা হত্যা কর্মের অকল্যাণ অর্থাৎ হানাহানি বন্ধ করা, শত্রুতা দমন করা এবং জীবন রক্ষা করা[৩৪৬]।

কিন্তু পরবর্তী উসূলবিদগণ গুণাবলিকে ইল্লাত নামের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। যদিও তারা এটাকে মাজাযী বা পরোক্ষ ইল্লাত বলেছেন। কেননা এগুলো প্রকৃত কারণের বিধি-বিধান। যে কাজ ভালো কিংবা মন্দের প্রতি আকৃষ্ট করে সে কাজটিকেই তারা মূল কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর যে আইনানুগ হুকুম কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকারিতা দমনকারী কিংবা আইনদাতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল সে হুকুমকে কেউ হিকমত বা কৌশল নামে অভিহিত করে তাকে গাইয়াতে ইল্লাত বা চূড়ান্ত কারণ বলেছেন। হিকমত তথা কৌশল ও কল্যাণের সাথে তা'লীল করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে[৩৪৭]।

জমহুরের মতে ইল্লাত হলো হুকুমের জন্য চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। যেমন মাদক দ্রব্য। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে মাদকতা বিদ্যমান থাকা ইল্লাত বা আলামত যা দ্রব্যকে হারাম করে দেয়। যেমন মদ ও নেশা সৃষ্টিকারী পানীয়। যখন শরিয়াহ প্রণেতা বলেন, নেশার কারণে মদ হারাম করা হয়েছে তখন কার্যকারণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে একথা কেবলমাত্র নসের সাহায্যেই স্পষ্ট মনে করা যায়। মাদকতার কারণে মদ হারাম করা হয়েছে এ কথাটি তা'লীলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে বলতে হয়, দ্রব্যের মধ্যে মাদকতা থাকা হুকুম প্রযোজ্য হওয়ার প্রমাণ। এক্ষেত্রে বস্তুর হারাম হওয়ার ইল্লাত হলো মাদকতা। মদের বৈশিষ্ট্য হলো আসক্তি। এই আসক্তি বা মাদকতা মদের হুকুমের ব্যাপারে চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যরূপে সম্পৃক্ত হয়েছে[৩৪৮]।

হানাফী মতাবলম্বী আল্লামা বায়দাবী ইল্লাত বা কার্যকারণের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : নস্ বা দলিলের নির্দেশ যেসব বিষয় শামিল করে সেগুলো সম্পর্কে যার সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া যায় তাই ইল্লাত। এক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখাগুলো হুকুমের জন্য উদাহরণরূপে গণ্য হবে। তিনি আরো বলেছেন : ইল্লাত প্রথম থেকেই হুকুমের ওয়াজিবের সাথে সংযোজিত। যেমন বেচাকেনা করা মালিকানার ভিত্তিতে, বিবাহ

---

[৩৪৬] তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ১৩, ড. হামদ উবাইদ আল কাবিসী।

[৩৪৭] তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ১৩, ড. হামদ উবাইদ আল কাবিসী এবং আল জামউল জাওয়ামে আত্তারের হাশিয়া সহকারে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮০।

[৩৪৮] জামউল জাওয়ামে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭২, আল মাহসূল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪১৩, মাকতাবা আযহার সংকলিত ২১৪৭ নম্বর দলিল, আল আযনবী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৬।

www.pathagar.com

করা হালাল হওয়ার ভিত্তিতে এবং হত্যা করা কিসাসের ভিত্তিতে। তবে শরিয়াহসম্মত ইল্লাত স্বতই কোনো জিনিসকে ওয়াজিব করে না। কোনো হুকুম ওয়াজিব করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা[৩৪৯]।

কাজেই ইল্লাত-এর পরিচয়ের ধারার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তার সকল সংজ্ঞার অর্থ এক ও অভিন্ন।

প্রথম বৈশিষ্ট

শরয়ী কল্যাণের বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা ও কল্যাণের পরিচয় কল্যাণের আভিধানিক অর্থ

বহুল প্রচলিত অভিধানগুলো অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই মাসলিহাত বা কল্যাণ শব্দটি দু'দিক থেকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এক. যে কাজে সালাহ তথা কল্যাণ নিহিত সে কাজটি উদ্দেশ্য হওয়া। এটা হলো শব্দটির পরোক্ষ প্রয়োগ। অর্থাৎ কারণকে আদি কারণের ওপর প্রয়োগ করা। যেমন কার্যসমূহ প্রয়োগ করা হয় কল্যাণকারিতার ওপর। যেমন জ্ঞান অন্বেষণ করা কল্যাণকর। কেননা জ্ঞান মৌলিক কল্যাণের উৎস বা কারণ। এমনিভাবে বলা যায়, কৃষি ও ব্যবসায় কল্যাণকর কাজ। কারণ এ দুটি কাজ মানবিক কল্যাণের উৎস বিশেষ।

উপরিউক্ত অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে মাসলিহাত শব্দের অর্থ অকল্যাণের বিপরীতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ কল্যাণ ও অকল্যাণ শব্দ দুটি বিপরীতমুখী। একই সাথে দুটি বিপরীতমুখী শব্দের প্রয়োগ অসম্ভব। যেমন কামূসুল মুহীত নামক অভিধানে বলা হয়েছেঃ

الصلاح ضد الفساد। অর্থাৎ, কল্যাণ অকল্যাণের বিপরীত। মাস্লিহাত অনেক কল্যাণের একটি এবং কল্যাণ কামনা অকল্যাণ কামনার বিপরীত। মুখ্তারুস সিহাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে : কল্যাণ ফাসাদের বিপরীত। মাসলিহাত কল্যাণসমূহের একটি এবং কল্যাণ কামনা অনিষ্ট কামনার বিপরীত। মিস্বাহুল মুনীর অভিধানে বলা হয়েছে : কোনো জিনিসকে যথার্থভাবে সংশোধন করার নাম মাস্লিহাত। শব্দটি ফাসাদের বিপরীত। আসলে মাস্লিহাত হলো মঙ্গল ও কল্যাণের সমষ্টি।

দুই. মাসলিহাত হচ্ছে শাব্দিক ও অর্থের দিক থেকে উপকার সাধন করা। এটা হচ্ছে শব্দটির প্রকৃত অর্থ। একক অর্থে অনেক উপকারের একটি উপকার উদ্দেশ্য হতে

[৩৪৯] কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪৪ এবং খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭১-১৭২।

www.pathagar.com

পারে। কিংবা ধাতুগত দিক থেকে উপকার সাধন তথা উপকার করা উদ্দেশ্য হতে পারে। কোনো কোনো সময় উপকারিতার উপকরণ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ হয়। যেমন লেখার উপকরণ কলম। কলমটি মাসলিহাত অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। মোটকথা মাস্‌লিহাত শব্দটি মানব কল্যাণ সাধনের যাবতীয় উপায় উপকরণ অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কৃষিকাজ খাদ্য যোগানোর জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের জন্য মাসলিহাত-এর অন্তর্ভুক্ত।

শরিয়াহর দৃষ্টিতে মাস্‌লিহাত বা কল্যাণের অর্থ

উসূলশাস্ত্রবিদগণ মাসলিহাত-এর সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য নির্ণয় প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ তার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে উপকারে পৌছিয়ে দেয় যে কারণ তা নিয়ে কথা বলেছেন। কেউ স্বয়ং প্রযোজ্য কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। মাসলিহাতের তাৎপর্য বিভিন্নমুখী হওয়ায় শব্দটির সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর অভিমত

ইমাম গাজ্জালী রহ.র মতে উপকার সাধন বা অপকার প্রতিরোধ করা প্রকৃতপক্ষে মাস্‌লিহাত। মাসলিহাতের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ আমরা এ কথা বলছিনা যে, উপকার সাধন বা অপকার প্রতিরোধ করা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য সৃষ্টির উপকার জরুরি। বরং মাসলিহাত বলতে আমরা বুঝি এর সাহায্যে শরিয়াহর উদ্দেশ্যের হেফাজত করা। সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত শরিয়াহর উদ্দেশ্য হচ্ছে ৫টি। দ্বীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদের হেফাজত করা। এ ৫টি জিনিসের হেফাজতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয়ই হচ্ছে মাসলিহাত বা কল্যাণকর। আর এগুলো রক্ষায় অনুপযোগী প্রতিটি জিনিসই অনিষ্টকর। অনিষ্টকর বিষয় প্রতিরোধ করাই কল্যাণ। কিয়াসের সূত্র ধরে যখন আমরা কল্পিত বা যথার্থ অর্থ প্রয়োগ করি তখন এর মাধ্যমে আমরা এ ধরনের উদ্দেশ্য গ্রহণ করে থাকি[৩৫০]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন : শব্দটি কখনো উপকার সাধন এবং কখনো অপকার প্রতিরোধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ অপকার বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং প্রতিরোধ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা। মোটকথা অনিষ্টকর জিনিস পরিহার করা, প্রতিরোধ ও

---

[৩৫০] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০২ এবং আল মুশতাশফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৪।

www.pathagar.com

প্রতিকার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং যথোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা তথা আইন প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল পদ্ধতি অবলম্বন করা মাসলিহাত-এর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বর্জিত কোনো পদক্ষেপ যথার্থ হতে পারে না[৩৫১]।

ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর মতে, আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করাই মূলত মাস্‌লিহাত। আর আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় ৫টি জিনিসের হেফাজতের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা।

খাওয়ারযিমী রহ.-এর অভিমত

মাসলিহাতের তাৎপর্য ব্যক্ত করে এর সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর সাথে একমত। তবে পরোক্ষ অর্থ এবং বাক্যের বাহ্যিক চেহারা অনুযায়ী তাঁর পরিসর সংকীর্ণ করার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন : মাসলিহাত হলো, সৃষ্টি থেকে অনিষ্টকর বিষয় দূর করে দিয়ে শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যের হেফাজত করা। ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর মতের সাথে এ মতের তুলনা করলে আমরা দেখি, অর্থের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে ঐক্য আছে। কারণ অনিষ্টকর বিষয় দূর করার মাধ্যমে সৃষ্টির অবশ্যই উপকার করা যায়। যেমন কল্যাণকর বিষয়কে সরিয়ে দিলে অকল্যাণ আসতে বাধ্য। কারণ কল্যাণ ও অকল্যাণ পরস্পর বিপরীতধর্মী। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির উপস্থিতি অনিবার্য। ব্যভিচার, হত্যা, মদপান ইত্যাকার অনিষ্টকর কাজ থেকে দূরে থাকলে সেখানে মাসলিহাত অর্থাৎ, কল্যাণ হবেই। অনিষ্টকর কাজ দমন করার মাধ্যমে যখন কল্যাণ করা সম্ভব তখন কল্যাণকর কাজ করার মাধ্যমে উপকার লাভ করা আরো সহজ ও প্রত্যাশিত। খারেজীগণ এ তত্ত্বের ভিত্তিতেই দুটি অবস্থার মধ্য থেকে কেবলমাত্র একটি অবস্থার উপর নির্ভর করেছেন।

ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামে রহ.-এর[৩৫২] অভিমত

কাওয়ায়েদুল আহকাম গ্রন্থে ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম মাসলিহাত-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা ও তত্ত্ব পেশ করেছেন। এখানে তাঁর বর্ণিত কতিপয় তত্ত্ব তুলে ধরা হলো। তিনি বলেছেন, মাসলিহাত চার প্রকার : স্বাদ ও স্বাদের উপকরণসমূহ এবং আনন্দ

---

[৩৫১] শিফাউল গালীল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩।

[৩৫২] ইয্ ইবনে আবদুস সালাম : তাঁর উপাধি ছিল সুলতানুল উলামা। নাম, আবু মুহাম্মদ ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদুস্ সালাম, আল মিস্‌রী আশ শাফেয়ী। ৬৬০ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বিখ্যাত কিতাব কাওয়ায়েদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

www.pathagar.com

ও আনন্দের কার্যকারণসমূহ। তেমনি অনিষ্টকারিতাও চার ধরনের যন্ত্রণা ও যন্ত্রণার কার্যকারণসমূহ এবং চিন্তা ও চিন্তার উপকরণসমূহ[৩৫৩]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন, মাসলিহাত দুই প্রকার : একটি প্রকৃত, যা আনন্দ ও স্বাদময় এবং অপরটি পরোক্ষ, যা মূলত তার কার্যকারণ। কখনো মাসলিহাতের কারণসমূহ অনিষ্টকর হয়ে থাকে। কাজেই এগুলো সম্পর্কে এ কারণে নির্দেশ বা অনুমতি দেয়া হয় না যে, এগুলো অনিষ্টকর। বরং এ কারণে অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে যে, এসব উপকরণ কল্যাণ সাধনে সহায়তা করে থাকে। যেমন চুরি করলে হাত কাটার বিধান প্রাণ সংরক্ষণে সহায়তা দান করে এবং জিহাদে জীবননাশের ঝুঁকি থাকে। অনুরূপভাবে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে বলা যায়, অনিষ্টকর হওয়ার কারণে তা উদ্দেশ্য নয় বরং উপকার করার উপায় হওয়ার কারণে তা উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত। যেমন হত্যা, হাত কাটা, প্রস্তরাঘাতে শাস্তি প্রদান ইত্যাকার দণ্ডবিধি শরিয়াহ প্রণেতাই প্রবর্তন করেছেন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় রূপে এবং এসব দণ্ডবিধিকে প্রকৃত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে পরোক্ষভাবে একই নামে অর্থাৎ, কল্যাণকর বলে অভিহিত করেছেন।

অনিষ্টকারিতা দু'ধরনের। একটি প্রকৃত অর্থাৎ, দুশ্চিন্তা ও কষ্টসমূহ এবং দ্বিতীয়টি পরোক্ষ অর্থাৎ, দুশ্চিন্তা ও কষ্টের কারণসমূহ। ক্ষতিকর বিষয়ের কারণসমূহ কখনো উপকারী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। তখন এগুলো নিষিদ্ধ করে উপকারী হওয়ার কারণে নয় অনিষ্টকর বিষয় বাস্তবায়িত হতে সহযোগিতা করার কারণে নিষিদ্ধ করে থাকে[৩৫৪]।

তৃতীয় স্থানে তিনি বলেছেন : কল্যাণকর ও ক্ষতিকর শব্দ দুটিকে ভালো-মন্দ, উপকার-অপকার, ভালো কাজ-মন্দ কাজ ইত্যাকার বিপরীতধর্মী শব্দের মাধ্যমেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেননা প্রত্যেক উপকারী বস্তু ভালো, কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক এবং প্রত্যেকটি ক্ষতিকর বস্তুই মন্দ, অনিষ্টকারক ও অমঙ্গলজনক। ভালো কাজগুলোকে উপকারী এবং মন্দ কাজগুলোকে অনিষ্টকর আখ্যায়িত করে কুরআনের বহু জায়গায় এর ব্যবহার দেখা যায়[৩৫৫]।

মাসলিহাত বা কল্যাণ সম্পর্কে উপরিউক্ত কথাগুলো বলার পর তিনি এ শব্দটিকে প্রকৃত ও রূপক দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। অনিষ্টকারিতাও কখনো উপকার

---

[৩৫৩] কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২।

[৩৫৪] কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪।

[৩৫৫] কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০।

www.pathagar.com

সাধনের উপায় উপকরণ হয়ে থাকে। আবার কখনো মাসলিহাত ও অনিষ্টকারিতার কারণ হয়ে থাকে। উভয় অবস্থাতে মাসলিহাত শব্দটি রূপক অর্থে প্রযুক্ত হবে। এমতাবস্থায় প্রতিটি আঘাতমূলক কাজ প্রতিশোধমূলক হস্ত কর্তন, জিহাদে প্রাণ নাশের আশংকা এবং সব ধরনের শরিয়াহ সম্মত দণ্ডাদেশ, কাজের অন্বেষণ কিংবা ত্যাগ করা ইত্যাকার কাজগুলো মাসলিহত-এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

ইয্ ইবনে আবদুস সালাম উপকার ও অপকার সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি যথার্থতা উপকার অপকার চিনতে তার বিবেককে আপেক্ষিক বা বিপরীতমুখী বস্তু বা নির্দেশের সামনে পেশ করতে হবে। তার উপর ভিত্তি করে আহকাম রচনা করতে হবে। এ দু'টি কোণ থেকে চিন্তা করলে প্রতিটি আইনই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বা আনুগত্যের আওতাভুক্ত। শুধুমাত্র উপকার কিংবা অপকার হওয়ার উপর নির্ভর করবে না[৩৫৬]।

সফীউদ্দীন মোহাম্মদ আবদুর রহীম হিন্দী রহ.-এর[৩৫৭] অভিমত

তাঁর নেহায়েতুল উসুল নামক ইলমে উসূলের গ্রন্থে মুনাসিব বা যথার্থতার পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার কাজে কার্যকারণ থাকার সমর্থক নয় তারা আহকামের যথার্থতা সম্পর্কে বলেন, জ্ঞানী লোকদের কাজে স্বভাবতঃ অপকারিতা ও অনিষ্টকারিতা থেকে থাকে। আর যারা আল্লাহ তায়ালার কাজে কার্যকারণ থাকার সমর্থক তারা বলেন, মানুষের জন্য যা যথার্থ ও সামঞ্জস্যশীলতা অর্জন ও অব্যাহত রাখার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। অর্জন করার উদ্দেশ্য হলো, কল্যাণ সাধন করা অর্থাৎ, আনন্দ লাভের উপায় উদ্ভাবন করা। আর অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য হলো, অপকারিতা ও অনিষ্টকারিতা তথা এ ধরনের ছিদ্রপথ বন্ধ করতে হবে। এই উভয় ধরনের কাজ অস্তিত্বমূলক।

উপরোক্ত সংজ্ঞাটি আলাইস বিন সালামের সংজ্ঞার প্রায় কাছাকাছি। কেননা উভয় সংজ্ঞাতেই মাসলিহাত বলতে উপভোগ বা উপভোগ করার উপায় উপকরনকে এবং মুফসিদ বা মুদির বলতে কষ্টদায়ক বা কষ্ট পাওয়ার উপায় উপকরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম গাজালীর রহ. তাহসীল ইব্কা শব্দের ব্যবহারে এসংজ্ঞা শরীক বলে

---

[৩৫৬] কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০।

[৩৫৭] দারুল কুতুব কর্তৃক কিতাবটি সংকলিত। সংকলন করেছেন সফিউদ্দীন আল হিন্দী। মৃত্যু ৭১৫ হিজরি। কাশফুয যুনুন গ্রন্থের লেখক অথবা ইমাম আহমদ ইবনে আলী ইবন সা'আতী আল বাগদাদী এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

অনুমিত হচ্ছে। কেননা তিনি তাহসাল শব্দের ব্যাখ্যায় উপকার সাধন এবং ইব্কা শব্দের ব্যাখ্যায় দুষ্টের দমন বলেছেন।

তুফী রহ.-এর[৩৫৮] *মত*

তিনি বলেছেন, যেসব কার্যকারণে উপকার ও অপকার সাধিত হয়ে থাকে সাধারণ পরিভাষায় সেগুলোকেই মাসলিহাত নামে অভিহিত করা যায়। যেমন ব্যবসায়ে হয় মুনাফা। আর যেসসব কার্যকারণ মানুষকে আইনদাতা আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্য সাধন করতে সহায়তা করে সেগুলো শরিয়াহ্র পরিভাষায় মাসলিহাত। এগুলো ইবাদত কিংবা আদত। আইনদাতার উদ্দেশ্যানুযায়ী মাসলিহাত দু'প্রকার। আইনদাতার অধিকার যেমন ইবাদত করা এবং সৃষ্টি জগতের উপকার এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনার কাজ যেমন আদত বা অভ্যাসসমূহ[৩৫৯]।

তুফীর এ সংজ্ঞাটির ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে যথেষ্ট মিল আছে। তাঁর সংজ্ঞায় মাসলিহাত হলো উপকার ও অপকারের জন্যে প্রলুব্ধ করার কার্যকারণ। আর ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর মতে উপকার সাধন করা এবং অপকার দমন করার নাম মাসলিহাত। শরিয়াহ্র দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের উভয়ের মধ্যে ঐক্য আছে। কেননা উভয়ের মতে আইনদাতার উদ্দেশ্য সাধন করাই মাসলিহাত। তবে ইমাম তুফী এটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এ বিভক্তির সূত্র ধরেই আলেমগণ হুকুক অধিকারকে হাক্কুল্লাহ্ আল্লাহ্ তায়ালার অধিকার এবং হুকূকুলইবাদ মানুষের অধিকার এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

উপরোক্ত উসূলবিদ্ আলেমদের বর্ণনার সারমর্ম হলো :

প্রথমত : মাসলিহাত দুটি অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ ও কারণ সূচকের (Causation) প্রেক্ষিতে রূপক অর্থ এই কল্যাণ এবং অকল্যাণের প্রেক্ষিতে প্রকৃত অর্থে। মুফসিদ হলো মাসলিহাত এর বিপরীত। ইয বিন আবদুস্ সালাম এবং তুফী

---

[৩৫৮] নাজমুদ্দীন আল তুফী। তিনি হচ্ছেন আবুর রবী সুলাইমান ইবনে আবদুল কাবী ইবনে আবদুল করিম ইবনে সাঈদ। তুফ শহরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে তিনি হয়েছেন তূফী। তূফ হচ্ছে বাগদাদের মার্মার এলাকার একটি পল্লী। তিনি ইন্তিকাল করেন ৭১৬ হিজরিতে। হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে শিয়া মতবাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিলেন বলে কথিত আছে। উস্তায মুস্তাফা যায়েদের আল মাসলিহাতু ফিত্ তাশরীয়ীল ইসলামি ও নাজমুদ্দীন তূফী, পৃষ্ঠা ৬৭ দেখুন।

[৩৫৯] রিসালাতুত তূফী, দারুল কুতুব সংকলিত রাসায়েল, দলিল নং ৬১২, উসূল পৃষ্ঠা ৪৮, উস্তায মুস্তাফা যায়েদ আল মাসলিহাতু ফিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ৪৮।

www.pathagar.com

প্রমুখের বিবরণে একথা স্পষ্ট হয়েছে। উপকারিতার প্রতি আকৃষ্ট কাজসমূহকে মাসলিহাত বলা রূপক অর্থে এবং উপকারীর বস্তুটিকে মাসলিহাত বলা প্রকৃতিগত অর্থে। মাসলিহাত এর আভিধানিক অর্থের প্রেক্ষিতে এ দুধরনের অর্থের সুযোগ রয়েছে। আমার দৃষ্টিতে মাসলিহাত শব্দটির প্রয়োগ প্রকৃত অর্থে করা ভালো। কেননা মানুষের কাজ স্বতই উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কোনো কোনো আধুনিক[৩৬০] চিন্তাবিদ মাসলিহাত এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে যে, মাসলিহাত কাজের বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা সর্বদা কিংবা অধিকাংশ সময় সবার জন্য কিংবা অধিকাংশের জন্যে সংশোধন কিংবা কল্যাণ সাধন করা যায়। তবে তিনি কাজের বৈশিষ্ট্যের কোনো ব্যাখ্যা দেননি। বৈশিষ্ট্য বলতে কাজের প্রতিক্রিয়া বা ফলাফলও হতে পারে। যেমন বেচা-কেনা করা ক্রেতা-বিক্রেতার কাজ। আর এ কাজের প্রতিক্রিয়া হলো দ্রব্য মূল্যের মালিকানা বিক্রেতার কাছে এবং বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হয়। যেমন- চোরের হাত কাটা একটি কর্ম। আর এ কাজের ফল হলো সম্পদের হেফাজত করা, চুরি করার প্রবণতা রোধ করা। সব ধরনের দণ্ডাদেশ বা শাস্তিই মাসলিহাত রূপে গণ্য নয়। স্থান কাল পাত্র ভেদে তা কল্যাণকররূপে গণ্য হবে। ইবনে আবদুস্ সালামের বর্ণনায় একথা বিধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : অনিষ্টকারিতার দমন মাসলিহাতরূপে গণ্য হয়। ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেছেন, এ নীতিমালা থেকে বিচ্যুত বস্তু অনিষ্টকর। অনিষ্টের দমন করা উপকার। খাওয়ারযমী বলেছেন, মাসলিহাত হলো সৃষ্ট জীবের থেকে অনিষ্টকর বস্তু রহিত করে আইনদাতার উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করা। ইয্ বিন আবদুস সালাম বলেছেন, এখনো কল্যাণের উপকরণ অনিষ্টকর হয়ে থাকে। তখন এগুলো নির্দেশসূচক কিংবা মুবাহরূপে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সফীউদ্দীন হিন্দীর কথারও অনুরূপ অর্থ বুঝা যায়। তিনি বলেছেন, অর্জন ও দমন দ্বারা কল্যাণ সাধন করা যায়। এমনিভাবে অকল্যাণও হয়ে থাকে।

তৃতীয় : সবার মতানুযায়ী মাসলিহাত এর অর্থ হলো আইনদাতার উদ্দেশ্য সাধনে মনোযোগী হওয়া, কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণ সাধন নয়। কারণ মাসলিহাত বা কল্যাণকারিতা শরিয়াহর নীতিমালা এবং চৌহদ্দির প্রেক্ষিতে নির্ণীত হয়ে থাকে। কেননা যদি মানুষের প্রবৃত্তি ও কামনা লক্ষণ অনুযায়ী মাসলিহাত নির্ণীত হয় তাহলে শরিয়াহর মূল কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। কারণ কখনো মদ্যপান, ঘুষ খাওয়া, হত্যা করা মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপকারী বলে প্রতীয়মান হয়। অথচ এরূপ কাজ

---

[৩৬০] যেমন শায়খ মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশূর তার মাকাসিদুশ শারীয়াতিল ইসলামিয়া কিতাবে লিখেছেন। এটি তিউনিস থেকে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

আইনদাতার উদ্দেশ্য বিরোধী। অধিকাংশ সময় এরূপ গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যেই তো আইনের প্রবর্তন হয়েছে। প্রবৃত্তির দাসত্ব করার অনিষ্টকারিতা তো সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

> আর সত্য যদি কখনো এই লোকদের খাহেশের পিছনে পিছনে চলতো তাহলে যমীন ও আসমান এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সব কিছুর ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যেতো[৩৬১]।

কারণ খাহেশাত এক কথায়, বিভিন্ন হয়ে থাকে। খুব কম ক্ষেত্রেই খাহেশাত এক হয়ে থাকে। কোনো কাজ একজনের জন্য মঙ্গলজনক পক্ষান্তরে সেকাজ অন্যের জন্য অনিষ্টকর। আবার সময়ের দরুণ একই কাজ উপকারি ও অপকারি হয়ে থাকে। বস্তুত বস্তুতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতির উপর বস্তুর উপকারিতা ও অপকারিতা নির্ভরশীল।

এ ধরনের পার্থক্য হওয়া প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী মাসলিহাত বিবেচনা না করার ইঙ্গিত। এ কারণেই ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেছেন, মাসলিহাত বলতে আমরা আইনদাতার উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করা বুঝি। তুফী বলেছেন, আইনদাতার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক কার্যকারণ হলো মাসলিহাত। ইয বিন সালাম বলেছেন, শাস্তি প্রদান মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা শাস্তি প্রদান অনিষ্টকর : বরং মাসলিহাত হলো শরিয়াহসম্মত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ।

চতুর্থ : ছোট বড় সব ধরনের উপকারিতা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ৫টি মৌল উদ্দেশ্যের মাধ্যমে সাধিত হয়ে থাকে। ৫টি উদ্দেশ্য হলো : দ্বীন, প্রাণ, জ্ঞান, বংশ ও সম্পদ। এসব উদ্দেশ্য আইনদাতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর যেসব উদ্দেশ্য আইনদাতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় তা শরিয়াহসম্মত কল্যাণ নয়, যদিও মানুষের দৃষ্টিতে সেটা কল্যাণকর। এ কারণেই ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেছেন, সব ধরনের যথার্থতা উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। যে নির্দেশ বা কাজ, উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা যথার্থ বলে গৃহীত হতে পারে না[৩৬২]। মোটকথা যে কাজ শরিয়াহ বা আইনদাতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং যা মানুষের

[৩৬১] সূরা আল ম'মিনূন, ৭১ আয়াত।

[৩৬২] শিকাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৩।

www.pathagar.com

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে সার্থক করে তোলে তাই মাসলিহাত বা কল্যাণকর।

শরিয়াহসম্মত কল্যাণের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি মানব মনের ইচ্ছা পূরণে সহায়তা দানকারী কাজই মাসলিহাত বা উপকারী বলে গণ্য। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, আইনদাতার উদ্দেশ্য সাধনকারী কাজ মাসলিহাত। এ কারণে শরিয়াহ সম্মত কল্যাণের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা উচিত যাতে অপরাপর কল্যাণের সাথে এর পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

১ম বৈশিষ্ট্য : মাসলিহাত বা উপকারিতার উৎস শরিয়াহর হিদায়াত মানব প্রবৃত্তি কিংবা শুধুমাত্র জ্ঞান নয়। কেননা মানব জ্ঞান খণ্ডিত, অপূর্ণাঙ্গ। মানুষ স্থানকালের আজ্ঞাবহ। ইচ্ছা, বাসনা-কামনা, স্বার্থপরতা, ষড়রিপু, সুকৃতি ইত্যাকার দোষগুণ থেকে মানুষ মুক্ত নয়। সে অতীত-বর্তমান সম্বন্ধে অজ্ঞ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরো অজ্ঞ। সুতরাং সে ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়। যে অজ্ঞ, মূর্খ, অসহায় তার কোন কলা-কৌশল যথার্থ হতে পারে না। অতএব মানুষের জন্যে প্রয়োজন বিলায়াত বা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য কিংবা ওহায়া বা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত প্রণালী। বিলায়াত ও ওহায়ার মূর্ত প্রতীক হলো শরিয়াহর হিদায়াত। শরিয়াহর বিবেচনা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত প্রণালী বাদ দিয়ে উপকারিতার একটি স্তরও হ্রাস করার অধিকার মানুষের নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ

> আর সে ব্যক্তি ছাড়া অধিক গোমরাহ কে হবে যে আল্লাহ তায়ালার হিদায়াত ব্যতীত শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে[৩৬৩]।

উপরোক্ত ধারণা ইয্ বিন আবদুস সালামের আহকামের রীতিসমূহের বিরোধী নয়। তাঁর চিন্তাপ্রসূত নীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বড় বড় কল্যাণকর ও অকল্যাণকর বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় জ্ঞানের মাধ্যমে। একথা প্রত্যেক জ্ঞানীর কাছে স্পষ্ট। শরিয়াহ ভিত্তিক আইন অবতীর্ণের আগে মানুষ তার স্বীয় জ্ঞানের মাধ্যমে সীমিত পর্যায়ে কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ দূর করতে সক্ষম হচ্ছিল। দুটি কল্যাণকর কাজের

---

[৩৬৩] সুরা আল কাসাস।

www.pathagar.com

মধ্যে আপেক্ষিক হারে অধিকতর কল্যাণকর কাজকে প্রাধান্য দেয়া এবং দুটি অনিষ্টকর কাজের মধ্যে অধিকতর মন্দ কাজকে প্রত্যাখ্যান করার বুদ্ধিভিত্তিক সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। তিনি আরো বলেছেন : জ্ঞানীগণ উপরিউক্ত ব্যাপারে একমত। অনুরূপভাবে শরিয়াহও হত্যা লুঠতরাজ না করা, জান-মাল সংরক্ষণ করা, উত্তম কথা ও কাজ গ্রহণ ও সম্পন্ন করার ব্যাপারে একমত[৩৬৪]। এরূপ ভালো কাজ সমর্থন করা এবং মন্দ কাজকে অসমর্থন করা এ কথার যুক্তি হতে পারে না যে, মানুষের বিবেক বুদ্ধি কল্যাণকর কাজ বা কথা হৃদয়ঙ্গম করে তা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে সক্ষম। কেননা আমরা সঠিক ও যথার্থ কল্যাণ বলতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকেই বুঝি। আর বুদ্ধিজীবিগণ কেবলমাত্র জাগতিক ও সাময়িক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা নির্ণয় করে থাকে। বস্তুত পারলৌকিক কল্যাণ ও অকল্যাণের পরিচয় পাওয়া কুরআন হাদিস ছাড়া সম্ভব নয়। এমনকি জাগতিক কল্যাণ নির্ণয়েও শরিয়াহ কর্তৃক কল্যাণ নির্ণীত হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন- শিশু কন্যাদের জীবন্ত কবর দেয়ার রীতি। জাহেলী যুগে আরবদের সন্তান হত্যা করার প্রবণতা। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এগুলো অন্যায় ও গর্হিত কাজরূপে চিহ্নিত হলেও এরূপ কাজ করা হতো। এ ধরনের কাজ তথাকথিত বুদ্ধিভিত্তিক কল্যাণকর হলেও কুরআনে এ ধরনের কাজের চরম নিন্দা করা হয়েছে। কারণ শিশু হত্যা সবচেয়ে অপরাধমূলক কাজ। কুরআনে এ সম্পর্ক বলা হয়েছে,

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ

অভাবের আশঙ্কায় তোমরা শিশু হত্যা কর না[৩৬৫]।

আরো বলা হয়েছে,

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

আল্লাহ তায়ালা যে প্রাণী হত্যা নিষেধ করেছেন যথাযথ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না[৩৬৬]।

তবে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সম্মিলিতভাবে যে কথা বলেছেন যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে আমরা সে কথা বুঝতে পারছি না। যদি তা দর্শন হয়ে থাকে তাহলে

---

[৩৬৪] প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫।

[৩৬৫] সুরা আল ইসরা, ৩১ আয়াত।

[৩৬৬] সুরা আল ইসরা, ৩৩ আয়াত।

www.pathagar.com

সব সময়ের জন্যেই বিতর্কিত। আর যদি তা শরিয়াহর ঐকমত্যে হয় এবং তাদ্বারা আসমানী বিধান উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেটাকে আল্লাহ্ তায়ালার বিধানরূপে বিবেচনা করা যায়। এখন এর প্রতিটি অক্ষর অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায় কিংবা নসখ বা রহিতকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ হতে পারে।

বস্তুত কল্যাণসাধন, অকল্যাণ প্রতিরোধ, সাবধান করা, কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট করা ইত্যাকার সুকুমার বৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কথা ও বিজ্ঞজনদের ইশারার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই[৩৬৭]। তবে সার্বিক কল্যাণ নিরূপণের ক্ষেত্রে আমরা একমত নই। কেননা যদি ইহকালীন ও পরকালীন সব ধরনের কল্যাণ নিরূপণ ও সাধন করা সম্ভব হতো তাহলে তো আর শরিয়াহর আগমনের প্রয়োজন হতো না। এমতাবস্থায় শরিয়াহর অবস্থান অনর্থক ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ শরিয়াহদাতা আল্লাহ্ তায়ালার নিরর্থক কাজ করার চিন্তা করাও অন্যায়। আর যদি কেবলমাত্র ইহকালীন সর্ববিধ কল্যাণ নিরূপন ও অর্জনের কথা থাকে, পরকালীন কল্যাণের কোনো ইশারা-ইঙ্গিত না থাকে তাহলে শরিয়াহ অপূর্ণাঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। শরিয়াহর কোনো আলেম এ ধরনের কথা বলেননি। বরং আলেমগণ এ কথায় একমত যে, ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল সমভাবে বিবৃত হয়েছে শরিয়াহর বিধানে। কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ প্রতিরোধের ব্যাপারে শরিয়াহ বিধানের বিকল্প নেই। মানবরচিত বিধান ও চিন্তাপ্রসূত নিয়মাবলী এর সমকক্ষ হতে পারে না। বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী রহ. এ সম্পর্কে বলেছেন, সৃষ্টজীবের ইহকালীন পরকালীন মঙ্গল কিসে নিহিত তার পরিচয় পাই শরিয়াহর বিধানে। আর শরিয়াহর বিধানসহ আল্লাহ তায়ালা নবি রসুলগণকে পাঠিয়েছেন। আক্ল বা বুদ্ধি এক্ষেত্রে গৌণ[৩৬৮]।

ইমাম শাতবী রহ. বলেছেন, একথা স্বভাবতই স্বীকার করা কঠিন যে, আকল অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ মানবিক জ্ঞান সৃষ্টিজীবের ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল-অমঙ্গল বিস্তারিতভাবে নিরূপণ করতে সক্ষম[৩৬৯]।

সার্বিক কল্যাণ নিরূপণ ও অর্জনের কারণ যখন শরিয়াহ ব্যতীত জ্ঞান দ্বারা সম্ভব নয় তখন শরিয়াহর বিধান, যুক্তি, নিয়মাবলী, আইন-কানুনকে উপেক্ষা করে কল্যাণ নিরূপণের ভিত্তি রচনা করা যথাযথ নয়। কেননা যদি বিবরণের উৎস ভুল করা জ্ঞানের জন্য বৈধ হয় তাহলে জ্ঞান দ্বারা শরিয়াহকে বাতিল করা ঠিক হবে। অথচ

---

[৩৬৭] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৪ ।

[৩৬৮] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১৩০।

[৩৬৯] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮।

www.pathagar.com

এটা অসম্ভব। কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে, শরিয়াহর অর্থ হলো মানবমণ্ডলীর কথা, কাজ ও আকীদা-বিশ্বাসের একটি সীমা রেখা চিহ্নিত করা। এটা একটি ব্যাপক নীতি নির্ধারণী প্রতীক। যদি বুদ্ধি বৃত্তির ভিত্তিতে একটি সীমারেখা লঙ্ঘন করা ঠিক হয় তাহলে সবগুলো সীমা রেখা অতিক্রম করাও ঠিক হবে। কেন না এক জাতীয় বস্তুর সবগুলোর উপর একই নীতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। একটি সীমা অতিক্রম করা প্রকারান্তরে নীতি বাতিল করারই নামান্তর। একটি নীতি বাতিল হওয়া ঠিক হলে গোটা নীতি বাতিল হওয়াও ঠিক হবে। এগুলো বাতিল করা ঠিক হওয়ার ব্যাপারে কেউ তা প্রকাশ করেন নি[৩৭০]।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

ইসলামি বিধানের দৃষ্টিতে কল্যাণ-অকল্যাণ শুধুমাত্র জাগতিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্থান-কালের সাথে সম্পৃক্ত, যাতে মানুষ তার কর্মের ফল লাভ করতে পারে। অর্থাৎ কল্যাণ হলো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার উপায় বা মাধ্যম। প্রত্যেক ফলপ্রসূ কাজ তার সম্পাদনকারীর জন্যে উপকারী হয়ে থাকে, যদিও উপকারিতার আগমন বিলম্বে ঘটে। বস্তুত এরূপ কাজই নেক আমল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। কাজের ফললাভ কয়েক ঘন্টা বিলম্বিত হতে পারে (যেমন দিন) আবার এক সপ্তাহ কিংবা মাস বছরও হতে পারে। এর পরিধি লম্বা হয়ে মৃত্যুর পরেও হতে পারে যা আখেরাতে পাওয়া নামে অভিহিত।

এমন প্রত্যেক কাজকে কল্যাণকর হওয়ার আওতায় আনা যায় যা কাজ সম্পাদনকারীর দৃঢ় ধারণা অনুযায়ী ভবিষ্যতের জন্যে উপকারী ও ফলপ্রসু। এটি ভবিষ্যত উপকারিতার সাথে সম্পৃক্ত থাকা পর্যন্তই মনে করা হবে। অবশ্য মানব মনের দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের ধারণা বিভিন্নরূপ। এক শ্রেণির লোক বস্তুবাদী। তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী নয়। তাদের দৃষ্টিতে মানুষের মৃত্যুর সাথে তার ভবিষ্যতের সমাপ্তি ঘটে। আরেক শ্রেণির লোক পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস তাদেরকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন ব্যাপী বিস্তীর্ণ সময়ে দুনিয়ায় ভালো এবং আখেরাতে সুদৃঢ় কামনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এঁরা প্রথম শ্রেণির বিপরীত আকীদা পোষণকারী। প্রথম শ্রেণির লোকগণ প্রভুর সাথে পুনর্মিলনে বিশ্বাসী নয়। তাদের দৃষ্টিশক্তি এই নশ্বর পৃথিবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ[৩৭১]।

---

[৩৭০] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮।

[৩৭১] ড. মুহাম্মাদ সাঈদ, রামাদান আলবুতী, দাওয়াবিতুল মাসলিহাহ, ৪৫১।

www.pathagar.com

ভবিষ্যত জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনের বেশ কয়েকটি দলিল রয়েছে। এই দলিলে ভবিষ্যত জীবনের ভাল কাজের সুফল পাওয়ার কথা উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الآخِرَةَ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর।[৩৭২] তিনি আরো বলেছেন :

وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا

আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্যে যথাযথ চেষ্টা সাধানা করে এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে[৩৭৩]। বস্তুত দুনিয়া আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র এবং পরীক্ষাগার। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

আমি তোমাদের মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[৩৭৪]।

তিনি আরো বলেন :

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

পূণ্যময় তিনি যার হাতে রাজত্ব। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল[৩৭৫]।

আল্লাহ তায়ালার এসব বাণীতে শরিয়তে ইলাহীর বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশ ঘটেছে। বিবেকবানদের ঐকমত্য হল, শরিয়াহর বিধানাবলীর অনুশীলনে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ অবধারিত হয়ে থাকে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নিদর্শন স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শুধু আলামতের উপর ভিত্তি করে কোন কাজকে কল্যাণকর হিসেবে গণ্য করা গবেষকের জন্য সঠিক

---

[৩৭২] সুরা আল কাসাস, ৭৭ আয়াত।

[৩৭৩] সুরা আল ইসরা, ১৯ আয়াত।

[৩৭৪] সুরা আল আম্বিয়া, ৩৫ আয়াত।

[৩৭৫] সুরা আল মুলক, ১-২ আয়াত।

www.pathagar.com

নয়। শরিয়াহ প্রবর্তনের সীমা লক্ষ্য উদ্দেশ্য একথারই ইঙ্গিত বহন করে[৩৭৬]। কেননা শরিয়াহর কার্যাবলী শুধুমাত্র নিজের আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং লক্ষ্য উদ্দেশ্যের নিরিখে কার্যাবলী নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

কথাগুলো উত্তর আধুনিক যুগের বস্তুতান্ত্রিকদের অভিমতের খেলাফ। তাদের মতে একজন লোক নিজেকে পার্থিব ভোগ বিলাস থেকে নিরাশ করে সম্মান অর্জন করতে পারে। নিজেকে নিরাশ করার কারণ পার্থিব জীবনে অন্যকে ভোগ করার সুবিধা দান কিংবা অন্য যে কোন কারণে হোক না কেন এটা কিন্তু সম্মান অর্জনের যথার্থ উপকরণ নয়। এধরনের কাজ করা যদিও মানব ক্ষমতার আওতাধীন বলে প্রতীয়মান হয় কিন্ত নিঃসন্দেহে এরূপ করা ঠিক নয়।

তাদের দৃষ্টিতে কল্যাণকামিতার পরিধি নশ্বর জগতের সীমা অতিক্রম করে না। কেননা কল্যাণ পার্থিব জীবনে ব্যক্তি বা সমষ্টির সাথে জড়িত। একারণে শরিয়াহর সমস্ত কল্যাণ এবং বস্তুবাদীদের কল্যাণের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। কোন বস্তু অর্জিত হলে সেটাকে আপাত সফলতা বলা যেতে পারে কিন্তু সঠিক নয়। কেননা লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করা শরিয়াহর বিধান মতে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, কালেমার বাণী সমুচ্চ করা এবং আখেরাতের সওয়াবের আশা হতে হবে। কিন্তু জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তির মনে যদি বাহাদুরী প্রদর্শন, সুনাম অর্জন, পার্থিব সার্থকতা লাভের আকাংখা লুক্কায়িত থাকে তাহলে এটা শরিয়াহ সম্মত কল্যাণকর কাজরূপে স্বীকৃত হবে না।

পরিতাপের বিষয় হল, বস্তুান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সারা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। এমনকি মুসলিম সন্তানগণও এর শিকার। কল্যাণকর কাজ, সাহসিকতা, উৎসর্গকরণ ইত্যাকার সব কাজে আজকের মুসলিম সমাজ আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যের বিপরীত লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আজকে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, মানবতা এবং অনুরূপ কাজের উদ্দেশ্যে যারা কাজ করছে শরিয়াহ এধরনের কাজ সম্পাদনের জন্যে বিধান দিয়েছে এবং এধরনের কাজ করার জন্যে নানাভাবে নির্দেশ বা উৎসাহ দিয়েছে। তবে মুখ্য উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ বা আনুগত্য করা। আর এগুলো হবে স্বাভাবিক বা প্রাসংগিক।

এ বৈশিষ্ট্যটিকে দু'ভাবে বিন্যস্ত করা যায় :

প্রথমত : গোটা বিধি-বদ্ধ আহকাম কার্যকারণ সম্মত এবং কার্যকরণবিহীন- এরূপ বিভিন্নতায় প্রবর্তিত। ইবাদত এবং লেন-দেন সম্পর্কিত প্রতিটি বিধান শরিয়াহ

---

[৩৭৬] দাওয়াবিতুল মাসলিহাহ, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮ ।

www.pathagar.com

সম্মত হওয়ায় এগুলোর অনুসরণ করা অত্যাবশ্যকীয় যদিও অনুসরণীয় বিধানের কল্যাণ সম্পর্কে আমরা অবগত নই।

দ্বিতীয়ত : শরিয়াহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ হুকুক বা অধিকারকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। হুকুকুল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ বা মানুষের অধিকার। অবশ্য এতে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা মানুষের অধিকার বলতে শরিয়াহ প্রবর্তক কর্তৃক অধিকারে কিছুটা ছাড় দেয়ার অনুমতি প্রদান বুঝায়। আর আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্যের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া তাঁর জন্যে সঠিক নয়। শরিয়াহ প্রবর্তকের অনুমতি প্রদান বিধিবদ্ধ আইনরূপে গণ্য হয়ে থাকে। অধিকন্তু এ বিভক্তিতে শুধুমাত্র জোরালো ও হালকাভাবে বিধান পালন করার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, সমগ্র বিধান জরুরিভাবে মানুষের অনুসরণীয় এবং পারলৌকিক প্রতিদানের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা ও মালিকরূপে গণ্য করে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে হুকুকুল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে[৩৭৭]।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

শরিয়াহ সম্মত কল্যাণ পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ কল্যাণ বস্তুগত ভোগ বিলাসের মধ্যেও সীমিত নয়। যেমন বস্তুবাদী ও ভোগবাদী লোকগণ সীমিত অভিজ্ঞতার আলোকে জাগতিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে কল্যাণকর মনে করে থাকে। এটা সন্দেহাতীত যে, পরিলক্ষিত স্বাভাবিক মানবতা পৃথিবীতে বৃহৎ শক্তির প্রতি আকর্ষিত হয়ে থাকে। আকর্ষণের উদ্দেশ্য হলো নৈকট্য ও আনুগত্যের জন্যে ইবাদত ও বিনয়ের সাথে মানবতাকে দায়বদ্ধ করা। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কোন পার্থিব অর্জনের উপায়রূপে নয়। প্রবৃত্তিকে বশীভূত করতে মানুষকে সাহায্য করার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার উদাহরণ এভাবেই বাস্তবায়িত করা যায়। কেননা, গোটা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হুকুম। এবং এর প্রয়োজনীয়াতাকে স্থবিরতা ও গোঁড়ামী থেকে উদ্ধার করতঃ সচল ও বেগবান করা শরিয়াহর নির্দেশ[৩৭৮]।

মানবতার আত্মশুদ্ধি ইমান এবং এমন ধরনের ইবাদতের অনুকণের মাধ্যমে অর্জন করা যায় যা একজন ইমানদার লোক আখেরাতের সওয়াবের প্রতি দৃষ্টি দিয়েও স্বাদ আস্বাদ ও কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে। কেননা কতিপয় সাধক

---

[৩৭৭] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১১ এবং দাওয়াবিতুল মাসলিহাত, পৃষ্ঠা ৫১।

[৩৭৮] দাওয়াবিতুল মাসলিহাহ, পৃষ্ঠা ৫৪।

www.pathagar.com

মনে করে এ সওয়াব পার্থিব ভোগ-উপভোগের প্রাথমিক স্তর। কারণ তাদের মতে দুনিয়া ও আখেরাত একই সময়ে দু'টি স্তর।

মুমিনের এরূপ আস্বাদ এবং অতিন্দ্রীয় কল্যাণ কামনা পূর্ণ ইমানের পরিচায়ক। যেমন রসুল সা. বলেছেন :

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

আমার দেয়া জীবন বিধানে আত্মোৎসর্গকরণ ব্যতীত তোমাদের কেউ পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না[৩৭৯]।

এ প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়িত করার জন্যে শরিয়াহর অনেক নির্দেশ রয়েছে। তন্মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিধিবদ্ধ প্রয়োজনগুলো হলো মুসলমানদের হিফাযাত করা এবং ক্রোধ-মোহ, মদ-মাৎসর্ষ, হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদি মানসিক রোগের চিকিসা করা এবং ইবাদত ও কল্যাণকর কাজ করা। এ ধরনের কাজ আত্মা পবিত্রকরণ ও বিশুদ্ধ করণে খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

যে স্বীয় আত্মাকে বিশুদ্ধ করেছে সে সফলকাম হয়েছে আর যে আত্মাকে কলঙ্কিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে[৩৮০]।

তিনি আরো বলেছেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

নিশ্চয়ই সফলকাম হবে সে যে পরিশুদ্ধ হয়; এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর সালাত আদায় করে[৩৮১]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন :

---

[৩৭৯] দাইলামি এটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং কানযুল হাকায়েক গ্রন্থে মানাবী এটি উল্লেখ করেছেন।

[৩৮০] সুরা আশ্ শামস, ৯-১০ আয়াত।

[৩৮১] সুরা আল আ'লা, ১৪-১৫ আয়াত।

www.pathagar.com

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রসুল। যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন। আর তোমাদের শিক্ষা দিবেন কিতাব ও তার তত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দিবেন এমন বিষয় যা তোমরা কখনো জানতে না[৩৮২]।

এতে প্রতীয়মান হল যে, শরিয়াহ সম্মত কল্যাণ জাগতিক ভোগ বিলাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সীমানা বিশ্ব জগতের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত।

চর্তুথ বৈশিষ্ট্য

ধর্মীয় কল্যাণ পারলৌকিক কল্যাণের ভিত্তি এবং উপক্রমনিকা স্বরূপ। সুতরাং এ কল্যাণের হেফাজাত করা এবং পারলৌকিক কল্যাণের বিপরীত উৎস পরিহার করে চলা বাঞ্ছনীয়। এ চিন্তাধারা আইন, সমাজ, ও বস্তুবাদী লোকদের চিন্তার বিপরীত। তারা কখনো সাধারণ লোকদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে ফায়দা হাসিল করে। আবার কখনো রাজনীতি ও সামাজিকতার বুলি আওড়িয়ে ফায়দা লুটে। মধ্য যুগের ইউরোপীয় পুরোহিতগণের মধ্যে এ ধরনের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের ছদ্মাবরণে কতিপয় ব্যক্তিকেও পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে এরূপ তৎপরতায় লিপ্ত দেখা যায়। এখন সচেতন লোকের কাছে এ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। এ দ্বারা আমরা অবগত হতে পারি যে, সর্বোচ্চ ও ব্যাপক কল্যাণের ভিত্তিতেই ধর্মীয় কল্যাণ শরিয়াহ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। এ কারণেই কতিপয় মানুষের জীবন নাশ হওয়া সত্বেও জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। একজন মর্দে মুজাহিদ সঠিক নিরাপত্তা ও চিরন্তন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার পথে সংগ্রাম করে আত্মোৎসর্গ করার আন্তরিক কামনা পোষণ করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

---

[৩৮২] সুরা আল বাকারাহ, ১৫১ আয়াত।

www.pathagar.com

যে আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষাত লাভ করার ইচ্ছা করে তার নেক আমল তথা কল্যাণকর কাজ করা উচিত এবং তার রবের ইবাদত বা আনুগত্য করতে গিয়ে কাউকে তাঁর সাথে শরীক করা যাবে না[৩৮৩]।

এই বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ৩টি দিক আছে

১. কল্যাণকামিতার চারণভূমি শরিয়াহ্র ছত্রছায়ায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এগুলোর ভিত্তি হল শরিয়াহ্ বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক ঐকমত্য ভিত্তিক উপায়-উপকরণ। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার আহকামের সাথে পরিচয়ের জন্যে নস্ (দলিল), ইজমা (ঐকমত্য), কিয়াস (অনুমান) এবং এজাতীয় পন্থা প্রয়োজন। এসব পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য হলো গোটা কল্যাণের উপর শরিয়াহ্র ধর্মীয় কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া।

২. কাজের কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করে কাজটির প্রভাব ও পরিণতির উপর। অবশ্য পরিণতি নির্ণয় করতে হবে শরিয়াহ্ প্রবর্তক কর্তৃক প্রবর্তিত ইজাব ও নুদুব (স্বীকৃত ও গৃহীত) হারাম, মকরুহ, মুবাহ (অনুমোদিত) ইত্যাদির প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে। অন্যথায় যে কোন কল্যাণকর কাজ ধর্মের অংশরূপে পরিগণিত হয়ে যাবে।

৩. কেবলমাত্র স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা কিংবা পরীক্ষিত ও যুক্তিগ্রাহ্য যাচাইয়ের আলোকে মানুষের কল্যাণ নির্ণয় করা কিংবা বিচ্ছিন্ন করা ঠিক নয়। সুতরাং সমাজ বিজ্ঞানী কিংবা সফল ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করা সঠিক হবে না। যেমন একজন ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে সূদ ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক উন্নতিকে গতিশীল ও চলমান রাখার একটি অপরিহার্য উপকরণ। এমনিভাবে একজন সমাজবিদ গোপন বিদ্রোহ বিস্তার লাভ রোধ করার যুক্তিতে নষ্টামীকে বৈধ মনে করে থাকে। তথাকথিত উদারপন্থী ও মনস্তাত্ত্বিক লোকেরা উদারতা ও সংস্কৃতির খোঁড়া যুক্তিতে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলা মেশাকে সঠিক ভাবে। উপরোক্ত কাজগুলো শরিয়াহ্র দৃষ্টিতে অনিষ্টকর কাজ। এভাবে কতিপয় আইনজ্ঞ কিসাস এবং ব্যভিচারের হদ রহিত করার প্রয়াসী। আবার কিছু চিকিৎসক শূকরের মাংস অপবিত্র না হওয়া এবং মদ বিশেষ রোগের প্রতিষেধক ও শীত প্রতিরোধক হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন।

---

[৩৮৩] সুরা আল কাহাফ, ১১০ আয়াত।

www.pathagar.com

শরিয়াহর দৃষ্টিতে উপরোক্ত অভিমতগুলোর কোন মূল্য নেই। এরূপ অভিমতের উপর নির্ভর করা সঠিক হলে শরিয়াহ মানবরচিত জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা, অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনার মধ্যে আবদ্ধ থাকতো। কল্যাণকর হলেই ধর্মীয় বিধানের অংশ বিশেষ হওয়ার চিন্তা আদৌ ঠিক নয়। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষের জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা, ধ্যান-ধারণায় রয়েছে বিভিন্নতা।

একথার সমর্থনে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

আল্লাহ তায়ালার হিদায়াত ছাড়া যে প্রবৃত্তির পূজা করে তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে[৩৮৪]।

তিনি আরো বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

হে ইমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহ তায়ালার এবং আনুগত্য কর রসুল ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা আল্লাহ তায়ালা ও রসুল সা.-এর নির্দেশের দিকে ফিরিয়ে দাও; যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপন কর। এরূপ করাই উত্তম এবং সবচেয়ে সুন্দর ফায়সালা[৩৮৫]।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার বিধান তথা শরিয়াহ বহির্ভূত কল্যাণ অন্বেষণ করা ভ্রষ্টতা বৈকি। ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধনে কুরআন, হাদিস, রসুল ও শরিয়াহর বিধানের ওপর নির্ভর করা উচিত। একথার অর্থ আদৌ এ নয় যে, শরিয়াহ বিধান মুক্ত চিন্তার অন্তরায় বরং প্রকৃত ব্যাপার এর বিপরীত। কেননা শরিয়াহর বিধান চিন্তা ও গবেষণার জন্যে বিভিন্নভাবে নানা প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করেছে। তবে চিন্তার ক্ষেত্রে কুরআন, হাদিস ও সুন্নাতে যেসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিবৃত হয়েছে সেগুলোকে সামনে রাখার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যাতে চিন্তার ব্যাপ্তি প্রবৃত্তি, রিপুর তাড়না

[৩৮৪] সুরা আল কাসাস, ৫০ আয়াত।

[৩৮৫] সুরা আন নিসা, ৫৯ আয়াত।

www.pathagar.com

ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পায়। একারণে আল্লাহর রসুল সা. বলেন : তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ এদু'টিকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আদৌ পথভ্রষ্ট হবে না। (বস্তু দু'টো হল) আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং রসুল সা.-এর সুন্নাত[৩৮৬]।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

> আল্লাহ তায়ালা যাকে আলো দান করেন না তার জন্য কোনো আলো নেই[৩৮৭]।

ইজতিহাদ বা মুক্তচিন্তার অর্গল সব চিন্তাবিদদের জন্যে খোলা রয়েছে। অনিবার্য শর্তের আলোকে যে কোন সচেতন লোকের অবাধে গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

---

[৩৮৬] মুসলিম ও তিরমিযী, আত্ তাজলি জামে লিল উসূল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭ দেখুন।

[৩৮৭] সুরা আন নূর- আয়াত : ৪০।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়

বিভিন্নতার আলোকে কল্যাণের প্রকারভেদ

উসূলবিদগণ কল্যাণ বিভিন্নমুখী হওয়ার কারণে তাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারা কখনো হুকুম বিধিবদ্ধ হওয়ার যথাযথ বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করেছেন। আবার কখনো শরিয়াহ্ প্রবর্তকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেছেন। এভাবে তাঁরা কল্যাণকে প্রধানত নিম্নোক্ত ৪টি ভাগে ভাগ করেছেন :

১. শরিয়াহ্ প্রবর্তকের আস্থা ও আস্থাহীনতার দৃষ্টিতে

২. স্থায়িত্ব এবং রেওয়াজ ও অভ্যাসজনিত কারণে পরিবর্তনের দৃষ্টিতে

৩. কল্যাণের শক্তি এবং বিশ্বের স্থায়িত্ব ও কল্যাণকামিতার প্রয়োজনীয়তার পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গি।

৪. কল্যাণ সাধারণ ও অসাধারণ হওয়ার প্রেক্ষিতে।

প্রথম প্রকার

অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে কল্যাণের যে বৈশিষ্ট্য যথার্থ মনে করেছেন, যা রহিত করেছেন এবং যে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মৌন রয়েছেন সেগুলোকে নীতি নির্ধারকগণ তদনুযায়ী ভাগ করেছেন। বস্তুত কল্যাণের বিভক্তি বৈশিষ্ট্যের বিভক্তির অধীন। এ পর্যায়ে ইমাম গাজ্জালী রহ. ও শাতবীর অভিমত ব্যক্ত করা প্রনিধান যোগ্য। আলেমগণের বিভিন্ন পরিভাষার আলোকে নয় বরং বাস্তবতার আলোকে কল্যাণের প্রকারভেদ সম্পর্কে এখানে আমরা এ দু'ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। তাদের মতে কল্যাণ যে ধরনেরই হোক না কেন সেটা কিন্তু দলিল নয় এবং সেটা বলারও বিষয় নয়। আলোচনায় এ ইঙ্গিত রয়েছে :

ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর অভিমত[৩৮৮]

যথার্থ বা উপযোগিতায় সঠিক অর্থ ও বিভক্তি সম্বন্ধে তিনি শিফাউল আলীল, আল মুসতাসফা, আল মানকুল নামীয় গ্রন্থত্রয়ে যে মত ব্যক্ত করেছেন তার সার-সংক্ষেপ হলো, কল্যাণের কারণসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করাই যথার্থ হওয়ার তাৎপর্য। আর যা

---

[৩৮৮] আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল গাযালী আত তূসী আশ শাফেয়ী (মৃত্যু ৫০৫ হিজরি) ইসলামের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের উপর তিনি বহুবিধ মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং এ ছাড়াও ইসলামের আরো বিভিন্ন বিষয়ে প্রণীত তাঁর বহু কিতাব মৌলিক চিন্তার প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলামের গগণচুম্বী খ্যাতির অধিকারী আলেমগণের অন্যতম।

www.pathagar.com

উপকার সাধন করে অথবা অপকার রোধ করে তাই কল্যাণকর। উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে এমন প্রত্যেকটি কাজকেই মূলত যথার্থ বা উপযোগী হওয়ার আওতায় গণ্য করা যায়। আর যা উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক নয় তাকে যথোপযোগী বলা যায় না।

মূলের সাক্ষ্য হিসেবে এই যথার্থতা আবার চার ভাগে বিভক্ত :

১. মূল এবং শাখার সাক্ষ্য একত্রিকরণের যথার্থতা। এ ধরনের যথার্থতা কিয়াসপন্থীদের ঐকমত্যে দলিলরূপে গণ্য। উসূলবিদগণ এটাকে কার্যকর বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছেন।

২. মূলের সাক্ষ্য কিন্তু মোলায়েম নয়। এরূপ যথার্থতা কারো মতেই দলিল নয়। এটাকে রহিত বৈশিষ্ট্য বলা হয়।

৩. যে যথার্থতা সাক্ষ্য দেয় যে, তার নির্দিষ্ট ভিত্তি আছে, তবে সেটা অচেনা যা একত্র করা যায় না। অর্থাৎ মূল ভিত্তির সাক্ষ্য যথাযথ গুণবিশিষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়। এরূপ যথার্থতা গরীব বা অজানা নামে অভিহিত। এ ধরনের যথার্থতা কারণ হিসেবে চিহ্নিত হওয়া ঠিক কি ঠিক নয় এনিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৪. ملائم একত্রিকরণের উপযোগিতা এর নির্দিষ্ট ভিত্তি হওয়ার কোন সাক্ষ নেই। এক সম্প্রদায়ের মতে এ ধরনের যথার্থতা (মুরসাল) প্রেরিত কল্যাণ নামে অভিহিত। অন্যদের মতে এটা মুরসাল দলিলরূপে আখ্যায়িত।

আল মুসতাসফা গ্রন্থে আছে, শরিয়াহর সাক্ষ্য হিসেবে কল্যাণ তিন প্রকার :

(ক) আস্থাভাজনরূপে শরিয়াহর সাক্ষ্যদান (খ) আস্থাহীনভাবে সাক্ষ্যদান সা. আস্থা বা অনাস্থা কোনভাবেই সাক্ষ্য না দেয়া। আস্থাসহ সাক্ষ্য দান দলিলরূপে গণ্য হবে। এরূপ সাক্ষ্য মূলত অনুমান বা কিয়াস নির্ভর। যেমন প্রত্যেক নেশাযুক্ত খাদ্য বা পানীয় হারাম হওয়ার নির্দেশ। মদ হারাম হওয়ার নির্দেশের উপর নির্ভর করে বলা হয়েছে। কেননা মদ যেমন হিতাহিত জ্ঞানকে হরণ করে তেমনি নেশাযুক্ত খাদ্য বা পানীয় এরূপ ক্রিয়া করে থাকে। জ্ঞানশূণ্য না হওয়ার কল্যাণে এক্ষেত্রে নেশাগ্রস্ত খাদ্য হারাম হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ : আন্দালুসের কোন বাদশাহ রমজান মাসের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে তৎকালীণ আলেমগণ লাগাতার দু'মাস রোজা রাখার ফতওয়া দেন। বাদশাহ আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তাকে দাসমুক্ত করার ফতওয়া না দিয়ে এরূপ নির্দেশ দেয়ায় তিনি তা পালন করতে অস্বীকার করেন।

www.pathagar.com

যদি তাকে দাসমুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হতো তাহলে এটা তার জন্য সহজ হতো। কিংবা বলা যায়, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মুকাবিলায় দাসমুক্ত করার বিধানকে সে হেয় জ্ঞান করতো। সুতরাং এক্ষেত্রে সিয়াম সাধনার মধ্যে রোযা ভঙ্গকারীকে বিরত রাখার কল্যাণ নিহীত আছে। এ ধরনের কথা অগ্রহণযোগ্য এবং যে কল্যাণ দলিল দ্বারা প্রমাণিত তার খেলাফ। সর্বোপরি অবস্থার পরিবর্তনের কারণে গোটা আইন-কানুন পরিবর্তনের একটি অধ্যায় রহিত হবে।

তৃতীয় প্রকারের ব্যস্তবায়ন : গবেষণা ও চিন্তা-সাধনার উপর নির্ভরশীল[৩৮৯]। এটাই ইমাম গাযালী বর্ণিত কথার সারসংক্ষেপ। তিনি আরো বলেছেন, যে কল্যাণ বর্ণিত প্রকারের মধ্যে নয় (অবশ্য তা সম্ভব নয়) তা কখনো শরিয়াহ সম্মত হবে না। এবং তার উপর ভিত্তি করে কোন নির্দেশ প্রবর্তিত হতে পারে না। কেননা এ ধরনের কল্যাণ মস্তিষ্ক প্রসূত। নিছক মস্তিষ্ক প্রসূত কল্যাণ শরিয়াহর মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। আমাদের কথা হলো কোন বিষয়কে অযথা শরিয়াহর রূপ দেয়া নিয়ে। অন্যথায় নব নব আবিষ্কারে দিগন্ত ছাড়িয়ে যাওয়া সৃষ্টিকর্তার উপর আসফালন নয়[৩৯০]।

ইমাম শাতবীর র. অভিমত[৩৯১]

আহকামের সাথে জড়িত উপযোগিতার অর্থ তিন ধরনের :

১. শরিয়াহ গ্রহণ করার সাক্ষ্য প্রদান করা। এ ধরনের উপযোগিতা বিনা দ্বিধায় গ্রহণীয় ও করণীয়। অন্যথায় যথার্থতা ও শরিয়াহর মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। যেমন জনজীবন রক্ষার্থে কিসাসের প্রয়োগ।

২. শরিয়াহ রদ করার সাক্ষ্য প্রদান। এরূপ উপযোগিতাকে গ্রহণ করার উপায় নেই। কেননা এ ধরনের যথার্থতায় স্বয়ং আহকাম বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। অবশ্য বস্তুবাদী লোকগণের কাছে শরিয়াহর কোনো বালাই নেই। আমরা দেখব, শরিয়াহ সম্মত আহকাম বাস্তবায়নে যদি এই যথার্থতা হয়

---

৩৮৯ আল মুসতাসফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৪, মাকতাবা আযহার সঙ্কলিত আল মানখুল, পৃষ্ঠা ৭৭।

৩৯০ শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১৩২।

৩৯১ তিনি হচ্ছেন, লাখমের ইবরাহীম ইবনে মূসা ইবনে মুহাম্মদ, তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ৭৯০ হিজরি সনে তাঁর মৃত্যু হয়। উসূলে ফিকহে তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে আল মাওয়াফিকাত। এটি চার খণ্ডে বিভক্ত। দ্বিতীয় গ্রন্থ আল ই'তিসাম, তিন খণ্ডে বিভক্ত। দেখুন আল ই'লাম, নাইলুল ইবতিহাজ বিতাতরীযিদ দীবাজ, ৪৬-২০ পৃষ্ঠা এবং আল ইলাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭১।

www.pathagar.com

তাহলে তাই আমরা গ্রহণ করব। আমাদের মতে মানব কল্যাণ সাধনে ও অকল্যাণ রোধে যা সহায়ক তা শরিয়াহ সম্মত। এরূপ কল্যাণ সাধন কেবলমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এ অর্থে যদি উপযোগিতা সাক্ষ্য প্রদান না করে তাহলে কারো মতেই সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। যা বিশেষ সাক্ষ্যদানে মৌন। অর্থাৎ গ্রহণে ও বর্জনে সাক্ষ্য না দেয়া। এরূপ যথার্থতা দু'প্রকার :

ক. এ অর্থের সাথে একমত হয়ে (নস্) দলিল রদ করা। যেমন সিয়ামের ব্যাপারে হত্যা না করার কারণ দর্শানো মূলত ব্যাপারটি উদ্দেশ্যের বিপরীত। অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে দলিল রদ করা হয় নি। এ ধরনের কারণ সম্পর্কে প্রবর্তিত শরীয়তে অবশ্যিকভাবে কোন ওয়াদা দেয়া হয় নি এবং কোন নির্ভরগযোগ্য বস্তু পাওয়া যেতে পারে এমন চিন্তা করে ছাড়ও দেয়া হয় নি। সুতরাং তদ্বারা কারণ দর্শানো এবং এর উপর ভিত্তি করে হুকুম বর্তানো সকলের মতে ঠিক নয়। এরূপ দর্শনকে শরিয়াহর রূপ দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. শরিয়াহ প্রয়োগ ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেয়া। অর্থাৎ সমার্থবোধক এমন কোন বস্তু পাওয়া যা শরিয়াহ প্রবর্তকের কাছে নির্দিষ্ট দলিল ছাড়াই গ্রহণযোগ্য। এ ধরনের উপযোগিতা (مصالح المرسلة) ধারাবাহিক কল্যাণ নামে অভিহিত[৩৯২]।

مناسب উপযোগিতা ও যথার্থতা সম্পর্কে এ হলো ইমাম শাতবীর র. বক্তব্য। ইমাম গাজ্জালী রহ. ও ইমাম শাতবীর বক্তব্যর মধ্যে আকারগত পার্থক্য ছাড়া তেমন কোন প্রভেদ নেই। ইমাম গাজ্জালী রহ. এটাকে ৪ ভাগ করেছেন। আর ইমাম শাতবী র. করেছেন ৩ ভাগ। তিনি আবার তৃতীয় প্রকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন যা মূলত একই ধরনের। মোটকথা ইমাম শাতবী রহ. আল গাজ্জালী রহ.কে অনুসরণ করেছেন। সম্ভবত : তিনি আল গাজ্জালী রহ.-এর দর্শণ প্রভাবিত হয়েছেন।

কল্যাণ ইজমা কিংবা নস্ দ্বারা নির্ভরযোগ্য হোক অথবা দলিলের চাহিদার খেলাফ হোক উভয় ধরনের মধ্যে ১ম প্রকার কল্যাণ গ্রহণযোগ্য এবং ২য় প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে অগ্রহণযোগ্য। আর মৌন বিষয়ে যদি শাখা প্রশাখার উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয় তাহলে এটা কিয়াসের পর্যায় হবে। আর যদি প্রশাখার উদাহরণ পাওয়া না যায় বরং এরূপ কাজ সাধারণ প্রচলন ও রসম রেওয়াজের অন্তর্ভুক্ত তাহলে সেটা

[৩৯২] আল ই'তিসাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৭, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯।

www.pathagar.com

হবে مصالح المرسلة কিংবা استدلال المرسل এ দু'টি ধরন চিন্তা-চেতনা ও গবেষণার ক্ষেত্র। আর চিন্তার জগতে মত পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক।

মাসলিহাত গ্রহণীয় বর্জনীয় ও মৌন হওয়ার যে প্রকারভেদ তা প্রায় সকল সেরা উসূলবিদগণ স্বীকার করেছেন[৩৯৩]।

মোহাম্মাদ মোস্তফা শালাবি তার প্রণীত গ্রন্থ তা'লীলুল আহকামে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন মাসলিহাতকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত দলিল ভিত্তিক মাসলিহাত যা গ্রহণীয়। দ্বিতীয়ত দলিল বিরোধী যা বর্জনীয়। তৃতীয়ত যাকে আমরা গ্রহণীয় বা বর্জনীয় কোনটাই বলতে পারি না। বরং অপর শরিয়াহ দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক বলা যায়। তবে সেটাকে রহিত করা না করার ভিন্ন প্রসঙ্গ। মাযহাবের বিভিন্নতায় কিংবা এর মুকাবিলায় দলিলের প্রকারভেদের উপর এটি নির্ভর করে[৩৯৪]। এ অভিমতটি একথার ইঙ্গিত বহন করে যে, তিনি ব্যবহারিক ব্যাপারে মাসলিহাতকে দলিলরূপে গণ্য করেন। অন্যথায় একথা বলা ঠিক নয় যে, অপর শরিয়াহ দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক। মাসলিহাত যখন সামগ্রিকভাবে শরিয়াহ দলিলরূপে প্রমাণিত হয়- একথাটিও তার সহায়ক। ইবাদত ও ইবাদত জাতীয় সূক্ষ্ম ব্যাপারে এ ধরনের বিভক্তি ঠিক হবে। কেননা সকলেই একথায় একমত যে, মাসলিহাতের নিজস্ব কোন কার্যকারিতা নেই বরং নস কিংবা ইজমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই তা ওয়াজিব হয়। কোন কল্পনাশ্রিত ব্যক্তি যখন ধারণা করে যে, মাসলিহাত ইবাদাতের মধ্যে দলিল বা ইজমার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধক হলে তা শুরুতেই রহিত হওয়া উচিত। যেমন নৌ সফরে কষ্ট না হলে নামায কসর করার প্রথা রহিতকরণ কিংবা একজন শিল্পীর জন্য নামায পূর্ণ করা কষ্টকর হওয়ায় কসর করা।

২য় প্রকার : স্থায়ীত্ব ও পরিবর্তনের আলোকে কল্যাণ কামনা

আলেমগণ স্থান-কাল-পাত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ব্যক্তির পরিবর্তনের আলোকে কল্যাণকামিতাকে পরিবর্তন করেন না। যেমন, হত্যা, ব্যভিচার, চুরি, হারাম হওয়া। আসলে এসব প্রকারভেদ এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, শরিয়াহর এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলোকে কল্যাণের কথা সামনে রেখে অপরিবর্তিত ও

---

[৩৯৩] জামউল জাওয়ামে ওয়া শারাহুহু, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৬, তানকীহুল ফুসূল ফিল উসূল, পৃষ্ঠা ১৭০, নিবরাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ২৯৮ এবং শালাবীর তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ২৮৫ ।

[৩৯৪] মুহাম্মাদ শালাবী, তা'লীলুল আহাকম, পৃষ্ঠা ২৮১।

www.pathagar.com

পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে একত্র করা হয়েছে। প্রচলন ও অভ্যাসের আওতাভূক্ত কল্যাণের পরিবর্তনে আহকামেরও পরিবর্তন করার বিশদ বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। বস্তুত এরূপ প্রকারভেদ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় প্রকার : শক্তি বিশ্বের প্রয়োজনের পরিমাণ এবং গ্রহণের সামর্থরূপে কল্যাণকামিতা

উসূলবিদ আলেমগণ জরুরি প্রয়োজনীয়তা এবং অনুমোদন হিসেবে কল্যাণকে ভাগ করেছেন। কেননা শরিয়াহর আহকামের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের বিভিন্নতায় কল্যাণ প্রকৃতিগত, ব্যক্তিগত ও বিশ্বব্যাপী হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য যদি জরুরি এবং মৌলিক হয় তাহলে সেটা ৫টি বিষয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে। কোন পদ্ধতি বা নীতি সেটাকে অস্বীকার করতে পারবে না। ৫টি বিষয় হল, দ্বীন, ফিতনা, জ্ঞান, বংশ এবং সম্পদের হেফাজত করা। এই ৫টি বস্তুর সংরক্ষণ সবচেয়ে জরুরি উদ্দেশ্য এবং এগুলো উপযুক্ততা বা যথার্থতার সর্বোচ্চ স্তর।

উদ্দেশ্য মৌলিক না হয়ে যদি জরুরি উদ্দেশ্যের অধীন হয় এবং উদ্দেশ্যটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় হয় তাহলে এটা হবে দ্বিতীয় স্তর। জরুরি বিষয়ের অতিরিক্ত না হলে তা হবে অনুমোদিত বা সৌন্দর্যবর্ধক। ইবাদত ও অভ্যাসে উত্তম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। এটা হল তৃতীয় স্তর।

কল্যাণকামিতাকে উপরোক্ত ৩টি স্তরে বিন্যাস করা নতুন সংযোজন কিংবা ইজতিহাদ। কেননা সাহাবী, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনদের যুগে এরূপ বিন্যাস ছিল না। বর্তমান যুগের আলেমগণ আধুনিক বিশ্বের পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে এ বিন্যাস করেছেন। বস্তুত ফিকহের অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে প্রতিটি শাখা-প্রশাখাগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই ৩টি স্তরের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং তাদের বিন্যাসিত স্তরগুলো ভিত্তিহীন বা মনগড়া নয়। বরং দলিল ভিত্তিক ও যুক্তিগ্রাহ্য।

সম্ভবত ইমামুল হারামাইন র. তাঁর আল বুরহান গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রথম কলম ধরেছেন। তিনি এটাকে শক্তির দিক থেকে ৫ ভাগে বিভক্ত করেছেন। আমরাও ৫ ভাগে ভাগ করছি।

১. কল্যাণের বুদ্ধিবৃত্তিক অর্থ। তাই মৌলিক অর্থ। এ অর্থ সাধারণ ও বিশিষ্ট সব জরুরি নির্দেশকে শামিল করেছে। যেমন অযথা রক্তারক্তি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিয়াস ওয়াজিব হওয়া। বিকল্পে জরিমানা করা। একজন সচেতন লোক এ বিধানের মূল অর্থের চিন্তা করলে স্বতই সে বলবে রক্ত

www.pathagar.com

প্রবাহিত থেকে রক্ষা করাই এর মূল অর্থ আর এটা বুদ্ধিবৃত্তিকও বটে। এক্ষেত্রে বেচা-কেনার নির্দেশটিও তুলে ধরা যায়। মানুষ তার অধীনস্থ বস্তুর এরূপ বিনিময় না করলে জন-জীবন স্তব্ধ হয়ে যেতো। সুতরাং এর প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট। মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রয়োজনের তাকিদে রকমারী পন্যের বেচা-কেনার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এটি ৫টি উদাহরণের একটি।

২. যা সাধারণ প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। জরুরি সীমায় নয়। ইজারা সহীহ হওয়া এর উদাহরণ। ইজারা বেচা-কেনার ব্যাপারে আবশ্যকীয় জরুরির পর্যায়ে নয় তবে কখনো কারো জন্যে প্রায়াজনীয় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ইজারা দেয়ার প্রবণতা না থাকলে লোকটির ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে ইজারা তার জন্যে জরুরি পর্যায়ে শামিল হয়ে যায়। অন্যান্য অনুরূপ বস্তুকে এর উপর অনুমান করা যেতে পারে। দেশের অধীনে একটি প্রদেশের ন্যায় তার হুকুমের সাথে সম্পর্কিত।

৩. বিশেষ জরুরি এবং সাধারণ প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত নয়। তবে মহত্ব সাধন কিংবা বৈপরিত্ব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিকশিত হতে পারে। এ প্রকারকে পবিত্রতা লাভ এবং অপবিত্রতা দূরীকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট করা ঠিক হবে।

৪. প্রয়োজনীয়তা বা জরুরি কোনটারই দলিল না থাকা। এদ্বারা কোন বস্তুর অনুমোদন লাভ হয়। তৃতীয় ধারার কিয়াস থেকে সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। আর ৪র্থ ধারাটি ৩য় প্রকার থেকে আলাদা স্তরের।

৫. প্রকৃত অর্থ অনুসৃত হওয়া প্রকাশ না পাওয়া এবং গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কিংবা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে উৎসাহিত না করা। এ ধরনের চিত্র খুবই কম। আংশিক অর্থ অনুসৃত হওয়া অসম্ভব হলেও সার্বিকভাবে এসম্পর্কে ধারণা করা অসম্ভব নয়। যেমন সার্বক্ষণিক কায়িক ইবাদত। উপকারী লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত না হলেও একথা বলা অবান্তর হবে না যে, সদা সর্বদা ওযীফা পাঠ পাঠকের মনে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদায় বিশ্বাসের নবজাগরণ সৃষ্টি করে; অধিকন্তু আল্লাহ তায়ালার যিকর যিকরকারীকে গর্হিত ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

যথার্থ শক্তি ও স্বয়ংসম্পন্নতার দৃষ্টিতে যে অর্থ বহন করে তার বিভক্তি সম্পর্কে এ হলো ইমামুল হারামাইনের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি সবল থেকে দুর্বলের দিকে ক্রমবিন্যাস

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি ইমাম শাতবীর মত বা পরিপূর্ণতা বা সম্পূরকের কথা বলেন নি। ইমামুল হারামাইনের যোগ্য শিষ্য ইমাম গাজ্জালী রহ. এটাকে তিন ভাগে বিভক্ত করত : পরিপূর্ণতা ও সম্পূরকের কথা উল্লেখিত বিভক্তিতে প্রকাশ করেন। এ কথা তাঁর শিফাউল গালীল গ্রন্থে উল্লেখ আছে[৩৯৫]। তিনি দেখিয়েছেন যে, সমগ্র উপযোগিতা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্ণীত হয়ে থাকে। তবে উদ্দেশ্যবলী তার মর্যাদা অনুসারে কয়েক ভাগে বিভক্ত।

১. যে উদ্দেশ্য জরুরি পর্যয়ের; এর সাথে পরিপূর্ণতা ও সম্পূরক অবস্থা সম্পৃক্ত হতে পারে।

২. যা প্রয়োজনীয়তার পর্যায়ে এর সাথে পরিপূর্ণতা ও সম্পূরকের সাদৃস্যশীল বস্তু সংযোজিত হতে পারে।

৩. যা সহজ ও অবকাশ পর্যায়ের জরুরি বা প্রয়োজনীয়তার পর্যায়ে নয় তবে এ পর্যায়ের উদ্দেশ্য দ্বারা মানুষ সহজে ও উদার উপকার পেতে পারে। সহজ ও উদার শরিয়াহর এটাও একটি উদ্দেশ্য। সুন্দর ও সম্পূরক আহকাম এ পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

স্তরের বিভিন্নতার কারণে যথার্থতা বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে জরুরি পর্যায়ের উপযোগিতা সর্বোচ্চ স্তরের। যেমন আত্মার সংরক্ষণ করা। এটা শরিয়াহ প্রবর্তকের উদ্দেশ্য অধিকন্তু এরূপ করা সৃষ্টির জন্যে জরুরি। শরীয়তে এ ধরনের নির্দেশ যদি প্রবর্তিত না হতো তাহলেও এরূপ করা বিবেকপ্রসূত ও বুদ্ধিবৃত্তিক হত। বস্তুত শরিয়াহর বিধান মানব মনের ভাল-মন্দের অধীন নয়। বরং মানব মনের ভাল মন্দ শরিয়াহর বিধানানুসারে নির্ণীত হওয়া উচিত। অবশ্য শরিয়াহর বিধানাবলী বিবেক বা জ্ঞান বহির্ভূত নয়। যেমন কিসাসের বিধানের কথা বলা যায়। শাস্তি বা জরিমানার চেয়ে কিসাস জঘন্য হলেও অযথা খুনাখুনি থেকে এটা একটি রক্ষা কবচের ন্যায় প্রতিষেধক। তেমনি চুরি করার অপরাধে হাত কাটার প্রথা, দাঁতের বদলে দাঁত, নাকের বদলে নাক, হত্যার বদলে হত্যা ইত্যকার প্রথাগুলো চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, রাহাজানী ইত্যাদি ধরনের অপকর্ম দমনে সহায়ক হওয়া শরিয়াহ সম্মত এবং বিবেকপ্রসূত।

২য় স্তরের উদ্দেশ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন বাল্য বিবাহের ওলী নিয়োগ করা কিংবা বাল্য বিবাহের ভার নিজের উপর অর্পণ করা। এ স্তরটি আগের স্তরের তুলনায় কিছুটা কম পরিদৃষ্ট হয়। আর ৩য় স্তরটি জরুরি বা প্রয়োজনের পর্যায়ভূক্ত নয়। এ স্তরটি মানুষের ইবাদত, আচার-আচরণ, লেন-দেন ইত্যাকার ব্যবহারিক জীবনের উদার ব্যাপকতা ও সৎ চরিত্র হওয়ার সহায়ক।

---

[৩৯৫] শিফাউল গালীল, ড. আমাদ উবাইদ কাবিসির অনুসন্ধান, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৮।

www.pathagar.com

ইমাম গাজ্জালী রহ. যথার্থতাকে শক্তি, প্রকাশ, দুর্বলতা, গোপনীয়তার আলোকে যে ভাগ করেছেন এহলো তার সারসংক্ষেপ। এই বিভক্তি এবং তাঁর ওস্তাদের বিভক্তির মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। সংশ্লিষ্টতা, সবল-দুর্বল কিংবা প্রাসঙ্গিকতার কারণে কোথাও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হলেও লক্ষ্য উদ্দেশ্য মূলত এক ও অভিন্ন।

আল ইয বিন আবদুস সালাম কল্যাণ এবং কল্যাণের প্রকার ভেদ সম্পর্কে কাওয়ায়েদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম গ্রন্থে বিভিন্নতার কারণে বেশি পরিমাণের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইমাম গাজ্জালী রহ. এবং তাঁর উস্তাদের ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে কল্যাণ-অকল্যাণের ভাগ করেছেন। তাঁর মতে গোটা লৌকিকতা বিভিন্ন কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণসমূহ প্রকৃতপক্ষে স্বকীয়ভাবে কল্যাণ সাধন কিংবা অকল্যাণ রোধে সক্ষম নয় বরং কারণ প্রকৃতপক্ষে আহকামের জন্যে সময়সীমা এবং উপযোগিতামাত্র। আসলে আল্লাহ তায়ালাই কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ দূরীকরণের একমাত্র অধিকারী। তিনি পরকালীন কল্যাণ- যেমন সালাত ও সওম এবং ইহকালীন কল্যাণ- যেমন যাকাত, সাদকাহ, কুরবানীর- দৃষ্টিতে এটাকে ভাগ করেছেন। তিনি আহকামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কিছু আহকামের তাৎপর্য স্পষ্ট। আর কিছু আহকামের তাৎপর্য স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট তাৎপর্যসূচক আহকামকে তিনি تعبد অর্থাৎ বিনা যুক্তিতে মেনে নেয়ার পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ধরনের আহকাম অনুসরণ করা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে পালন করার প্রতীক। কেননা যুক্তি বহির্ভূত হুকুম পালনে কোন সময়ে বিবেক সঙ্গ দিতে চায় না। এমতাবস্থায় এ ধরনের নির্দেশ মান্য করা নিঃশর্ত আনুগত্যের পরিচায়ক। যেমন সালাতের রাকাআত সংখ্যার বিভিন্নতা বিনা যুক্তিতে মানতে হয়। তারপর তিনি কল্যাণ ও অকল্যাণকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

১. যা অর্জন করা ওয়াজিব। অপরদিকে অকল্যাণ পরিহার করা ওয়াজিব। কল্যাণ অবধারিত, অকল্যাণ নিশ্চিত মনে যথাক্রমে গ্রহণ ও বর্জন প্রত্যেক বিধানেই অপরিহার্য। যেমন হত্যা, ব্যভিচার, ক্রোধ।
২. যে কল্যাণ সাধন অনুমোদিত। এ ব্যাপারে শরিয়াহর নির্দেশ বিভিন্ন ধরনের। কারো মতে তা গ্রহণীয় কারো দৃষ্টিতে ত্যাগ করা ভাল।
৩. যা মুবাহ পর্যায়ের কিংবা শরিয়াহর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। মোটকথা কল্যাণ জরুরি, প্রয়োজনীয়তা এবং শোভাবর্ধক এই তিনভাগে বিভক্ত।

আল্লামা শাতবী র.

এ বিষয়ে ইমাম শাতবী র. তাঁর গ্রন্থ আল মুআফিকাত এ চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি উদ্দেশ্যাবলীকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। ১. শরিয়াহর উদ্বোধনী উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

যেমন মানব জীবন সার্থক ও সফল করার ব্যবস্থাপনা, ২. মানুষ শরিয়াহর বক্তব্য বুঝতে সক্ষম পরবর্তীতে তৈরি এমন উদ্দেশ্য, ৩. শর্ত সাপেক্ষ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শর্তাবলী আরোপ করে যে উদ্দেশ্য তৈরি করা হয়েছে, ৪. আনুগত্য বা মানার জন্যে তৈরি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এ ধরনের উদ্দেশ্যের তাৎপর্য হলো মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত রাখা এবং শরিয়াহর আহকামের গতির মধ্যে আবদ্ধ রাখা। কেননা মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যেমন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন তেমনি বাধ্যকরণ নীতিও আরোপ করেছেন যাতে সে ইচ্ছা শক্তির সুবাদে পশুত্বের পর্যায়ে পৌছে না যায়। আল্লাহ তায়ালা মানুষের ইহকালীন-পরকালীন মঙ্গলের জন্যে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই ব্যবস্থাপনার অনুবর্তনে মানুষ তার জীবনকে ধন্য করতে পারবে। মানুষ যেন আল্লাহ তায়ালার দেয়া এই ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের আশ্রয় দাতা। এই আশ্রয় লাভ করাই শরিয়াহ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য।

কল্যাণ, যথার্থতা, প্রয়োজনীয়তা উপরোল্লিখিত বিভিন্ন চিন্তাবিদদের বিভিন্ন বিভক্তিগুলোর পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই এগুলোকে ভাগ করা হোক না কেন, সবগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মূলত এক ও অভিন্ন। শুধুমাত্র প্রক্রিয়া ও উদ্ভাবনে পার্থক্য।

প্রথম প্রকার : মৌলিক লক্ষ্যসমূহ

এবার মৌলিক উদ্দেশ্য এবং মৌলিক ও পরিপূর্ণ উদ্দেশ্যের অধীনত উদ্দেশ্যের উদাহরণের মাধ্যমে পেশ করতে প্রবৃত্ত হলাম যাতে দু'য়ের মধ্যে তফাত নির্ণয় করা যায়।

প্রথমত : দ্বীনের হেফাযত করা। দেশ, জাতি ও ব্যক্তি জীবনের স্থায়িত্ব ও শান্তি এই দ্বীনের হেফাযতের উপর নির্ভর করে। ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হল দ্বীনের সংরক্ষণ করা। মানুষ শরিয়াহর গন্ডী ছেড়ে আকীদা, বিশ্বাস ও জীবন ব্যবস্থা সংরক্ষণ করতে গেলে তা সঠিক ও যথার্থ অর্থে সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। এ কারণে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁরি উপর ইমান আনা ওয়াজিব এবং কুফরী করা হারাম করেছেন। জিহাদ শরিয়াহ সম্মত করা, আল্লাহ্ তায়ালার কালেমা বুলন্দ করা, গোমরাহীর জন্যে শাস্তি দেয়া এবং মুরতাদ ও আল্লাহদ্রোহীকে হত্যা করা এ কারণেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ শরিয়াহ্ সম্মত জিহাদ হলো মৌলিক। এটা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে বিদআত ও ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে। জিহাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ দ্বীনের সংরক্ষণ করা হলো এর পরিপূর্ণতা। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত : প্রাণের সংরক্ষণ। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনী শক্তির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অক্ষুন্ন রাখা। এই জীবনী শক্তি দিয়ে মানুষ খেলাফতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে সম্মানিতরূপে আসীন হতে পারে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা পূর্বক হত্যা করা হারাম করেছেন। আর হত্যা কাণ্ড ঘটে গেলে শাস্তি স্বরূপ কিসাস প্রথা প্রণয়ন করেছেন। যাতে মানুষ হারাম কাজ থেকে বিরত থেকে আত্মার হেফাযত করে। প্রয়োজন বোধে মুক্তিপণ হিসেবে হত্যা করা স্বতন্ত্র কথা। অর্থাৎ এ ধরনের হত্যা প্রকারান্তরে খুনাখুনি ও রক্ত প্রবাহ বন্ধ করার যথার্থ সহায়ক। কিসাস বিধান প্রবর্তিত হওয়ার দরুণ খুনাখুনি কাজটি এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হিসেবে গণ্য হবে। আর এটা মৌলিক জরুরির অধীন ও সম্পূরক। এ ব্যাপারেও পরবর্তীতে বিশদ বিবরণ আসবে।

তৃতীয়ত : জ্ঞান বুদ্ধির হেফাযত করা। এই জ্ঞানই মানুষকে পশু থেকে পার্থক্য করে। মানুষ দায়িত্বশীল হওয়ার ভিত আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এই বিবেক। বিবেককে জাগ্রত ও গতিশীল করার জন্যে মুসলমান নর নারীর জন্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে তা সংরক্ষণ করা ওয়াজিব করা হয়েছে। বিবেক ও জ্ঞান হরণকারী মদ, শরাব এবং প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিষ গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছে এবং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে শাস্তি দেয়ার বিধান রয়েছে। এখানে যে পরিমাণ নেশাগ্রস্ত হয়ে জ্ঞান লোপ পাওয়া হারাম হওয়া মৌলিক আর যা জ্ঞানকে হরণ করে না তা হারাম হওয়া শরিয়াহ প্রবর্তকের বৃহত্তম উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিবেকের সংরক্ষণ করা তার সম্পূরক। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থত : বংশ সংরক্ষণ করা। বংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে মানুষ পশুর পর্যয়ে পৌছে যেতো। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণ, হুড়াহুড়ি, হানাহানিতে মানব বংশ ব্যাহত হতো যা বিপর্যের অন্যতম কারণ। একারণে আল্লাহ তায়ালা বিবাহ প্রথা হালাল করেন এবং ব্যভিচার হারাম করেছেন। ব্যভিচার হারাম করা এ ক্ষেত্রে মৌলিক আর এটাই মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতায় পৌছে দেয়ার জন্যে অবৈধভাবে অপরিচিত বেগানা মহিলার প্রতি নজর দেয়া হারাম করা হয়েছে। এমনিভাবে কামোদ্দীপক সব ধরনের তৎপরতা বংশ রক্ষার অধিকতর সতর্কতার জন্যে হারাম করা হয়েছে।

পঞ্চমত : সম্পদের হেফাযত করা। সম্পদ জীবনী শক্তির স্নায়ু, সমাজ দেহের গোপন রহস্য এবং জাতি ও মানব সম্প্রদায়ের জাগতিক শক্তির অবতারণারূপে পরিগণিত। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সম্পদ উপার্জন, ব্যয় ও প্রবৃদ্ধির প্রকিয়াকে বৈধ করেছেন। পক্ষান্তরে চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাকের পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জন করা হারাম করেছেন। এ ধরনের কুকর্মের পরিণতিতে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। মানুষের সম্পদ অবৈধ ও বাতিল প্রক্রিয়ায় ভক্ষণ করা হারাম করা হয়েছে। এরূপ কাজের জন্যে জরিমানা করার ব্যবস্থা রয়েছে। মূল লক্ষ্যে পৌছার জন্যে এ ধরনের সবকাজ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

উপরোক্ত ৫টি বিষয়ের সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এগুলোর সব কিংবা একটিরও অনুপস্থিতিতে মানব জীবন ক্ষুন্ন, ব্যাহত এমনকি ধ্বংস হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ফলে পারলৌকিক জীবনের চিরন্তন নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার : প্রয়োজনসমূহ

এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে এটা একান্ত জরুরি পর্যায়ের নয়। মূল এবং মূলের অধীন এরূপ দু'ভাগে এই প্রয়োজনীয়তা বিভক্ত। বাল্য বিবাহের ব্যাপারে ওলী বা অভিভাবক নিয়োগ করা এ ধরনের প্রয়োজনীয়তার উদাহরণ। কেননা এ ক্ষেত্রে ওলী নিয়োগ করে বাল্যবিবাহ প্রদান করা খুবই জরুরি বা প্রয়োজন ছিল না। তবে কখনো সন্তানের ভবিষ্যত মঙ্গলের কথা চিন্তা করে অভিভাবকের বিবাহের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। বিবাহের সমতা রক্ষার শর্তগুলো উপস্থিত থাকলে এবং মঙ্গল হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অভিভাবকের বাল্য বিবাহের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ পদক্ষেপ নেয়া একারণেই শরিয়াহসম্মত। পক্ষান্তরে শৈশাবস্থায় লালন-পালন করা, শিশুর জন্যে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনা, ইজারা দেয়া ইত্যাকার কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে ওকীল নিয়োগ করা বিধিবদ্ধ নয়। কেননা এ ধরনের কাজ অতীব জরুরি পর্যায়ের।

বেচা-কেনা করা, ইজারা দেয়া, ঋণ দেয়া, বর্গা ইত্যাকার মুয়ামালার ব্যাপারে বিনিময় চুক্তি করা এ ধরনের উদাহরণ। ইমামুল হারামাইনের মতে বেচা-কেনার প্রথা এমন ধরনের যে, যে জাতীয় দ্রব্যের প্রয়োজন তা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। বেচা-কেনার প্রক্রিয়া-বিধিবদ্ধ না হলে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হতো। কেননা সব মানুষই মানুষের প্রয়োজনীয় সমুদয় বস্তুর যোগান দিতে সক্ষম নয়। আর যদি তা সম্ভব হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা জরুরি পর্যায়ে পড়বে না। এমতাবস্থায় কেউ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাধ্যও হবে না[৩৯৬]।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় চুক্তিপত্র জরুরি পর্যায়ের। আবার কতিপয় চুক্তি প্রয়োজনীয় স্তরের। ইজারা প্রথা কখনো জরুরি পর্যায়ের হয়ে থাকে। যেমন শিশুদের দুধ খাওয়ানোর ইজারা কিংবা ক্ষতিকর গরম-ঠাণ্ডা থেকে রেহাই পাওয়ার

---

[৩৯৬] আল বুরহান, মাকতাবা আযহারে লিখিত ৯১৩ নম্বর পাণ্ডুলিপি।

www.pathagar.com

জন্যে ঘর ইজারা নেয়া- দেয়া অথবা সম্পদ বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষাকল্পে লোক নিয়োগ করা। অবশ্য এসব পদ্ধতি স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করার সুযোগ না থাকা অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। এ প্রকারের পরিপূর্ণতা ও সম্পূরকের স্থলাভিষিক্ত হলো, বিবাহে সমতা (কুফু) রক্ষা করা এবং মহরে মিসাল বা অনুরূপ মহর ধার্য করা, ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর জিনিষ নিষিদ্ধ করা[৩৯৭]।

তৃতীয় প্রকার : অনুমোদিত বা শোভনীয়

যা জরুরি পর্যায়ের নয়। প্রয়োজনের স্তরেও নয়। বরং তা শোভনীয়, অনুমোদিত কিংবা বিস্তীর্ণ। ইবাদত, অভ্যাস এবং লেন-দেনের ব্যাপারে এগুলো উত্তম ও সহজ এবং সুন্দর অভ্যাস ও উত্তম চরিত্র গঠনে এ ধরনের নীতি সহায়ক। পবিত্রতার আহকাম, অঙ্গসমূহের আচ্ছাদন, অভ্যাস ও লেন-দেনের আদব, অপব্যয় না করার নির্দেশ এবং যুদ্ধে অঙ্গছেদন, নারী, শিশু, বৃদ্ধদেরকে হত্যা না করা ইত্যাদি তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ। এগুলোর বাস্তবায়ন আল্লাহ্ তায়ালা বিধিবদ্ধ করেছেন।

শোভনীয় প্রকার আবার দু'ধরনের

১. যা বিধিবদ্ধ নীতির সাথে সাঙ্ঘর্ষিক নয়। যেমন অশ্লীলতা, বেহায়াপনা হারাম হওয়া। এ ধরনের কর্মকাণ্ড স্বভাবসিদ্ধভাবে অবৈধ ও ঘৃণিত। আবার শরিয়াহ সম্মত ভাবেও হারাম। বস্তুত এরূপ ঘৃণিত তৎপরতা পরিহার করা উন্নত চরিত্র গঠন ও ভাল অভ্যাস গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। এমনিভাবে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য দেয়ার উপযোগিতা হরণ করা। এই উপযোগিতা হরণ করা জরুরি কিংবা প্রয়োজনীয় নয়। কেননা ন্যায়ের ক্ষেত্রে যাচাই করলে তার সাক্ষ্য তার রায় ও বর্ণনা হিসেবেই গ্রহণীয় হবে। সাক্ষ্যদান ব্যাপারটি খুবই উচ্চাঙ্গের ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর সাথে কেবল ক্রীতদাসের সম্পৃক্তির চেয়ে একজন স্বাধীন ও মুক্ত মনের অধিকারী লোকের সম্পৃক্ততা অধিকতর শোভনীয়।

২. যা নির্ভরযোগ্য নিয়ম নীতির সাথে সাংঘর্ষিক যেমন দাসত্বের বন্ধন থেকে নিস্কৃতি লাভের মুক্তিপণ। ব্যাপারটি দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে মানবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং কল্যাণের সংযোজন হওয়ার কারণে যদিও মুসতাহসান বা শোভাবর্ধক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সম্পদের বিনিময়ে মানুষ বিক্রির নামান্তর যা অমানবিক[৩৯৮]।

---

[৩৯৭] শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮।

[৩৯৮] শিফাউল গালীল পৃষ্ঠা ১০৮, জামউল জাওয়ামে খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৪, তানকীহুল ফুসূল পৃষ্ঠা ১৭০, নিবরাসুল উকূল পৃষ্ঠা ২৮২, শালাবী, তা'লীলুল আহকাম পৃষ্ঠা ২৮৪, আল মাওয়াফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪।

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ উসূলবিদগণ এ ধরনের প্রক্রিয়াকে পূর্ণাঙ্গ বলেন না এবং জরুরি ও প্রয়োজনীয় মত আসল ও আমলের অধীন বলে ভাগও করেন না। তবে তুলনামুলকভাবে এটাকে ভাগ করা সম্ভব। যেমন : তাহারাত বা পবিত্রতা লাভ করার আমল। আর যার মূল নেই, যেমন তাহারাতের জন্যে অনুমোদিত কার্যাবলী[৩৯৯]। এ প্রকারের বৈশিষ্ট্য হলো, কল্পনাপ্রসূত ও সন্তোষজনক উপযোগিতার প্রধান্য দেয়া। কল্যাণকামিতা উপরোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই বিভক্তি প্রকৃত নয় বরং আপেক্ষিক। যেমন ক্রয়-বিক্রয় করা কখনো জরুরি, কখনো প্রয়োজনীয়, কখনো শোভনীয়।

শক্তির দিক থেকে কল্যাণকামিতার বিন্যাসমূলক প্রকার

এ বিভক্তি ৩টি সূচীতে বিন্যস্ত

১. শরিয়াহ প্রবর্তকের উদ্দেশ্যানুযায়ী কল্যাণ সাধন বিন্যস্ত করা। বিন্যাসের স্তর হলো, প্রথমে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, ২য় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ এবং ৩য় স্তরের কল্যাণকামিতা হলো আহসান বা শোভনীয় প্রকারের। জরুরি, প্রয়োজন এবং জুরুরী বা প্রয়োজন না হওয়া এই তিন অবস্থার আলোকে উপরোক্ত বিন্যাস করা হয়েছে। জরুরি বিষয়াবলী স্বতই এক স্তরের নয়। কিছু আছে অতীব জরুরি, কিছু সাধারণ জরুরি। জরুরি হওয়া মূল কারণের উপর নির্ভর করে। মৌলিকতায় ত্রুটি থাকলে কোন পূর্ণাঙ্গ বস্তু স্বতই পূর্ণরূপে গণ্য হবে না। কেননা মৌলিকতায় ত্রুটিতে অনুসৃত বস্তুও ত্রুটিপূর্ণ সহজেই অনুমেয়। যেমন বিশেষ্য ছাড়া বিশেষণ বা গুণের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বস্তুত মৌলিক কল্যাণ লাভ পূর্ণ কল্যাণ লাভের চেয়ে উত্তম। কেননা দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। যেমন আত্মার সংরক্ষণ মূল লক্ষ্য। আর মানবতার হেফাযত করা মোস্তাহ্সান। এই মানবতা রক্ষাকল্পে অপবিত্রতাকে হারাম করা হয়েছে এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন-যাপন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় পবিত্রতা রক্ষাসহ আত্মার হেফাযত করাই হবে সর্বোত্তম জরুরি স্তর।

   এমনিভাবে ক্রয় বিক্রয় করার মূল কারণ জরুরি। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও ত্রুটি না থাকা মৌলিকতার পূর্ণতা। মৌলিকতায় ধোকা বা ত্রুটি না থাকার শর্ত আরোপ করলে বেচা-কেনার দ্বারই রুদ্ধ করতে হত। অনুরূপভাবে ইজারা জরুরি কিংবা প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে বিনিময়কৃত বস্তুর উপস্থিতি ইজারা পরিপূর্ণ হওয়ার শর্ত। বিশুদ্ধ বা মৌলিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়ার শর্ত নয়। বস্তুর উপস্থিতি মৌলিক শর্ত হলে এ পর্ব বন্ধ হয়ে যেত। অথচ

---

[৩৯৯] শাইখ মরহুম তা-হা আদ-দিনারীর আল মুনাসিবা গ্রন্থে মুযাককিরা পৃষ্ঠা ২২।

www.pathagar.com

ইজারা জরুরি। ফলে বিনিময়কৃত বস্তুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে ইজারা বৈধ হবে। ইমাম মালেক র. বলেছেন : জিহাদ করা জরুরি। এই জিহাদ ত্যাগ করা মুসলিম জাতির জন্যে ক্ষতিকর। জিহাদে ন্যায়ের ভূমিকা পালন করা জিহাদের পূর্ণতা। পূর্ণতায় মৌলিকতার ত্রুটি দেখা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণে নবি সা. অত্যাচারী শক্তির সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু দাউদে আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত আছে : অতীতের জিহাদ ভাল-মন্দের সাথে ছিল। অর্থাৎ জিহাদের ফযীলাত লাভে ন্যায় ও অন্যায়কারীদের সাথে জিহাদ করার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই।

২. জরুরি যা মূলের জন্য পূর্ণতা। অবশ্য এই পূর্ণতা প্রয়োজন ও শোভনীয় বস্তুর জন্যে মূল। এ দু'টি ত্রুটিপূর্ণ হলে জরুরিও ত্রুটিপূর্ণ হবে। কেননা এ দু'টি জরুরির পূর্ণতা ও অধীন। জরুরির ত্রুটিতে দু'য়ের মধ্যে ত্রুটি দেখা দিবে না। প্রয়োজনীয়তার ত্রুটিতে কখনো তাহসীনে ত্রুটি হয়। আবার কখনো জরুরির ত্রুটিতে (اخلال) প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ত্রুটি হয়।

যখন জরুরির হেফাযত করা ওয়াজিব হয় তখন প্রয়োজনীয়তার (حاجى) হেফাযত করা উচিত। আর প্রয়োজনের হেফাযত করলে (তাহসীন) সৌন্দর্যের হেফাযত করা দরকার। যখন সৌন্দর্য প্রয়োজনীয়তার সহায়ক এবং প্রয়োজনীয়তা জরুরির সেবকরূপে সাব্যস্ত হবে তখন আমরা জ্ঞাত হবো যে, জরুরিই হচ্ছে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য[৪০০]। কেননা ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ইতোপূর্বে বর্ণিত ৫টি জরুরি বিষয় হেফাযতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এই ৫টি জিনিষের উপর জাগতিক জীবনের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। ইহজীবন বরবাদ হলে পরকালীন জীবনও বিনাশ হতে বাধ্য। কেননা জীবনের দু'টি কাল ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৩. জরুরত ও প্রয়োজনকে যেসব নির্দেশ পূর্ণতায় পৌঁছে দেয় এবং মানুষের কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর বস্তু রহিত করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে আকর্ষিত করে তা এ তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত। জরুরি ও প্রয়োজনের তুলনায় শোভনীয় নির্দেশাবলীও এর অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথা জানা যায় যে, জরুরত মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়ায় তার ত্রুটিতে অবশিষ্ট দু'টিও ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। কেননা অপর দু'টি জরুরতের উপর নির্ভরশীল। মূলে ত্রুটি থাকলে শাখা প্রশাখায় ত্রুটি থাকা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ্যের অনুপস্থিতিতে বিশেষণের উপস্থিতি অকল্পনীয়।

---

[৪০০] আল মাওয়াফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬।

www.pathagar.com

অজ্ঞতা, প্রতারণা ও সমার্থবোধক হওয়া কিসাস ও ক্রয়-বিক্রয়ের বৈশিষ্ট্য হওয়ার সুবাদে যদি কিসাস এবং বেচা-কেনার মূল বস্তু রহিত করা ধরে নেই তাহলে বস্তুর অনুপস্থিতিতে বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। এমনিভাবে ঋতুবতী মহিলার জন্যে সালাতের বাধ্য বাধ্যকতা রহিত করলে কিরাত বা তাকবীর পড়ার নির্দেশ অক্ষুণ্ন থাকা অসম্ভব[৪০১]।

প্রশ্ন হতে পারে, এসব হুকুম কখনো স্বতই মৌলিক হওয়ায় এগুলো এদিক থেকে নিষেধ হতে পারে না। সুতরাং সাধারণভাবে এগুলোকে নিষেধাজ্ঞার স্তরে গণ্য করা উচিত নয় এবং অধীনস্ত বস্তুর রহিতকরণে এগুলো রহিত করাও উচিত হবে না। ফলে নিয়মটির পরিধি বেড়ে যাবে। পরন্তু উপকরণও উদ্দেশ্যসহ হয়ে থাকে। যেমন সালাতসহ ওযু করা। উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতিতে উপকরণ বিধিবদ্ধ হওয়া প্রমাণিত। যেমন হজ্জের মধ্যে মাথা মুণ্ডানোর ব্যাপারে টাক মাথাওয়ালার জন্যে মাথায় শুধু বেণ্ডড ঘুরানো। বস্তু যখন স্বতই মৌলিকরূপে স্বীকৃতি পায় তখন তাকে পূর্ণতার রূপ দেয়া প্রয়োজন হয় না যাতে পরিপূর্ণতার রহিতকরণে পূর্ণতাপ্রাপ্তকেও রহিত করতে হয়[৪০২]।

উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব হলো, কিরাত ও তাকবীরের দু'টি ধারা আছে। সালাতের অংশ হওয়ার ধারা। অপরটি তার নিজস্ব ধারা। নিজস্ব ধারার ব্যাপারে কোন কথা নেই। কেননা তখন সেটাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিরাত সালাতের অংশ বা পূর্ণতার সহায়ক হওয়ার বেলায় সিফাত মওসুফের সাথে বা বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের অস্তিত্ব লাভের নামান্তর হবে। বিশেষণের অনুপস্থিতিতে বিশেষ্যের উপস্থিতি তখন অসম্ভব যখন বিশেষণ নিজেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া যুক্তির ভিত্তিতে অসম্ভব। এমতাবস্থায় এ কথা বলা ঠিক নয় যে, পূর্ণতার অনুপস্থিতিতে পূর্ণতাপ্রাপ্তর অক্ষুণ্ন থাকা সম্ভব।

অবশ্য ওসীলার ব্যাপারটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে ওসীলা বিশেষণের মতো সৃষ্টিগতভাবে উদ্দেশ্যরূপে ধরে নিলে উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতিতে ওসীলা অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব। হুকুম অবশিষ্ট থাকার দলিল থাকলে সে অবস্থায় ওসীলা অন্যের সহায়তা ছাড়া নিজেই উদ্দেশ্যরূপে স্বীকৃত হয়। টাক মাথাওয়ালাকে এর ভিত্তিতেই বেণ্ডড মাথায় কয়েকবার ঘুরাতে হয়। সুতরাং নিয়ম সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কোন অন্তরায় নেই এবং উপরোক্ত প্রশ্ন এখানে প্রযোজ্য নয়[৪০৩]।

---

[৪০১] আল মাওয়াফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

[৪০২] আল মাওয়াফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

[৪০৩] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

www.pathagar.com

একথাও আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, প্রয়োজনীয়তা ও অনুমোদনের ত্রুটিতে জরুরি পর্যায়ের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকা অপরিহার্য নয়। কেননা কতিপয় বিশেষণের রহিতকরণে বিশেষ্য রহিত হয় না। যেমন যিকর, কিরাত কিংবা তাকবীর বা যেসব কাজ সালাতে বার বার আসে সেগুলো বাতিল হওয়ায় মূল সালাত বাতিল হয়ে যায় না। কিসাসের ব্যাপারেও একই নীতি প্রযোজ্য তবে সিফাত বা বিশেষণ মওসূফ বা বিশেষ্যের অংশরূপে হলে বা মৌলিকতার সাথে সম্পৃক্ত হলে তখন বিশেষণ বিশেষ্য বা মৌলিকতার একটি রুকন বা ভিত্তিমূলরূপে পরিগণিত হয়। কিংবা একটি স্বীকৃত বিষয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন সক্ষম ব্যক্তির জন্যে সালাতের রুকু সিজদা ও অনুরূপ কার্যাবলী। অবরুদ্ধ ঘরে সালাত পড়া, অনন্যোপায় অবস্থায় ছুরি দ্বারা যবেহ করা ইত্যাকার অবস্থা এই কানুনের খেলাফ নয়। কারণ সালাতের মূল, যবেহের মূল বাতিল হওয়া কিংবা এগুলো সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কানুনের খেলাফ হওয়া। সালাত ও যবেহ বাতিল কিংবা সঠিক হওয়া নির্ভর করে বিশেষণের প্রকৃতির উপর। সালাত ও যবেহ সঠিক হওয়ার কথা যারা বলেন তাদের মতে এ হুকুমের ভিত্তি হলো গুণ বা বিশেষণ প্রকৃতিগত হওয়া। হুকুমের ভিত্তি বিশেষণের প্রকৃতিগত হলে কিংবা প্রকৃতির মতো হলে সেক্ষেত্রে বাতিল হওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন অবরুদ্ধ ঘরে সালাত পড়া প্রকারান্তরে দিনে কোন প্রহরে সালাত পড়ার নামান্তর এবং ঈদের দিনে সওম রাখার মত অবস্থা।

প্রয়োজনীয়তা কিংবা শোভনীয় ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় কোন কোন সময় জরুরিও ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। এর চারটি ধরন আছে :

১. বিশ্বস্ততা বা নির্ভরতার তাগিদ বিভিন্ন হওয়া। জরুরি অধিকতর বিশ্বস্ত, তারপর প্রয়োজনীয়তা অতঃপর মোস্তাহসান। এগুলো একটির সাথে অপরটি জড়িত। অধিকতর বিশ্বস্ত অপেক্ষাকৃত কম বিশস্তের উপর প্রাধান্য পাওয়া সহজেই অনুমেয়। যেমন সালাত। সালাতের সম্পূরক হলো অন্যান্য আরকান, ফরজ, সুন্নাত, মোস্তাহাব ও মোহস্তাহসান। এসব আরকান গুরুত্বের ক্রমানুসারে মর্যাদা লাভ করবে। এক্ষেত্রে সম্পূরক হুকুমে ত্রুটি দেখা দিলে জরুরি বা মৌলিকতায় ত্রুটি দেখা দিতে পারে। যেমন কোন মুসল্লী সক্ষম হওয়া সত্বেও সালাতের কোন মোস্তাহসান অংশ পরিত্যাগ করলে তার সালাতই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। কোন কোন আলেম ঐ সালাত আদায়কারীর সালাতকে বাতিলও বলেছেন।

   এমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারেও বলা যায় যে, বেচা-কেনার সম্পূরক প্রতারণা, অজ্ঞতা কিংবা শঙ্কা না থাকা। বেচা-কেনায় এগুলো থাকলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় কিংবা তাদের একজন উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবে না। বরং

www.pathagar.com

এধরনের কেনা-বেচা হওয়ার চেয়ে বেচা-কেনা না হওয়াই উত্তম। এ কারণেই সাধ্যানুযায়ী প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে শরিয়াহর নির্দেশ রয়েছে। আর যা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয় অথবা ক্রেতা-বিক্রেতা কারো জন্যেই ক্ষতিকর নয় ততোটুকু ক্ষমা যোগ্য।

২. তাকিদ বা গুরুত্বের দিক থেকে ২য় স্তর। যেমন ফরজের তুলনায় নফলের স্তর। অঙ্গের আচ্ছাদন এবং কিবলাহমূখী হওয়া সালাতের মূলের তুলনায়। এমনিভাবে সুরা পড়া ও তাকবীর বলা, অনুরূপভাবে বেচা- কেনার মৌলিকতার তুলনায় বিক্রিত দ্রব্য শরিয়াহ সম্মতভাবে উপকারীও হওয়া যেমন নফল হওয়ার স্তর।

নফলের অংশ কখনো পূর্ণভাবে ওয়াজিব তখন নফল রুকনরূপে রূপান্তরিত হয়। এমতাবস্থায় নফলের ত্রুটিতে মৌলিকতা ত্রুটিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক।

৩. শোভনীয় এবং প্রয়োজনীয়তার সমষ্টি জরুরি আহকামের একেকটি অঙ্গ হতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে শোভনীয় ও প্রয়োজনীয় আহকাম জরুরি আহকামের সম্পূরক হিসেবে গণ্য হয়। মানুষ যাতে সহজ ও অনায়াসে তার দায়িত্ব সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করতে পারে সে জন্যই এসব উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পূর্ণতার মধ্যে ত্রুটির সৃষ্টি বাহ্যত ওয়াজিবের মধ্যে ত্রুটি হলেও কার্যত তা নয়। তবে জরুরি আহকামের সম্পূরকে যদি এমন ত্রুটি দেখা দেয় যাতে সৌন্দর্যের হানি না ঘটে এবং কাজের দ্যুতিও ম্লান না হয় তাহলে সেটা ত্রুটিরূপে বিবেচিত হবে না।

৪. প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ও শোভনীয় হুকুম জরুরি বা মৌলিকতা হুকুমের সেবকরূপে চিহ্নিত হওয়া। মোস্তাহসান বা শোভনীয় হুকুম বিশেষ আবস্থায় মৌলিকের অবতরনিকা বা সংযোজন কিংবা অধীনস্থ হতে পারে। জরুরি আহকাম এদের সহায়তায় উত্তম অবস্থায় বাস্তবায়িত হতে পারে[৪০৪]।

শরিয়াহ প্রবর্তকের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কল্যাণ সবল ও দুর্বলতার দৃষ্টিতে তিন ভাগে বিভক্ত। জরুরি, প্রয়োজনীয় এবং শোভনীয়। প্রত্যেকটি অপরটির সাথে জড়িত। ১ম ভাগ জরুরি বলা মূল। এই মৌলিকতাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে পবরর্তী দু'টি স্তর। মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-গবেষণা, আচার-ব্যবহার, উঠা-বসা তথা সমাজ ও আর্থ-সামাজিকতায় এ সবের অনুসরণ করলে অবশ্যই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। শৈশব থেকে আমৃত্যু মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছুর যুক্তিভিত্তিক নির্দেশনা রয়েছে এ সব স্তরগুলোতে। অধিকন্তু রিপুর দমন ও সুকুমার বৃত্তিগুলোকে জাগ্রত করে বিনয়ের

---

[৪০৪] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

www.pathagar.com

সাথে আল্লাহ্ তায়ালার অনুগত ও অনুবর্তী হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এ কারণেই নেক ও কল্যাণকর কাজে সুদৃঢ়, অবিচল, অটল ও মজবুত বন্ধন ও সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে হিংসা, বিদ্বেষ, কৃপণতা, সংকীর্ণতা ও কঠোরভাব ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কল্যাণকর বস্তুর দৃঢ়ভাবে ধারণ আর ক্ষতিকর বস্তুর কঠোরভাবে বর্জনের মাধ্যমে মুসলিম জাতি কল্যাণকর জাতিতে পরিণত হতে পারে। মুসলমানদের তাদের নিজ জাতিকে পৃথিবীর বুকে এ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করে পেশ করা এবং একই দেহমন হয়ে পৃথিবীর বুকে বাস করার মহান লক্ষ্যে এ সব বিভক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

শোভনীয় ও সৌন্দর্যবর্ধক বিধানাবলী উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে মানবতা, সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও অনাবিল শান্তি অন্বেষার প্রতিযোগিতায় নামানো। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি, ওয়াদার পরিপূর্ণতা, তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়িত করা, দ্বীনের নির্দেশ মেনে চলা, হৃদয়ের আলো নির্বাপক ও মানব কল্যাণ বিনাশক হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা ইত্যাকার নেক কাজের প্রতিযোগিতা মানুষকে উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সহায়তা করে। তাতে মানুষের সৌন্দর্য বেড়ে গিয়ে সে কামেল ইনসানে পরিণত হয়।

উপরোক্ত ৩টি স্তর আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্য প্রণোদিত কল্যাণ। তবে ১ম স্তরটি অপর দু'টির তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কিংবা বলা যায় এ স্তরটিই মৌলিক। কেননা এর উপর ভিত্তি করেই মানুষ তার জান-মাল, ইজ্জত-আবরু, জ্ঞান-গরিমা রক্ষা করে। ইহকালীন ও পরকালীন জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এ স্তরের মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ হলে মানুষ আর মানুষ অভিধায় অভিহিত হয় না। পশুর স্তরে চলে যায়। শান্তির পরিবর্তে ভয়ানক শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠে।

শক্তি আর মর্যাদার দৃষ্টিতে নয় বরং সাধারণ কল্যাণ হলো মঙ্গল লাভ করা এবং অমঙ্গল প্রতিহত করা[৪০৫]। কল্যাণ সাধারণভাবে তিনটি স্তরই শামিল করে। তবে জরুরি স্তরটি হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের। কেননা মানুষ এ স্তরটি সঠিক অর্থে অতিক্রম করতে না পারলে গোটা মানব সমাজ বিধবস্ত হতে বাধ্য। প্রয়োজনের স্তরটি ২য় পর্যায়ের হলে ও কখনো ১ম ও ২য় উভয় পর্যায়ের অবস্থান গ্রহণ করে। আর ৩য় স্তরটি হলো ১ম বা ২য় স্তরকে পূর্ণতা ও সৌন্দর্য প্রাপ্তির সহায়ক।

আমার দৃষ্টিতে এ ধরনের বিভক্তিমূলক সূচনা মানবজীবনের খাওয়া- দাওয়া, বসবাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে একটি অপূর্ব সমন্বয়। আধুনিক

---

[৪০৫] রাযী, আল মাহসূল পৃষ্ঠা ১৯৪, দাওয়াবিতুল মাসলিহাহ পৃষ্ঠা ২৩, ড. ওয়াহ্বাত আয যুহাইলীর, আদ দারুরাহ পৃষ্ঠা ৫৩।

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনায় এর কার্যকারিতা পাওয়া যায়। তবে যাদের মৌলিকতা বা বীজ অন্য ধরনের তাদের কথা স্বতন্ত্র। কেননা এরূপ সূচনার বীজ হলো আল্লাহ তায়ালার আখিরাতের উপর ইমান আনা। আর ইমানের স্বতস্ফূর্ত দাবী হলো ভাল কাজ করা, শুভকাজে সহায়তা করা এবং অন্যের মঙ্গল কামনা করা।

৪র্থ প্রকার : সামষ্টিক ও আংশিকরূপে কল্যাণের প্রকারভেদ

কোন জাতির সাধারণ লোক কিংবা গোষ্ঠি কিংবা ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ততার আলোকে কল্যাণ সামস্টিক ও আংশিক এ দুই ভাবে বিভক্ত। যে কল্যাণ সর্ব সাধারণের সাথে সম্পৃক্ত এবং মিসরবাসী বা কাতারবাসীর মতো বিরাট জাতির সাথে সংযুক্ত তা সামষ্টিক কল্যাণ। আর বাদবাকী আংশিকরূপে গণ্য।

সাধারণ কল্যাণ গোটা জাতির জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন আকীদা-বিশ্বাসের পৃষ্ঠ পোষকতা করা, অনৈক্য থেকে ঐক্য বজায় রাখা, দ্বীনকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করা, মক্কা, মদিনা ও বাইতুল মাকদাসের মতো পবিত্র স্থানসমূহ অমুসলিমদের কবল থেকে হেফাযত করা, কুরআনকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন থেকে রক্ষা করা, হাফেজে কুরআন এবং গ্রন্থ কুরআনকে যে কোনো বিকৃতি থেকে হেফাযত করা, হাদিসের ইলমকে জালিয়াতির কবল থেকে সযত্নে রক্ষা করা ইত্যাকার সংশোধনমূলক ও অকল্যাণকর কাজগুলো গোটা জাতির প্রতিটি ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর কতগুলো জরুরি আর কতগুলো প্রয়োজনীয়। তবে এগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গোটা জাতি। আর যে কল্যাণ বিশাল গোষ্ঠীর জন্যে প্রযোজ্য তা দেশ, সম্প্রদায়, জাতি, স্থান ভেদে জরুরি, প্রয়োজনীয় এবং শোভনীয় হতে থাকে। যেমন বিচার বিভাগ, মুসলিম নেতাদের মধ্যে চুক্তিপত্র হওয়া, মুসলমান বণিক সম্প্রদায়দের নিরাপত্তা, জল স্থল পথে অবাধে যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার জন্যে অমুসলমান বা প্রতিপক্ষীয় কর্মকর্তা বা রাষ্ট্রনায়কদের সাথে চুক্তিপত্র করা।

আংশিক বিশেষ কল্যাণ : এ জাতীয় কল্যাণ ব্যক্তি বা খুবই কম সংখ্যক লোকের জন্যে প্রযোজ্য। এটাও আবার কয়েক প্রকার ও স্তরের। ব্যবহারিক জীবনে এগুলো হেফাযত করার জন্যে শরিয়াহর আহকাম প্রবর্তিত হয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

কতিপয় প্রকার বিন্যাস সম্পর্কিত বর্ণনা

ক. কল্যাণের পরিবর্তনে আহকামের পরিবর্তন

খ. কল্যাণসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব।

কল্যাণের পরিবর্তনে আহকামের পরিবর্তন

এ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আহকাম (ইবাদিয়া عبادية) ইবাদতমূলক এবং (عادية) অভ্যাসজনিত হওয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই। সার্বক্ষণিক অভ্যাস প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাস এবং পরিবর্তনীয় অভ্যাস এ দু'ভাগে বিভক্ত। পরিবর্তনীয় অভ্যাসের আবার রয়েছে ৫টি দিক।

আহকাম ইবাদতমূলক ও অভ্যাস জনিত হওয়ার বিবরণ :

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ আহকামকে ইবাদতমূলক ও অভ্যাস জনিত ভাগে ভাগ করেছেন।

ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত আহকাম ইবাদতমূলক আহকাম। আর আদত বা অভ্যাসের সাথে সম্পৃক্ত আহকাম অভ্যাসজনিত আহকাম[৪০৬]। তাদের মতে ইবাদতমূলক আহকাম অর্থ বা তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য না করে নির্দ্বিধায় মানতে হয়। আর অভ্যাসজনিত আহকামের বেলায় এর মূলের অর্থ ও তাৎপর্য দেখা উচিত।

ইবাদতমূলক আহকাম কতিপয় কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় :

১. আহকামের উৎস অনুসন্ধানের পর আলেমগণ উদাহরণ স্বরূপ সালাত নামের ইবাদতের কথা বলেছেন। তাদের কথায় নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার নাম সালাত। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সেসব কাজ ইবাদতরূপে গণ্য হবে না। কারণের বিভিন্নতায় কার্যও সম্পৃক্ত। যেমন হায়েজ (ঋতুস্রাব), নিফাস (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) সময়ে

---

[৪০৬] তাকভীমুল আদিল্লাহ, দারুল কুতুবে রক্ষিত- ২৫৫ নম্বর পাণ্ডুলিপি, উসূলুস সারাখসী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৪, উসূলুল বাযদাবী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৩, শাতবী, আল ই'তিসাম খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩২, অথবা পৃষ্ঠা ১৩৩, আল বুরহান, মাকতাবা আযহারে রক্ষিত ইমামুল হারামাইনের পাণ্ডুলিপি নম্বর ৯১৩, ইমাম শাফেয়ীর আর রিসালাহ- ৫১২ ও ৫৪৫ পৃষ্ঠা এবং শাতবীর আল ই'তিসাম- খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৬।

www.pathagar.com

সালাত মৌকুফ হয় কিন্তু সওম নয়। ইবাদাতের এরূপ সাধারণ নির্দেশের তাৎপর্য হল, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করা এবং তাঁর কুদরত ও শক্তির কাছে মানুষের বিনয়ী শ্রদ্ধাশীল হওয়া। গোটা সময়ের এতোটুকু পরিমাণ সময় একটি বিশেষ হুকুম প্রবর্তনের বিশেষ কারণ হতে পারে না। তবুও আমরা একথা দৃঢ়ভাবে জানতে পারলাম যে, ঐ নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা শরিয়াহ উদ্দেশ্য। আর বাকী সময়টুকুর কার্যক্রম শরিয়াহ সম্মত উদ্দেশ্য নয়।

২. শরিয়াহর সীমারেখা চিহ্নিত করার জন্যে ইবাদাতের যেসব উপায়-উপকরণ আছে উদ্দেশ্য যদি তদনুযায়ী বিস্তীর্ণ হয় এবং সেগুলো স্পষ্ট দলিল হয় যেমন অভ্যাসসমূহের কারণও দলিল হয়ে থাকে এগুলোসহ দলিলকৃত বস্তুর কাছে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া নয়। তবে এগুলোর সদৃশ, কাছাকাছি কিংবা দলিলকৃত বস্তুর মৌলিক সর্বজনগ্রাহ্য তাৎপর্য হলে ভিন্ন কথা। এরূপ অবস্থা পরিদৃষ্ট না হয়ে উল্টো হলে তখন সে অবস্থাটাই উদ্দেশ্য হবে। তবে কোন অবস্থায় নস কিংবা ইজমা দ্বারা উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলে তখন সে অবস্থাটাই উদ্দেশ্য হবে। অপরটা হবে না। এমতাবস্থায় কেউ এর অনুসরণ করলে তাতে তাকে দোষ দেয়া যাবে না। তবে এরূপ অবস্থা খুবই বিরল।

৩. আলের প্রবাহের সাথে জড়িত ইবাদাতের উপকরণসমূহ জ্ঞানী লোকগণ ও সঠিক অর্থে বুঝতে সক্ষম নয় যেমনটি তারা অভ্যাসজনিত বিষয়ের তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম। আমরা দেখছি, এক্ষেত্রে তারা প্রায়ই বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির বেড়াজালে আটকে পড়ে। তাদের এ করুণ অবস্থা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, শুধুমাত্র মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান মর্মার্থ উপলব্ধি করতে কিংবা তৈরি করতে সক্ষম নয়। অতএব এ ব্যাপারে আমরা শরিয়াহর দ্বারস্থ হতে বাধ্য। শরিয়াহ এ ক্ষেত্রে যে সীমারেখা চিহ্নিত করে দিয়েছে তার বাইরে যাওয়ার কোন অনুমতি বা অবকাশ নেই। বস্তুত এটাই تعبد বা পরিপূর্ণ আনুগত্যের তাৎপর্য[৪০৭]।

উপরোক্ত দলিলের মুকাবিলায় ২য় প্রকার আহকাম কতিপয় কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় :

---

[৪০৭] আল মাওয়াফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০০।

www.pathagar.com

১. অভ্যাসজনিত আহকামের উৎসসমূহ সম্পর্কে চর্চা করার পর দেখা গেল যে, শরিয়াহ প্রবর্তক আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য হল বান্দার কল্যাণ সাধন করা। আর অভ্যাসগত আহকাম এই কল্যাণের সাথে আবর্তিত হয়। এমন দেখা যায় যে, কোন একটি বস্তু এক অবস্থায় কল্যাণকর নয়। কিন্তু ঐ একই বস্তুর মধ্যে কল্যাণকর কিছু পরিদৃষ্ট হলে তখন সেটা বৈধতার স্বীকৃতি পায়।

২. অভ্যাস বিষয়ক অধ্যায়ে শরিয়াহ প্রবর্তক শরিয়াহর তত্ত্ব ও কারণ বিস্তীর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ বর্ণনা বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যশীল হলে তা গ্রহণীয় হয়ে থাকে। তাতে আমরা বুঝলাম যে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা তাৎপর্যের অনুসরণ করা, দলিলসহ থমকিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া নয়। যেমনটি ইবাদাতে হয়ে থাকে। শাতবী বলেছেন : ইমাম মালেক র. এ বিভাগটি সম্পর্কে বিস্তীর্ণ আলোচনা করেছেন।

৩. অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা। এ প্রবনতা দীর্ঘদিন থেকে জ্ঞাত এবং বুদ্ধিমানগণ এর উপর এতটা আস্থাশীল ছিল যে, তাদের কল্যাণ এগুলোকে নির্ভর করে আবর্তিত হয় এবং সঠিকভাবে এগুলোকেই তারা বাস্তবায়িত করেন। অবশ্য সময়ের ব্যবধানে এগুলোর মধ্যে কাটছাঁট হতে থাকে। এমতাবস্থায় শরিয়াহর আগমনে চারিত্রিক গুণাবলী ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে যায়।

এখান থেকেই শরিয়াহ একটি সঠিক আহকামরূপে স্বীকৃতি লাভ করে যা জাহেলী যুগেও প্রবর্তিত থাকে। যেমন দিয়াত, সন্ধি, জরিমানা, কাবাঘরের আচ্ছাদন ইত্যাকার কাজগুলো জাহেলী যুগের লোকদের কাছেও প্রশংসনীয় কাজরূপে স্বীকৃত ছিল।

যখন একথা নির্ণীত হল যে, অভ্যাসজনিত কাজে তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা অধিকাংশ সময়ে মূল হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তাৎপর্যের মধ্যে আনুগত্যের ছোঁয়া পাওয়া গেলে তা অবশ্য গ্রহণীয় হবে, অন্যথায় দলিলসহ মৌন থাকতে হবে। যেমন বিবাহে মহর দাবী করা। চারণভূমির বিশেষ স্থানে যবেহ করা, মিরাসে নির্দিষ্ট অংশ, তালাক ও মৃত্যুর জন্যে মাস নির্ধারণ করা ইত্যাদি ধরনের কাজ যার আংশিক কল্যাণও উপলব্ধি করা সাধারণ জ্ঞানে অসম্ভব। ফলে এগুলো অপরের উপর অনুমান করতে হয়। এরূপ অর্থপূর্ণ প্রতিটি কাজই সৌন্দর্য বহন করে থাকে। যেমন বিনয় এবং গৌরব ইবাদাত বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ। আর এই পরিমাণটি মূলের উপর কিয়াস করা সঠিক হওযার দাবী করে না।

www.pathagar.com

যদি বলা হয়, এসব ইবাদাতমূলক কাজের জন্যে এমন কোন কারণ পাওয়া যায় কিনা যদ্বারা শরিয়াহ প্রবর্তকের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে বুঝা যায়? জবাবে বলা যায়, ইবাদাতমূলক কাজগুলোর কাঙ্খিত কারণ হল কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া নির্দ্বিধায় বশ্যতা করা।

কোনো কোনো অভ্যাস ইবাদাতের সাথে জড়িত। অর্থাৎ কল্যাণের উপকরণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া। লোকেরা যদি এগুলো ত্যাগ করে এবং এগুলেকে এড়িয়ে চলে তাহলে জ্ঞাত অর্থ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ফলে মূল শরিয়াহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বশ্যতার জন্যে যেসব পন্থা আছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এর সবচে, বেশি নিকটবর্তী। তারপর আল্লাহ তায়ালা দণ্ডের জন্যে পরিমাপ এবং পরিজ্ঞাত ও ভারসাম্যপূর্ণ কারণসমূহ নিরূপন করেন।

যেমন মিথ্যা অপবাদের জন্যে ৮০ দোররা মারা, ব্যভিচারের জন্যে নির্মমভাবে ১০০ বেত্রাঘাত ও নির্বাসিত করা। যাকাতের ব্যাপারে সময় অতিবাহিত হওয়া ও নেসাবের মালিক হওয়া। মাস ও ঋতুস্রাবেরও সময় গণনা করা। আর যেগুলোর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় সেগুলো মানুষের আমানতদারীর উপরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত ওগুলোই হলো মানুষের রহস্য। যেমন সালাতের জন্য তাহারাত বা পবিত্রতা আসল। সওম, হায়েজ, তহুর এমনি ভাবে সমগ্র ইবাদত যেগুলো নিয়ন্ত্রন সম্ভব নয় এবং এগুলোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তো স্পষ্ট ব্যাপার[৪০৮]।

১. অভ্যাসসমূহের পরিবর্তন অপরিবর্তন এবং শারয়ী আহকামের সাথে এগুলোর সম্পর্ক ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে, শরিয়াহ আহকাম ইবাদাতমূলক ও অভ্যাসজনিত দুই ভাগে বিভক্ত। যে আদেশ নিষেধের মর্মার্থ সাধারণ জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিতভাবে আঁচ করা যায় না সেগুলো ইবাদাতমূলক আহকাম। যেমন তাহারাত, সালাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি। আর যেগুলোর মঙ্গল-অমঙ্গল জানা পরিচিত সেসব আহকাম অভ্যাসজনিত হিসেবে গণ্য। যেমন বেচা-কেনা, বিবাহ-শাদী, তালাক-বিচ্ছেদ, ইজারা, দণ্ডাদেশ ইত্যাদি। কেননা এসব কাজ অর্থপূর্ণ যুক্তিভিত্তিক। অধিকন্তু শরিয়াহর নির্দেশের সাথে এসব কাজ আবশ্যিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়ায় এসব কাজ বাস্তবায়িত করা বা না করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কোন কোন অভ্যাসজনিত আহকাম নিয়মের নিয়ন্ত্রাধীন। এরূপ নিয়ন্ত্রিত ইবাদাত নিয়মের প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন দণ্ডাদেশ, মিরাসমূলক আহকাম। আবার কতিপয় আহকাম বান্দার তাকদীর ও নিয়ন্ত্রণের উপর আমানত স্বরূপ ছেড়ে দেয়া

---

[৪০৮] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৬।

www.pathagar.com

হয়েছে। শরিয়াহ আহকামের সাথে মানুষের স্বভাবগত কাজের ও পরিচিতির একটি গভীর যোগসূত্র ও সম্পর্ক আছে। এই যোগসূত্র সম্পর্কে আলোচনা করার আগে অভ্যাসের প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত।

প্রথমত

নিয়মিত অভ্যাস দু'প্রকার : ক) শরিয়াহগত অভ্যাস : যে অভ্যাসগুলো করা বা পরিত্যাগ করার শরিয়াহ দলিল বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ শরিয়াহ কাজটি ওয়াজিব বা নফল হিসেবে করার এবং হারাম বা মাকরূহ হিসেবে না করার নির্দেশ দেয়। এ ধরনের অভ্যাস সব সময়ের জন্যে স্বীকৃত। শরিয়াহর সমগ্র আদেশ এ পর্যায়ের। যেমন ক্রীতদাসের সাক্ষ্য প্রদানের উপযোগিতা হরণ করা, অপবিত্রতা দূর করা, সালাতের জন্যে পবিত্রতা, অঙ্গ আচ্ছাদন করা, উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ না করা। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা মনোনীত ও নির্ধারিত ভাল-মন্দ শরিয়াহর আভ্যন্তরীণ তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো পরিবর্তন করার অবকাশ নেই। অভ্যাস ভাল মন্দ হওয়ার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য হলেও ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো রূপান্তরিত করা ঠিক হবে না। যেমন উলঙ্গপনা আজকের যুগে দোষের তেমন কিছু নয়। যত্রতত্র এ বেহায়াপনার অবাধ চর্চা চলছে। বিশেষত সমুদ্র সৈকত, বিপনী বিতান, পার্কে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ও যুক্তিগ্রাহ্য। এই স্বাভাবিকতা ও যৌক্তিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা এটাকে শরিয়াহর বিধানরূপে প্রবর্তন করেন। মানুষ তার রুচি বা বিবেককে ভাল কিংবা মন্দে রূপান্তরিত করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সুন্নাহর যে বিধান প্রবর্তিত হয়েছে তার মধ্যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। এরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার সুযোগ থাকলে বিধিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত আহকাম রহিত করার প্রবনতা দেখা দিত। আর রসুল সা.-এর ইন্তিকালের পর রহিতরকত করা বাতিল। অতএব শরিয়াহ সম্মত অভ্যাস রহিত করাও বাতিল।

শরিয়াহ বর্জিত অভ্যাস : অর্থাৎ প্রথম প্রকারের ন্যায় শরিয়াহ দলিল কর্তৃক সব সময়ের জন্যে স্বীকৃত নয়। এ ধরনের অভ্যাস কখনো স্থায়ী হয় আবার কখনো পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এতদত্ত্বেও এগুলোর সমন্বয়ে আহকাম বিন্যস্ত হয়।

অপরিবর্তনীয় অভ্যাস যেমন পানাহারের প্রতি আসক্তি, নারী সঙ্গম, দৃষ্টি দেয়া, কথা বলা, ক্রোধ, চলা ইত্যাদি। এগুলো কার্য সম্পাদনের উপাদানরূপে প্রযোজ্য হলে শরিয়াহর বিধান এগুলোর সমন্বয়ে প্রবর্তিত হবে। এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে এগুলোর উপর নির্ভর করা যাবে এবং সব সময়ের জন্যেই এগুলো নির্দেশনারূপে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

পরিবর্তনীয় অভ্যাস পাঁচ প্রকার

প্রথম প্রকার : ভাল অভ্যাস কুঅভ্যাসে রূপান্তরিত হওয়া কিংবা বিপরীতও হতে পারে। যেমন হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে খালী মাথায় হাঁটা, খাওয়া-দাওয়া করা। স্থান কাল পাত্র ভেদে এ জাতীয় কাজ ভাল কিংবা মন্দ অভ্যাসে গণ্য হয়ে থাকে। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, এক দেশের বা এক জায়গার বুলি অন্যত্র গিয়ে গালি হয়ে যায়। আবার এর উল্টোও হয়ে থাকে। এ ধরনের অভ্যাস ভালো-মন্দরূপে চিহ্নিত হওয়ার মাপকাঠি হলো স্থান কাল ও পাত্রের ভেদাভেদ। আমরা এরূপ দেখতে পাই যে, এক দেশের যা বনেদী পোশাক অন্য দেশে উপহাস বা মস্করার খোরাক।

দ্বিতীয় প্রকার : উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যার বিভিন্নতা। এমতাবস্থায় বাক্য অন্য অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে। এরূপ বিভিন্নতা জাতির বিভিন্নতা হতে পারে। যেমন আরব জাতি অন্যান্য জাতিসহ। কিংবা তুলনামূলক ভাবে একই জাতির বিভিন্নতা হতে পারে। যেমন কথা শিল্পীদের পরিভাষা অন্য সব শিল্পীদের তুলনায় বিভিন্ন হওয়া। কোন কোন শব্দের অর্থ তুলনামূলকভাবে অধিক প্রয়োগ হতে থাকে। তখন ঐ শব্দটি তার নিজস্ব গতি ছাড়িয়ে মর্মার্থে সমধিক ব্যবহৃত হয়। শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে যা বুঝা যায়। শব্দটির মর্মার্থ অন্য অর্থে বহুল প্রচলিত হতে থাকে। যেমন একজন সাহসী লোককে সিংহ বলা কিংবা একজন বিজ্ঞ আলেম বা দানশীল লোককে সাগর বলা। এধরনের মর্মার্থ গ্রহণ প্রকৃতিগত নয় বরং রূপক অর্থে।

এমতাবস্থায় হুকুম হল, উদ্দেশ্য তার আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য না হয়ে মর্মার্থে প্রবর্তিত হবে। এরূপ অর্থ ইমান, চুক্তিপত্র, তালাক (ইঙ্গিত সূচক স্পষ্টত) ইত্যাদি বিষয়ে বেশি প্রচলিত। তখন শব্দটি প্রচলিত আভিধানিক অর্থে প্রত্যাবর্তন করে[৪০৯]। যেমন চুতষ্পদ জন্তু (দাববাহ) সমুদ্র (বাহর) বর্ণনা (রাবিয়াহ) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার। এ ধরনের অর্থ বুঝার ব্যাপারে ফকীহ এবং সাধারণ লোকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে যে অর্থ বর্ণিত ও নিরূপিত হয়ে আসছে সেটা আলাদা ব্যাপার। ফিকহের গ্রন্থমালা থেকে এ ধরনের মর্মার্থ উদ্ধার করার নিয়ম আহরণ করা হয়। লোকদের প্রচলিত নিয়ম-নীতিই এক্ষেত্রের প্রধান উপকরণ। কিতাবে এর বিবরণ বিস্তারিত নয়। বরং এ ক্ষেত্রে অনেক সময় কিতাবকে প্রচলিত নিয়মাবলীর অধীন হয়ে যেতে দেখা যায়[৪১০]। ইমাম মালেক অথবা আলেমদের অন্য কেউ তালাকের কোন শব্দ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে কোন নির্দিষ্ট হুকুমের ফতওয়া দিলে তা আমাদের

---

[৪০৯] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৪, আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৩।

[৪১০] আল ফুরুক খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪, সুয়ুতী, আল ইশবাহ ওয়ান নাযায়ের পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪, মুস্তফা আযযারকা, আল মাদখালু ফিল ফিকহিল ইসলামি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৮৯।

www.pathagar.com

বিশ্বাস করা উচিত। কেননা তাদের ঐ সময় তালাকের জন্যে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হত তার মর্মার্থ প্রদত্ত নির্দিষ্ট ফতওয়ানুযায়ী নির্বাচন করলে তাতে শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্ষুন্ন হয় না। এরূপ ফতওয়া প্রদানের উদ্দেশ্য হল মানুষকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করা। যেমন কেউ স্ত্রীকে বললো, আমার উপর হারাম এ কথায় তিন তালাক হয়ে যাওয়ার রায় দেয়া। স্থান-কালের আবর্তনে এ ধরনের শব্দের প্রচলন না থাকলে নির্দিষ্ট হুকুমও প্রযোজ্য হবে না। কেননা যা প্রয়োগের আবর্তনে হুকুমও আবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন বিনিময়ের ব্যাপারে মুদ্রার প্রচলন। লেন-দেন বা বিনিময়ের সময় যে ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল সে ধরনের মুদ্রা সে সময়ের জন্য অবশ্যই গ্রহণীয়। কিন্তু সময় বা জায়গার পরিবর্তনে মুদ্রার প্রচলন পরিবর্তনে পরিবর্তিত মুদ্রাই গ্রহণীয় হবে; আগের প্রচলিত মুদ্রা তখন অচল হয়ে যাবে। এমনিভাবে বিবাহের ব্যয়, সাংসারিক খরচ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যাপারেও প্রচলনের পরিবর্তনে হুকুমেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে[৪১১]।

তৃতীয় প্রকার : লেন-দেন বা এ জাতীয় কাজ বিভিন্ন হওয়া। যেমন বিবাহের মহর কিংবা বেচা-কেনার বিনিময়ে নগদ গ্রহণ করার রেওয়াজ থাকলে কিংবা শতকরা হিসেবে আংশিক নগদ দেয়া কিংবা আংশিক বাকী দেয়ার প্রচলন থাকলে তদানুযায়ী হুকুম প্রবর্তিত হবে। এ সম্পর্কে ফিকহের গ্রন্থরাজিতে বিস্তারিত আলোচনা আছে[৪১২]। কাজের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে হুকুম জারি হবে। এ ধরনের প্রচলিত বিভিন্নতা উপেক্ষা করে হুকুম দিলে তা ইজমার বা ঐকমত্যের খেলাফ হবে[৪১৩]।

চতুর্থ প্রকার : মানব ক্ষমতার বহির্ভূত বিভিন্নতা। যেমন আবহাওয়াগত বিভিন্নতা। উষ্ণতা ও শীতলতা বিভিন্ন হওয়ার কারণে হয়েজ বা প্রাপ্ত বয়সে পদার্পণ করার হুকুমও বিভিন্ন হয়ে থাকে। স্থানীয় আবহাওযার চাহিদা মোতাবেক বয়সে পৌছার বয়সেরও তদানুযায়ী নিরূপিত হওয়া শরিয়াহ সম্মত হবে।

পঞ্চম প্রকার : যেসব কাজ অভ্যাস বা রেওয়াজের খেলাফ। যেমন কোন লোক অভ্যাসের খেলাফ জিনিষকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয়।

কল্যাণের পরিবর্তনে আহকাম পরিবর্তিত হওয়ার দলিল

দলিলগুলো সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে একাজে সহায়তা করে। সংক্ষিপ্ত দলিলের মধ্যে মুসলমানদের কাজের রহিতকরণ প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়তে এগুলোর প্রবেশ ঘটে

---

[৪১১] আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫।

[৪১২] আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৪, আল ফুরুক খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৩।

[৪১৩] আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫।

www.pathagar.com

না প্রবাহ্ ও উপযোগীর আওতায় আহকামের অবতরণ ইত্যাদি জাতীয় বিষয় রয়েছে। এগুলোর সবই কল্যাণের পরিবর্তনে আহকাম পরিবর্তন হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল। তবে বিস্তারিত দলিল হলো সুন্নত, আসার এবং ইজমা।

সুন্নাত হলো যেমন রসুল সা. কুরবানীর ব্যাপারে বলেছেন : দফ্‌ফা-এর কারণে আমি নিষেধ করে ছিলাম অতএব তোমরা খাও, জমা কর এবং দান কর[৪১৪]। জমা করা নিষেধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ দূর হয়ে যাওয়ার আহকাম পরিবর্তন হল। ফলে জমা করা তাদের জন্য মুবাহ্ বা বৈধ হয়ে গেল। এরূপ অনেক উদারহণ হাদিসে বার্ণিত আছে।

এ বিষয়ে আসার আছে প্রচুর। সাহাবিগণের নিয়ম ছিল, তারা দেখতেন, নির্দেশটি কতটুকু কল্যাণ বা অকল্যাণমূলক এবং নির্দেশের পরিধি কতটুকু এবং নির্দেশটির জন্যে যথার্থ হুকুম আছে কি-না? নির্দেশটি যদি নববী যুগের প্রকাশ্য খেলাফ হয় কিন্তু লোকদের জন্যে বিশ্বাসানুযায়ী ব্যাপারে অন্তরায় না হয় কিংবা রসুল সা.-এর বিরোধী না হয় বরং তাদের বিশ্বাসানুযায়ী শরিয়াহর গোপন রহস্য হয় এবং ইতোপূর্বে এ ধরনের কিছু জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কেউ অবগত না হয় তাহলে এ বিষয়ে সকলে পরামর্শ করবে এবং পরামর্শের পর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এর উপর ভিত্তি করে আমরা তিন তালাক, দিয়্যত, খনিজ দ্রব্য, গনিমত বন্টণ মদের পরিমাণ বৃদ্ধি, মহিলাদের মসজিদে গমন, শিল্পীর জিম্মাদারী ইত্যাদি যা নবি যুগের পর দেখা দেয় সেসব ব্যাপারে পরিবর্তন করেছি[৪১৫]। বর্ণিত আছে, ওমর বিন খাত্তাব সিরিয়ায় এসে মুআবিয়াকে পর্দা টানাতে, পর্দার অন্তরালে থাকতে, মূল্যবান বাহনে আরোহন করতে, মিহিন কাপড় পরিধান করতে এবং রাজা বাদশাহের ন্যায় সিল্ক জাতীয় পোষাক ব্যবহার করতে দেখেন। তিনি মুআবিয়াকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আমি এমন এক রাষ্ট্রে অবস্থান করছি যেখানে এ জাতীয় জিনিষের প্রয়োজন। তখন উমার বললেন : আমি তোমাকে এ ব্যাপারে আদেশ-নিষেধ কোনটাই করব না। কারাফী বললেন : এর অর্থ হল, এ বষিয়ে, তুমিই সম্যক জ্ঞাত। যদি সত্যিই এগুলোর প্রয়োজন হয় তাহলে ভাল, অন্যথায় এ জাতীয় তৎপরতা ভাল নয়। ওমর ও অন্যদের এরূপ মন্তব্যের পর এ কথা প্রমাণিত হয় যে,

---

[৪১৪] মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কিতাবুল আদাহীতে। এক্ষেত্রে অনেকগুলি বর্ণনা এনেছেন।

[৪১৫] ইবনে কাইয়েম, আত তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৬, আল ফিকরুস সামী খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৪১, শালাবী তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ৩০৭।

www.pathagar.com

জাতির অবস্থা এবং নির্দেশদাতাগণের নির্দেশ স্থান, কাল পাত্র ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে এমন নতুন ও চাকচিক্যময় রাষ্ট্র নীতির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে যা আগে ছিল না। কোন কোন অবস্থায় এরূপ করা ওয়াজিবও হয়ে যায়[৪১৬]।

এমনও বর্ণিত আছে যে, ওমর দুর্ভিক্ষের সময় চুরির অপরাধে হাত কাটার আইন স্থগিত করেন। গিলমান হাতিবের হাত এ কারণেই কাটা হয়নি। এ কারণেই এক কথায় তিন তালাক দিলেও এক তালাক হয় জানা সত্ত্বেও এক কথায় তিন তালাক প্রদানকারীকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ লোক যখন এ অপরাধ করতে থাকলো তখন দোষারোপের মাধ্যমে এর শাস্তির সিদ্ধান্ত হলে তার সাহাবা প্রজাগনও তা সমর্থন করলেন। তখন বলা হলো, যে জিনিষের মধ্যে সম্মান আছে মানুষ তা পাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে উঠে; যদি আমরা দৃঢ়সংকল্প হই তাহলে বস্তুটি আয়ত্বে এসে যায়।

এ কারণেই (উম্মে ওয়ালাদ) ক্রীতদাসী মাকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হওয়া, হজ্জ মাস ছাড়া অন্য মাসে ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে হজ্জে ইফরাদ করা ইচ্ছাধীন হওয়া, কারো ধারণায় তামাত্তু নিষিদ্ধ হওয়া ইফরাদ ওয়াজিব হওয়া, সমকামীদের আবু বকরের পুড়িয়ে মারার শাস্তি দেয়া, আলীর যিন্দীক ও রাফেজীদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করা, ওসমানের একটি মাত্র লিপিতে কুরআন সংকলন করে বাকীগুলো জ্বালিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে[৪১৭]।

ইবনে কাইয়িম র. বলেছেন : এগুলো এবং এগুলোর অনুরূপ অন্যান্য উদাহরণ কল্যাণ অনুযায়ী আংশিক শাসন সম্পর্কিত বিষয়। যুগের বিবর্তনে বিভিন্ন হয়ে থাকে। আবার কেউ এগুলোকে কিয়ামত অবধি স্বাভাবিক আইন মনে করে থাকে। তবে এগুলোর মধ্যে জটিলতা আছে, আবার প্রতিদানও রয়েছে। যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা.-এর আনুগত্যের জন্যে ইজতিহাদ করে সে একটি ও দু'টি পুরস্কারের মাঝখানে অবর্তিত হয়ে থাকে[৪১৮]। এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি ও এগুলোর সমাধানের মাধ্যমে সাহাবীগণের ভূমিকা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের আগমন ঘটে এবং তাঁরা সাহাবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যা আগে ছিল না এমন বিষয় সম্পর্কে ফতওয়া প্রদান করেন।

---

[৪১৬] কারাফী, আল ফুরুক খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৩, মুহাম্মদ শালাবী, তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ৩০৯।

[৪১৭] ইবনে কাইয়েম, আত তুরুকুল হুকমীয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৯-২২।

[৪১৮] ইবনে কাইয়েম, আত তুরুকুল হুকমীয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৯-২২।

www.pathagar.com

নবি সা. এর নিষেধ থাকা সত্বেও তারা (تسعير) অনুমানের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন। এ ব্যাপারে ইবনে কাইয়িম বলেছেন : রসুল সা. যে জিনিসের চাহিদা আছে তার অস্তিত্বহীনতার কারণে তা নিষিদ্ধ করেছেন। যদি বস্তুটির অস্তিত্ব থাকতো তাহলে তিনি তা করতেন। এভাবে তাঁরা পুত্রের জন্যে পিতার সাক্ষ্য, স্ত্রীর জন্যে স্বামীর সাক্ষ্য এবং ভাইয়ের জন্যে ভাইয়ের সাক্ষ্য প্রদান রদ হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন, যদিও পূর্বে এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হত। এ কারণে ইমাম যুহরী রহ. বলেছেন : পিতার সাক্ষ্য পুত্রের জন্য, স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর জন্যে এবং ভাইয়ের সাক্ষ্য ভাইয়ের জন্যে গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপরে সালাফে সালেহীন কাউকে অভিযুক্ত করেন নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জনগণের মধ্যে এর বহুল প্রয়োগের দরুণ ইনসাফ বা নিরপেক্ষতার চেয়ে আত্মীয়তার সূত্র প্রাধান্য পায় বেশি। ফলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় না হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য শেষ যামানায় এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়[৪১৯]।

ওমর বিন আবদুল আযীয র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, লোকদের সাথে এমন পরিমাণে কথা বলো যাতে পংকিলতা থেকে বাঁচতে পার। কারাফী বলেন, তিনি হুকুম রহিত হওয়াকে রদ করেননি। বরং মুজতাহিদের জন্যে উপকরণ বিভিন্ন হওয়ার দরুণ ইজতিহাদের মধ্যেমে পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছেন[৪২০]।

উপরোক্ত আলোচনা একথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, কল্যাণের অনুগামী আহকাম কল্যাণের সাথে আবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়। এরূপ আবর্তন ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে কেউ অস্বীকার করে নি। ফলে এই প্রক্রিয়া সাহাবী ও তাবেঈদের যুগ থেকে ইজমারূপে স্বীকৃত।

ইমাম আবু হানীফা র. এবং ইমাম মালেক র. হাশেমী বংশোদ্ভূত লোকদেরকে যাকাত দেয়া হাদিসের আলোকে নিষেধ থাকা সত্বেও তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয বলেছেন। যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, রাজস্ব বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় দেখা দেয় এবং হাশেমীদের অধিকার ক্ষুন্ন হয় তখন এনির্দেশ প্রবর্তিত হয়। উদ্দেশ্য, এ বংশকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, দারিদ্র ও অর্থাভাব জনিত হীনমন্যতা থেকে তাদেরকে হেফাজত করা।

ইমাম শাফেয়ী র. মিসরে চলে আসার পর অনেক বিষয়ে, তাঁর মত এমনভাবে পাল্টে ফেলেন যে, মনে হচ্ছিল এটা একটি নতুন মাযহাব। স্থান, কাল ও পাত্রের

---

[৪১৯] মুহাম্মদ মুস্তফা শালাবী, তা'লীলুল আহাকম পৃষ্ঠা ৩১০।

[৪২০] আল ফুরুক, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭৭।

www.pathagar.com

বিভিন্নতার কারণে এরূপ পরিবর্তন করতে হয়েছে। তিনি এরূপ করেছেন এবং জনগণ তা জানতো।

ইমাম মালেক র. বলতেন, লোকদের সাথে এমন ভাবে কথা বলো যাতে পংকিলতা থেকে বাঁচতে পারো। ইমাম মালেকের র. উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যায় ইমাম যারকানী র. বলেছেন, তোমরা লোকদের সাথে এমন বিষয়ে কথা বলো যার মধ্যে শরিয়াহর মূলনীতি নিহিত। এমন বিষয়ে নয় যা বলার আগেই দাবী করা যায়[৪২১]।

ইমাম আবু ইউসূফ র. ও মুহাম্মাদ র. যুগের পরিবর্তনের কারণে অনেক বিষয়ে তাদের উস্তাদ ও গুরুর মতের খেলাফ মত প্রকাশ করেছেন। যেমন সাক্ষ্য নির্ভর যোগ্য হওয়া এবং রাষ্ট্র প্রধান ছাড়া অন্য কারো জোর প্রয়োগ করার বিষয়াবলী। কেননা আবু হানীফার র.-এর আমলে ন্যায়নিষ্ঠার প্রাধান্য ছিল। ফলে (হুদুদ) দণ্ডাদেশ ও কিসাস ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে শুধুমাত্র বাইরের আদালতই যথেষ্ট ছিল। المسلمون عدول بعضهم على بعض মুসলমানরা পরস্পরের জন্য ন্যায়বান[৪২২] হাদিসের এ কথার প্রতি কারো তেমন গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি ছিল না। যখন জনগণনের মধ্যে থেকে পবিত্রতার শর্ত লোপ পেতে শুরু করলো তখন সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে এরূপ হুকুম আরোপ করা হল যাতে জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন না হয়। এমনিভাবে শক্তি প্রয়োগ করা কেবলমাত্র রাজকীয় স্বীকৃত ছিল।

সময়ের বিবর্তনে জনগণও বল প্রয়োগ করতে শুরু করে। ফলে জনগণের শক্তি প্রয়োগকে তারা বৈধ বলে স্বীকার করেন[৪২৩]। ইবনে হাযম তাঁর গ্রন্থ আল আহকামে[৪২৪] বলেছেন, ইমাম মালেক আবু বকর -এর ৫টি এবং ওমর -এর প্রায় ৩০টি বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বী পূর্ববর্তী আলেমগণ কোন কোন বিষয়ে তাঁদের স্ব স্ব ইমামগণের বিরোধিতা করেছেন। বরং কখনো প্রয়োজনের কারণে সময়ের বিবর্তন ও অবস্থার পরিবর্তনে দলিলেরও বিরোধিতা করেছেন। এ জন্যে আমরা আলকারাফীকে আমার উপর হারাম এ বাক্য দ্বারা তিন তালাক প্রয়োগ হওয়ার কথা বলতে দেখতে পাই। ইমাম মালেক র. একথা বলেছেন, কিংবা ফিকহের কিতাবে এরূপ লিখা আছে, উপরোক্ত বাক্য দ্বারা তিন তালাক প্রযুক্ত

---

[৪২১] আয যুরকানী আলাল মুআত্তা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫।

[৪২২] তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ৩১১।

[৪২৩] ইবনে কাইয়েম, আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৬৭।

[৪২৪] আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩।

www.pathagar.com

হওয়ার ব্যপারে এ ধরনের কথা বলা ভুল। বরং প্রচলন ও অভ্যাসের প্রক্ষিতে এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা উচিত যেমন দাব্বাহ বাহর ও রেওয়ায়েত শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে মর্মার্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন, এটা ছাড়া যে ফতওয়া প্রদান করে- সেক্ষেত্রে অভ্যাসকে রেওয়ায়েত করা হয়- তা ইজমার ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হবে। দলিল ছাড়া ফতওয়া দেয়া ইজমাকে হারাম মনে করার নামান্তর। অভ্যাসের পরিবর্তনে হুকুমও সর্বসম্মতিক্রমে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তৃতীয় এক জায়গায় তিনি বলেছেন : পূর্ব থেকে চলে আসা বিষয়ের উপর সব সময়ের জন্যে স্থির হয়ে থাকা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর অতীতের বা আলেম ও চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্যের জন্য মূর্খতা বৈকি। এ কারণে দেখা যায় যে, আমার উপর হারাম এ জাতীয় কোন বাক্য বা শব্দ দ্বারা প্রচলনের কথা চিন্তা না করে তিন তালাক প্রয়োগের অর্থ গ্রহণ করা ইজমার খেলাফ। কেউ মৌন থেকে গ্রন্থের উপর নজর না বুলিয়ে যদি প্রচলন ও রেওয়াজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উপরোক্ত মর্মার্থ গ্রহণ করে তাহলে তার গৃহীত মর্মার্থ শুদ্ধ হবে বিষম[৪২৫]।

পরবর্তীগণ কর্তৃক পূর্ববর্তীগণের বিরোধিতা যদি এরূপ সূচনার উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহলে সেটা হবে উসূলে শরীয়তে বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। এমতাবস্থায় তাহার সুস্পষ্ট গোমরাহী। আর ঐ ধরনের সূচনার উপর বিরোধিতা নির্ভরশীল হলে তা হবে কল্যাণকামী শরিয়াহর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ ধরনের বিরোধিতার উপর সম্মতি রয়েছে সাহাবী, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন পর্যায়ের মনিষীবৃন্দের। যেসব কর্মকাণ্ডে জনগণের অভ্যাস ও রসম রেওয়াজ ঘিরে আবর্তিত সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সম্মতি দেয়া হয়েছে।

স্থান কালের পরিবর্তনে যদি আহকামের পরিবর্তন আলেমগণের ঐকমত্যে স্বীকৃত হয় তাহলে আগের হুকুম রহিত হয়ে যাবে কি-না? এ ধরনের পরিবর্তন নসখের পর্যায়ে নয়।

কিছু লোককে এ ধরনের দ্বার উন্মুক্ত করতে দেখা গেছে। আহকামের পরিবর্তনকে কল্যাণের অধীনস্ত করা। এমনকি শরিয়াহ বদল এবং কাঠামো পরিবর্তন করারও প্রয়াসী। জনগণের কল্যাণ প্রকাশ পেলে সেক্ষেত্রে তারা দলিল ত্যাগ করে। এরূপ করা বস্তুত আহকাম উঠিয়ে দেয়ার নামান্তর যা রায়ের মধ্যেমে নস্খ করা বুঝায়। একথা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত যে, রসুল সা.-এর ইন্তিকালের পর রহিত হওয়ার প্রক্রিয়া অচল হয়ে যায়। তবে নির্দেশ নস বা দলিলের অবকাশের দিকে অগ্রসর

---

[৪২৫] আল ফুরুক খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫ এবং ১১৭।

www.pathagar.com

হওয়ার সুযোগ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ বিরাজমান থাকবে। উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো, এ ধরনের পরিবর্তনশীল আহকামের মধ্যে নস্খ বা রহিতকরণের প্রক্রিয়া নেই। কারণ আমরা তো দাবী করিনি যে, সমগ্র আহকামের পরিবর্তন কল্যাণ পরিবর্তনের অধীন। বরং আমরা এটা বলেছি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর এ কথা বলার প্রেক্ষিতে যে, আহকাম, প্রবর্তিত হওয়ার পর পরিবর্তনের আদৌ সুযোগ নেই। যেমন ইবনে কাইয়িম বলেছেন, আহকাম দু'প্রকার। এক প্রকার আহকামের কোন অবস্থাতেই কস্মিনকালেও পরিবর্তন হবে না। এ আহকামের বেলায় স্থান, কাল, পাত্র, ইজতিহাদ ইত্যাদির কোন বালাই নেই। ওয়াজিব জিনিষের ওয়াজিব হওয়া, হারাম বস্তুর হারাম হওয়া, শরিয়াহ কর্তক দণ্ডাদেশ নির্ধারিত হওয়া ইত্যাদি এ ধরনের আহকাম।

২য় প্রকার : স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে কল্যাণের দাবী অনুযায়ী পরিবর্তনশীল আহকাম। যেমন শাস্তি ও দণ্ডাদেশের ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করা। কেননা, শরিয়াহ কল্যাণানুযায়ী এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ দিয়েছে[৪২৬]।

মানুষের মর্যাদা ও অবস্থান যাই হোক না কেন তার পক্ষে কোন হুকুম নস্খ বা রহিত করা সম্ভব নয়। তবে অবস্থার পরিবর্তনে এবং কল্যাণের আবর্তনের কারণে পরিবর্তন আসতে পারে। সুতরাং কল্যাণের উপর নির্ভরশীল আহকাম কল্যাণের অস্তিত্বে ও অস্তিত্বহীন অবস্থায় আবর্তিত হতে থাকে। প্রত্যেকটি কল্যাণ মৌলিকতার উপর নির্ভরশীল হুকুমের মুলে অস্তিত্বশীল। আর যেক্ষেত্রে হুকুম উঠিয়ে দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে উপযোগিতা না থাকায় আগের হুকুমের সাথে সমন্বয় করে নেয়া হয়েছে। একথার উপর ভিত্তি করেই একটিমাত্র ঘটনার প্রেক্ষিতে ঐ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় সম্পর্কে কতিপয় শরিয়াহ প্রবর্তিত আহকাম হতে পারে। মুজতাহিদগণ এভাবে গবেষণা করে উপযোগী ও যথার্থ নির্দেশ প্রবর্তন করেন।

অবস্থা ও কল্যাণের পরিবর্তন ঘটলে তদানুযায়ী হুকুমেরও পরিবর্তন ঘটে এবং কিছুক্ষণ আগে যে হুকুম ছেড়ে দেয়া হয়েছিল সেই প্রথম হুকুম আবার ফিরে আসবে যদি এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত থাকে। এরূপ আবর্তন পরিবর্তন নস্খ নয়। কারণ নস্খ-এর মর্মার্থ হলো শরিয়াহ প্রবর্তক প্রথম হুকুম এমন ভাবে রহিত করেন যা মূলত : অবশিষ্ট থাকে না এবং একজন গবেষকের জন্যে ঘোষিত ও স্বীকৃত নসখ নিয়ে আবার গবেষণা করা ঠিক নয়।

---

[৪২৬] ইগাসাতুল লাহফান।

www.pathagar.com

দু'টি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যায়

প্রথম উদাহরণ

একথা যে, স্ত্রীর বর্তমানে তার বোন, ফুফু, খালাকে বিবাহ করা নিষেধ। কেননা তাতে রক্ত সম্পর্কের বিপর্যয় ঘটে, আত্মীয়তার কল্যাণে ব্যত্যয় দেখা দেয় এবং সম্ভ্রমবোধ লোপ পায়। তবে স্ত্রীর বিয়োগ ঘটলে তারা হালাল হয়ে যায়। কল্যাণকে সামনে রেখে এক্ষেত্রে বিবাহ করা বৈধ হয়। যদি শিশু সন্তান রেখে স্ত্রী মারা যায় তাহলে এই অসহায় সন্তানদেরকে স্নেহের পরশে লালন করার জন্যে অন্য যে কোন মহিলার চেয়ে রক্ত সম্পর্কীয় কিংবা নিকটাত্মীয় বেশি যত্নবান হবেন। কাজেই স্ত্রীর মৃত্যুর আগে যাদের হারাম করা হয়েছিল মৃত্যুর পর তাদেরকে হালাল ঘোষণা করা হলো। সুতরাং হালাল এবং হারাম হওয়া এখানে অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তাকে কোন অবস্থাতেই নস্‌খ বলা ঠিক হবে না। আমরা একথাও বলতে পারি না যে, হারাম পরিবর্তিত হয়ে হালাল হয়েছে। বরং আমরা বলতে পারি হারাম হওয়ার কারণ দূর হয়ে যাওয়া এবং মোবাহর কারণে দেখা দেয়ায় এবং এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় হারাম হওয়া রহিত হয়ে গেছে। শরিয়াহ আহকাম প্রমাণিত। আর ঘটনা প্রবাহ যা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পরিবর্তিত হয় শরিয়াহ প্রবর্তকের অনুমতিতে। অন্যথায় পরিবর্তন করাও মূলত নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় উদাহরণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলার প্রতি অবশ্যই অনুগত থাকেন। পরবর্তীতে তিনি পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম বহির্ভূত কাজ করলে তাতে ইউনিভারসিটির নিয়ম ও শৃঙ্খলার পরিবর্তন হয়েছে বলা যাবে না। আইন-শৃঙ্খলা তার আপন অবস্থায় বিরাজমান। শিক্ষক মহোদয়ের শিক্ষক থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষকরূপে বিরাজমান থাকা আনুগত্য করার কারণ ছিল। ইস্তফা দেয়ার ফলে সে কারণ দূর হয়ে যায়। যেমন মরা গরুর গোশত সচ্ছল অবস্থায় ভক্ষণ করা হারাম এবং অনন্যোপায় অবস্থায় মোবাহ। কোন ঘটনা এক নির্দেশ থেকে অন্য নির্দেশে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে।

ইমাম শাতবী রহ. (موافقات) মুআফিকাত গ্রন্থে বলেছেন : প্রচলন ও রেওয়াজের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত আহকাম প্রকৃতপক্ষে মূল বক্তব্যের পরিবর্তন নয়। কারণ শরিয়াহর সৃষ্টি সৃষ্টির লয় পর্যন্ত সকল সময়ের জন্যে এর প্রয়োগও অনুরূপ। এতে পরিবর্ধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি অভ্যাস বা রসম শরয়ি

www.pathagar.com

বিধানের অধীনে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক প্রসঙ্গটিকে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা যেতে পারে। বালকের জন্য শরিয়াহর বিধান প্রযোজ্য নয়। বালেগের জন্যে প্রযোজ্য। অর্থাৎ শরিয়াহর নির্দেশ বালেগ হওয়ার আগে প্রযোজ্য ছিল না। বালেগ হওয়ার পর প্রযোজ্য হয়। এখানে শরিয়াহর মূল বক্তব্যে কোন পরিবর্তন হয় নি। পরিবর্তন হয়েছে রীতি বা অভ্যাসে। বিবাহের দেন মহর আদায়ের ব্যাপারে যে সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন হয় তাতেও রসম বা অভ্যাসের বিভিন্নতায় কখনো স্ত্রীর কখনো স্বামীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। শরিয়াহর যে নির্দেশ তা আপন জায়গায় অপরিবর্তনীয় থাকে[৪২৭]।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, কোন কোন ঘটনা প্রবাহ একটি শরিয়াহ হুকুম থেকে অপর একটি শরিয়াহ হুকমে পরিবর্তিত হয়। যখন ঘটনাবলী পরিবর্তিত ও আবর্তিত অভ্যাস ও প্রচলনের উপর নির্ভরশীল হয়, তখন ঘটনা প্রবাহের অপর একটি শরিয়াহসম্মত মৌলিক নির্দেশের অধীনস্ত হওয়া প্রকারান্তে শরিয়াহ প্রবর্তকের অনুমতিক্রমে হওয়ার নামান্তর। যেমন শরীয়সম্মত অভ্যাস কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাস কিন্তু সেটা শরিয়াহ বহির্ভূত। এ দু'ধরনের অভ্যাস স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থার অনুগত নয়। এ দু'প্রকার ছাড়া অন্যান্য প্রকার অভ্যাস বা প্রচলন মানুষের অভ্যাস ও রেওয়াজের অধীন। ফিকহ গ্রন্থে এরূপ কানুনকে আদাতে মুহকামাহ (عادة محكمة) বলা হয়েছে। অর্থাৎ রসম ও রেওয়াজ শরিয়াহ আহকামের সাথে দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত। স্থান কালের আবর্তনে এই রূপ সময় আবর্তিত হলে শরিয়াহ আহকাম এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কল্যাণসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং গুরুত্বের দিকে থেকে এই তারতম্যের মাপকাঠি

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামি শরিয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক ও সঠিক কল্যাণ সাধন করা। আল্লাহ তায়ালা দয়া পরবশ হয়ে এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে নবি-রসুল পাঠিয়েছেন। শরিয়াহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেসব আলেম অবহিত তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত। শরিয়াহর প্রতিটি বিধান এই মহান লক্ষ্য সম্পাদন করার জন্যে প্রবর্তিত। বিধানগুলো স্বতই কল্যাণকর ও মঙ্গলময়, যদিও কতিপয় লোক প্রবৃত্তির তাড়নায় কিংবা বস্তুতান্ত্রিক জৌলুসে আড়ষ্ট হয়ে এগুলো হৃদয়ংগম করতে অক্ষম। তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতার

---

[৪২৭] আল মুআফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৫, আল উরফু ওয়াল আদাতু ফী রায়িল ফুকাহা পৃষ্ঠা ৮৯।

www.pathagar.com

তমিস্রায় এতোটা আচ্ছন্ন যে, মদের নেশায় বিভোর হয়ে আবোল তাবোল বলা এবং অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার মতো জঘন্য অপরাধকেও কল্যাণকর মনে করে থাকে। কখনো এরূপ হতে দেখা যায় যে, একই কথা একদেশের বুলি অন্য দেশের গালি, একই কাজ এক সময়ের জন্যে কল্যাণকর অন্য সময়ের জন্যে ক্ষতিকর, একই ঘটনা একজনের জন্যে ক্ষতিকর অন্যজনের জন্যে উপকারী। এমতাবস্থায় যা ক্ষতিকর তা হবে নিষিদ্ধ আর যা কল্যাণকর তা হবে করণীয় ও পালনীয়। একই বস্তু কল্যাণকর ও ক্ষতিকর হলে দু'য়ের মধ্যে পরিমাণ নিরূপন করে অধিকতর পরিমাণ ক্ষতিকর বস্তু বর্জনীয় হবে এবং কল্যাণকর গ্রহণীয় হবে। আবার সব কল্যাণ একই সমান নয়। কম বেশি আছে। ক্ষতির পরিমাণও সমান নয়। এগুলোর পার্থক্য কখনো প্রকাশ পায় আবার কখনো প্রকাশ পায় না। আল ইয বিন আবদুস সালাম বলেছেন, অধিকতর উপকারী বস্তুর প্রাধান্য প্রদান এবং খারাপের উপর অধিকতর খারাপের প্রাধান্য দেয়া একটি প্রশংসিত বৈশিষ্ট্য বৈ কি! যদি ভালোর মান সমান হয় তাহলো যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে। জানা থাকলে অধিকতর ভালটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আর অজানা থাকলে মৌন থাকার অবকাশ আছে। আলেমগণ এমত প্রকাশ করেছেন[৪২৮]।

তিনি অন্যত্র বলেছেন : নিয়ম হলো, মঙ্গল অমঙ্গল দোষ মুক্ত হলেই তা সম্পাদনের জন্যে চেষ্টা করতে হবে। আর অমঙ্গল যার মধ্যে মঙ্গল নেই তা তাৎক্ষণিকভাবে বর্জন করতে হবে। অবস্থার প্রেক্ষিতে কল্যাণ নির্ণয়ে জটিলতা দেখা দিলে অস্তিত্বের ভিত্তিতে তা করতে হবে। অকল্যাণের ব্যাপারেও একই পন্থায় তা বর্জন করতে হবে। ওয়াজিব এবং নফলের মধ্যে আবর্তন দেখা দিলে ওয়াজিবকে প্রাধান্য দিয়ে তদনুযায়ী কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত নয়। নিয়ত শর্ত হলে সাধারণ নিয়ত নাকি দৃঢ় নিয়ত কোন ধরনের নিয়ত প্রযোজ্য এ প্রশ্ন দেখা দিবে। নফল এবং মোবাহের মধ্যে জটিলতা দেখা দিলে নফলের উপর প্রাধান্য দিয়ে তদনুযায়ী আমল করতে হবে। এমনিভাবে হারাম এবং মাকরূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে হারাম প্রাধান্য পাবে এবং তা বর্জন করতে হবে। মাকরূহ এবং মোবাহের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মাকরূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা বর্জন করতে হবে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ রোধের প্রক্রিয়া হলো, দৃঢ়তার বিকাশ। আর যদি দৃঢ়তার প্রকাশ না হয়ে

---

[৪২৮] কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫।

www.pathagar.com

সমতা পরিদৃষ্ট হয় তাহলে সতর্কতার সাথে প্রাধান্য দেয়ার প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে।

ইমাম ইবনে কাইয়িম রহ. বলেছেন : বান্দার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়াহর বিধানের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিধানগুলো নিখুঁত কিংবা ঝোঁকপ্রবন কল্যাণ থেকে শূণ্য নয়। আর যদি আধিক্য দেখা দেয় তাহলে গুরুত্ব ও কারণের প্রেক্ষিতে প্রাধান্য দিতে হবে। বৈধ অবৈধ উভয় ক্ষেত্রেই অধিকতর ঝোঁক প্রবনতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। বৈধতার ক্ষেত্রে গ্রহণ এবং অবৈধের ক্ষেত্রে বর্জন করতে হবে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার উপর রহমত ও কৃপা করে তাঁর মহত্ব ও একচ্ছত্র ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ শরিয়াহ বিধান প্রবর্তন করেছেন। শরিয়াহ সম্পর্কে যিনি চিন্তা-গবেষণা ও গভীরভাবে মনোনিবেশ করবেন তার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না[৪২৯]।

এখানে ইবনে কাইয়িম নিখুঁত ও নির্ভেজাল কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। অবশ্য আলেমগণের মতে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আক্ষরিক। যারা বলছেন, এ ধরনের কল্যাণ অবশ্যই আছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে একই সময়ে মঙ্গল অমঙ্গল একত্রিত হতে পারে না। বরং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ নিরেট মঙ্গলময়ই হয়ে থাকে। যারা বলেন, এ ধরনের কল্যাণ নেই তারা বাস্তবতা ও অভ্যাসের নিরিখে একথা বলেন। কেননা প্রত্যেক কল্যাণের জন্যে কঠোর প্ররিশ্রম, আপ্রাণ প্রচেষ্টা, প্রবল প্রতিযোগিতার প্রয়োজন হয়[৪৩০]।

কল্যাণ এবং অকল্যাণ যখন বিভিন্ন ধরনের তখন এগুলোর নিরূপনের একটি মাপকাঠি থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারা এর পরিমাপ করা যথেষ্ট নয়। আমরা আগেই বলেছি, কল্যাণ নির্ণয় করার ব্যাপারে শরিয়াহর নির্দেশনাকে পাশ কাটানোর শক্তি মানুষের জ্ঞানের মধ্যে নেই।

গুরুত্বের দিক থেকে কল্যাণসমূহের তারতম্যের মাপকাঠি

ক. কল্যাণ প্রকৃতি, মান ও বিন্যাসের দৃষ্টিতে

খ. কল্যাণ সম্পূরক ও বৈশিষ্ট্য সমূহের দৃষ্টিতে

গ. কল্যাণ অর্জনে তাকিদ দেয়া না দেয়ার দৃষ্টিতে

---

[৪২৯] কাওয়ায়েদুল আহকাম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯।

[৪৩০] কাওয়ায়েদুল আহকাম খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২, ইবনে কাইয়েম- আল হিসবাতু ফিল ইসলাম পৃষ্ঠা ৬৪।

www.pathagar.com

একই বস্তুতে দু'টি কল্যাণের সমাবেশ ঘটলে এবং কোন একটি অর্জন করা জরুরি হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। প্রথম, কল্যাণের প্রকৃতি, মান, অবস্থান দেখা, দ্বিতীয়- কল্যাণটি সম্পূরক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া এবং তা অর্জন বা বর্জনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা।

প্রথম বিষয়ের প্রেক্ষিতে কল্যাণের মান ও প্রকৃতির মধ্যে তারতম্য দেখা দিলে আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রতিটি কল্যাণই শরিয়াহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। এমতাবস্থায় ৫টি মৌলিক কল্যাণের ক্রমধারায় এর মান ও গুরুত্ব নির্ণয় করতে হবে। ৫টি কল্যাণের ক্রমবিন্যাস হলো দ্বীন, প্রাণ, জ্ঞান, বংশ এবং সম্পদের হেফাযত করা। সুতরাং দু'য়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে প্রাণের হেফাযত করার উপর দ্বীনের হেফাযত করাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এমনি ভাবে প্রাণকে জ্ঞানের উপর এবং জ্ঞানকে বংশের উপর এবং বংশকে সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। এরূপ ক্রমবিন্যাস ও প্রাধান্য প্রদানের ব্যাপারে আলেমগণ একমত প্রকাশ করেছেন[৪৩১]।

১. যেমন আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে মূলত দ্বীনের হেফাযত করা এবং গৌণত প্রাণের হেফাযত করার ইঙ্গিত রয়েছে।

২. সমস্ত মুসলমানের নেশাগ্রস্ত বস্তু পান করা কিংবা জ্ঞান রহিত করণের খাদ্য খাওয়ায় এসব বস্তু ধ্বংসাত্মক প্রাধান্য বিস্তার থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণের সংরক্ষণ মূল্য এবং জ্ঞানের হেফাযত করা মৌন।

৩. এমনিভাবে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়ায়ও জ্ঞানের হেফাযতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তারপরের প্রাধান্য পেয়েছে বংশের হেফাযত করা।

৪. পতিতাবৃত্তিকে জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

তোমাদের দাসীদের সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের লালসায় তাদেরকে ব্যাভিচারিনী হতে বাধ্য করো না[৪৩২]।

[৪৩১] দাওয়াবিতুল মাসলিহাহ পৃষ্ঠা ৩৪৯।

[৪৩২] সুরা আন-নূর আয়াত : ৩৩।

www.pathagar.com

এটা একথার প্রমাণ যে, বংশের হেফাযত করার কল্যাণকে সম্পদ ও জীবিকার কল্যাণের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

গুরুত্বের দিক থেকে উপরোক্ত প্রতিটি কল্যাণের তিনটি স্তর রয়েছে। জরুরি, প্রয়োজন এবং শোভনীয়। জরুরি প্রয়োজনের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ। আবার প্রয়োজন শোভনীয়ের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ মূল কল্যাণ অব্যাহত রাখার উপায় হিসেবে যেখানে জরুরির দরকার নেই সেখানে প্রয়োজনকে গ্রহণ করা আবার যেখানে প্রয়োজনীয়তা অক্ষুন্ন রাখা দরকার নয় সেখানে শোভনকে গ্রহণ করা। তিনটির প্রত্যেকটিই তার সম্পূরকের উপর প্রাধান্য পাবে। এ বিষয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর বলেছেন, কল্যাণ বিকাশের তারতম্য অনুযায়ী এগুলো এভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হলো জরুরি স্তর[৪৩৩]।

এটা হলো বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দু'টো কল্যাণ নিহিত থাকলে প্রাধান্য দেয়ার প্রক্রিয়া। কিন্তু একই স্তরের মধ্যে যদি দু'টি কল্যাণের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় অর্থাৎ কল্যাণই জরুরি কিংবা প্রয়োজনীয়তা বা শোভনের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে প্রত্যেকটির সাথে আলাদা ভাবে জড়িত থাকা অবস্থায় সম্পৃক্ততার তারতম্য অনুযায়ী দু'টি কল্যাণের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। সুতরাং দ্বীনের হেফাযতের সাথে জরুরির সম্পৃক্ততাকে প্রাণের হেফাযতের সাথে জরুরির সম্পৃক্ততার উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। এভাবেই অন্যান্য স্তরগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে :

কিন্তু যখন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী কল্যাণ প্রতিটির সাথে সম্পৃক্ত হয় যেমন দ্বীন কিংবা প্রাণ বা জ্ঞান অথবা বংশ বা সম্পদ তখন মুজতাহিদকে মাপকাঠি নির্ণয়ের জন্যে ২য় একটি সূত্রের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। আর ২য় সূত্রটি হলো সম্পূরকের পরিমাণের উপর ভিত্তি করা। এক্ষেত্রে দু'টি কল্যাণের মধ্যে অধিকতর স্বাভাবিক কল্যাণকে সম্পূরক হিসেবে অধিকতর সংকীর্ণ ও বৈশিষ্ট্যময় কল্যাণের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুতরাং সামষ্টিক কল্যাণ ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর প্রাধান্য পাবে এবং জাতিগত কল্যাণ সামষ্টিক কল্যাণের উপর প্রাধান্য পাবে। কেননা সাধারণ বস্তুর মধ্যে বিশেষ বস্তু লুক্কায়িত থাকে।

সম্পূরকের দৃষ্টিভঙ্গিসহ ৩য় আর একটি সূত্রের প্রতি দৃষ্টি দেয়া জরুরি। সেটা হলো বহিরাঙ্গণে এটা অর্জনের ইচ্ছা শক্তি। কারণ কাজ বাহিরের প্রভাবের ফলাফল অনুযায়ী কল্যাণকর কিংবা ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আর এসব প্রভাব কখনো সন্দেহাতীত কিংবা সন্দেহযুক্ত ও সংশয়ময় অথবা দ্বিধান্বিত হয়ে থাকে।

---

[৪৩৩] শিফাউল গালীল পৃষ্ঠা ১০৪ ও ১৩৩ ।

www.pathagar.com

অধিকার প্রয়োগে অস্পষ্টতা কিংবা অধিকারে অনিষ্টতা

ইসলামের প্রতিটি দাবীর উৎস হলো আল্লাহ তায়ালার শরিয়াহ। অন্যথায় অধিকার বিধিবদ্ধ হতো না। ইসলামি বিধানে পৃষ্ঠপোষকতা করার অবকাশ থাকতো এবং প্রশ্রয় দেয়ার কোন সুযোগ থাকতো না। শরিয়াহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এসব অধিকার প্রয়োগের কতগুলো পন্থা রয়েছে। অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে এসব পন্থার খেলাফ কাজ করলে ইহকাল কিংবা পরকালে সে আল্লাহ তায়ালার রোষানলে পরবে এবং জবাবদিহিতা থেকে নিস্কৃতি পাবে না। সুতরাং অধিকার পাওয়া কিংবা অধিকার প্রয়োগ করার ব্যাপারে শরিয়াহসম্মত অনুমতি থাকা বাঞ্ছনীয়। এ প্রয়োগ কখনো উদ্দেশ্যপ্রনোদিত কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে অপরের জন্যে ক্ষতির সৃষ্টি করে থাকে। অপর বলতে দল কিংবা একক হতে পারে। আর ক্ষতি বলতে দৃঢ় কিংবা অন্য কিছুও হতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কল্যাণের বিস্তৃত ক্ষেত্র

দ্বীনের কল্যাণের হেফাজত

এখানে চারটি বিষয়ের আলোচনা করা যায় :

এক. দ্বীন শব্দের আভিধানিক ও শরীয়াত ভিত্তিক অর্থ এবং দু'টি অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক।

দুই. পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের তাৎপর্য ও এর স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালার কাছে এটিই একমাত্র দ্বীন এবং মানুষের জন্য এ দ্বীনের প্রয়োজন।

তিন. দ্বীনের সংরক্ষণের ধনাত্মক পদ্ধতি

চার. দ্বীনের সংরক্ষণের ঋণাত্মক পদ্ধতি

প্রথম বিষয়টির আলোচনা

দ্বীনের আভিধানিক অর্থ

একক শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা যখন আরবি অভিধানগুলোর প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করি[৪৩৪] তখন দেখি দ্বীন শব্দটি সেখানে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রাজ্য, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মর্যাদা, নমনীয়তা, আনুগত্য, ধর্ম, চরিত্র ইত্যাদি।

আবার যখন শব্দটির গঠণ প্রণালী ও তার ধাতুরূপের প্রতি দৃষ্টি দেই তখন আমরা সেখানে তিনটি অর্থ পাই। এ অর্থগুলোর একটির সাথে অন্যটির অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে কখনো دين শব্দটি সকর্মক ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয। বলা হয় : يُدِيْنه তাকে বদলা দেয়া হয়েছে। আবার لام সংযোগ সহকারে সকর্মক ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন دان له সে নিজেকে বদলা দিয়েছে। অবার কখনো باء সংযোগ সহকারে সকর্মক ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় : دان به সে বদলা দিয়েছে। আবার শব্দটির উৎসের বিভিন্নতার কারণে তার ভেতরের চেহারাও বদলে যায়, যার ফলে তার বাচ্য, কাল ও ক্রিয়ার প্রকরণের মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়।

---

[৪৩৪] আল কামুসুল মুহীত খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৫, আল মিসবাহুল মুনীর, পৃষ্ঠা ৩১৫, আন নিহায়া ফী শারহিল হাদিস খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৮।

www.pathagar.com

যেমন আমরা বলি : دانه دينا অর্থাৎ সে তাকে বদলা দিয়েছে যেমন বদলা দিতে হয়। এর উদ্দেশ্য হয়, সে ঐ জিনিসটির মালিক হয়েছে, সেটির উপর কর্তৃত্ব ও অধিকার লাভ করেছে, সেটি পরিচালনা করেছে, তার উপর নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে বৈধ করে নিয়েছে। مالك يوم الدين অর্থাৎ বদলা দেবার দিনের মালিক বাক্যের মধ্যেও দ্বীন শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত এখানে দ্বীন শব্দটির ব্যবহারও রাজার পক্ষ থেকে ক্ষমতার ব্যবহার বুঝাচ্ছে। তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ব্যবহার করেছেন এবং হিসাব নিকাশ করছেন ও প্রতিদান দিচ্ছেন। হাদিস বলা হয়েছে : الكيسُ من دان نفسه বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজেই নিজের প্রতিদান দেয়। অর্থাৎ যে নিজের উপর কর্তৃত্বশালী, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেকে যথাযথ প্রতিদান দেয়[৪৩৫]।

যখন আমরা বলি دَانَ لَه তখন এর উদ্দেশ্য হয়, সে তার আনুগত্য করলো এবং তার জন্য নত হলো। এখানে দ্বীন শব্দের অর্থ হয় : বিনত হওয়া, আনুগত্য করা, ইবাদত করা। আর يكون الدِّين لله বাক্যের হুকুম ও আনুগত্য এ দু'টি অর্থ গ্রহণ করা সঠিক হবে। এখানে দ্বিতীয় অর্থটি প্রথমটির অনুগামী ও সহযোগী। বলা হয়: دَانَه فَدَانَ له অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে অনুগত করেছে এবং সে নত হয়েছে ও অনুগত হয়েছে।

আর যখন আমরা বলি, دَانَ بِالشيِّ তখন এর উদ্দেশ্য হয় : সে তাকে গ্রহণ করেছে দ্বীন ও মযহাবরূপে। অর্থাৎ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে অথবা তার রঙে রঙ্গীন হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দ্বীন হচ্ছে, মানুষ যা সহজ করে নেয় চিন্তাগতভাবে বা কর্মগতভাবে। যেমন বলা হয় : هذا ديني وديدني এ হচ্ছে আমার দ্বীন এবং আমার অভ্যাস।

এখান থেকে আমরা জানছি যে, এর তৃতীয় ব্যবহারটি পূর্ববর্তীদের অনুগামী। কারণ অভ্যাস বা বিশ্বাস, যা দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত, তা এক ধরনের কর্তৃত্ব এবং তার সহযোগীর উপর আধিপত্য বিস্তার, যা এক পর্যায়ে তাকে বিনত করে, যার ফলে সে তার অনুগত হয়[৪৩৬]।

---

[৪৩৫] আন নিহায়া ফী গারীবিল হাদিস লি ইবনিল আসীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৮ এবং তামামুল হাদীসে ফীহা ওয়া আমেলো লিমা বাদাল মওত।

[৪৩৬] আল নিহায়া ফী গারীবিল হাদিস-ত্বহা ঈসা আল হালাবী খণ্ড ২, ১৪৮-১৫০ ও ১৮৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

মোটকথা, আরবি ভাষায় দ্বীন শব্দটি দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি ইঙ্গিত করে। দ্বীন তাদের এক পক্ষকে উন্নত এবং অন্যপক্ষকে বিনত করে। প্রথমপক্ষ যখন বিনত হয় তখন দ্বিতীয় হয় উন্নত, ক্ষমতাশীল ও আধিপত্য বিস্তারকারী। আর দ্বীন যখন উভয়পক্ষের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তা আকীদা, বিশ্বাস ও ধর্মে পরিণত হয় এবং এর মাধ্যমে গড়ে ওঠে আচার-আচরণ ও আইন বিধান, যার ফলে ঐ সম্পর্ক একটি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করে।

ধাতুগত দিক দিয়ে দ্বীন শব্দের অর্থ হয় অপরিহার্য আনুগত্য এবং এ আনুগত্যের পেছনে থাকে শক্তি প্রয়োগ ও কর্তব্যপরায়নতা। যেমন দাইন (دَين) শব্দটি একই অর্থে অবস্থান করে। কারণ دائن অর্থাৎ ঋণদাতা প্রভাবশালী হয় ঋণগ্রহীতার উপর। অন্য দিকে ঋণগ্রহীতা অনুগত ও বিনত থাকে। এভাবে দ্বীন শব্দের আভিধানিক অর্থ হয় অনুগত ও বিনত হওয়া।

শরিয়াহর আলেমগণের দৃষ্টিতে দ্বীন এর সংজ্ঞা

শরিয়াহর জ্ঞান সম্পন্ন আলেমগণ দ্বীন শব্দের সংজ্ঞা এভাবে নির্ণয় করেছেন : আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এমন এক ব্যবস্থা যা, ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারীদেরকে তাদের প্রশংসনীয় ক্ষমতার সাহায্যে পার্থিব জীবনকে কল্যাণের দিকে এবং পরকালীন জীবনকে সাফল্য ও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়[৪৩৭]।

এখানে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত বলা হয়েছে। এর ফলে মানুষের ক্ষমতা বাতিল হয়ে গেছে। কারণ মানুষ বুদ্ধির ভিত্তিতে অথবা সংস্কার ও বিভ্রমে আক্রান্ত হয়ে সবকিছু গ্রহণ করে। এগুলো আসলে দ্বীন নয়, যদিও দ্বীন শব্দ তার জন্যও ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে তার সে দ্বীন কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে[৪৩৮]।

---

৪৩৭ আল মিরআত ফিল উসূল খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১, ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দারায, কিতাব আদ দীন, পৃষ্ঠা ৯

৪৩৮ সুরা আলে ইমরান, ৮৫ আয়াত।

www.pathagar.com

এখান থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই যে, সত্য দ্বীন প্রদান করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা মানুষের নেই। মানুষের বুদ্ধি, সংস্কারবোধ বা কল্পনা প্রবণতা এ যোগ্যতা রাখেনা। ওহির মাধ্যমে ছাড়া এ পদ্ধতিতে যা কিছু তার কাছে এসে পৌঁছাবে সবই বাতিল এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে অগ্রহণযোগ্য।

শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষ যেসব মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেগুলোও সত্য দ্বীনের সন্ধান লাভে ব্যর্থ। অন্য দিকে ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারী শব্দগুলোর মাধ্যমে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রাণীকুলের স্বাভাবিক প্রেরণা ও অনুপ্রেরণা শক্তি, যার সাহায্যে তারা নিজেদের কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হয়, তা দ্বীন এর সংজ্ঞার বাইরে চলে যায়। আর তাদের প্রশংসনীয় ক্ষমতা শব্দাবলীর মাধ্যমে ঘটনাক্রমে ও বাধ্যগতভাবে মানুষ ভাল বা মন্দ স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির ন্যায় অন্যান্য যা কিছু অর্জন করে তাও দ্বীন এর সংজ্ঞার আওতাবহির্ভুত হয়।

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যথার্থ পরিপূর্ণতার অর্থে দ্বীন কখনো জোর বা জবরদস্তি দ্বারা অর্জিত হয় না। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালার এ বাণী :

لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই[৪৩৯]।

এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে। لا তথা নেই শব্দটি এখানে স্রেফ না-সূচক হোক অথবা তা আমরা নিষিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করি না কেন উভয়ই সমান। না-সূচক অর্থ করলে যে ফলাফল হবে নিষিদ্ধ অর্থ করলে সে ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতা না- এর কারণ হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং তার ফলও হবে জোর-জবরদস্তির পথে দ্বীন অর্জন না করা। কাজেই জোর-জবরদস্তি করে দ্বীন অর্জন করলে কোন ফায়েদা নেই।

আলেমগণ এ আয়াতটির অর্থ গ্রহণে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, এটা কোন আপত্তির বিষয় নয়। এক দলের মতে নবি সা. যখন আরবদেরকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য জোর খাটালেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুতে রাজি হলেন না আল্লাহ তায়ালার এ আয়াতের ভিত্তিতে-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ

---

[৪৩৯] সুরা আল বাকারা- ২৫৬ আয়াত।

www.pathagar.com

হে নবি! কাফের ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ কর,[৪৪০]

তখন লা- ইকরাহা- এর আয়াতটি 'মানসূখ' তথা রহিত হয়ে গেছে। অন্য দল বলেন, আয়াতটি মানসূখ হয়নি। বরং এটি বিশেষভাবে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। তারা জিযিয়া বা কর দিতে রাজি হলে তাদেরকে আর ইসলাম গ্রহণের জন্য জোর দেয়া হতো না। অবশ্য মূর্তি পূজারীদের উপর জোর খাটানো হতো। ইসলাম গ্রহণ ছাড়া তাদের থেকে আর কিছুই গ্রহণীয় ছিল না।

তৃতীয় এক দলের মতে আয়াতটি আনসারদের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। কারণ আনসারদের কোন কোন ছেলে ইয়াহুদী ভাবাপন্ন হয়ে গেলে তাদের মায়েরা তাদের সাথে বাস করা কঠিন মনে করতো। কাজেই মায়েরা হয়ে যেতে। ছেলেদের থেকে বিচ্ছিন্ন। যেমন বনী নাযীরের মধ্যে আনসারদের অনেক যুবক বসবাস করতো। তারা বললো, আমরা আমাদের সন্তানদের আহ্বান করবো না ইসলামের দিকে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

অন্য এক দলের মতে আয়াতটি নাযিল হয় বন্দীদের প্রসঙ্গে। বন্দীরা আহলে কিতাব এবং বয়স্ক ও প্রবীন হলে তাদের ওপর জোর খাটানো হতো না। আর যদি তারা অল্প বয়স্ক বা প্রবীন অগ্নি পূজারী ও মূর্তি পূজারী হতো তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য জোর খাটানো হত। কারণ তাদের মালিকরা তাদের থেকে লাভবান হতে পারতো না। মূর্তি পূজক হবার কারণে তাদের জবাই করা প্রাণী খাওয়া যেতো না, তাদের মেয়েদের সাথে সঙ্গম করা যেতো না, তারা মৃত প্রাণী খেতো এবং আরো বিভিন্ন নাপাকির সাথে তারা জড়িত ছিল[৪৪১]।

বলা হয়, আনসারদের আবু হুসাইন নামক এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তার দুই ছেলেকে মদিনায় আগত সিরিয়ার কিছু ব্যবসায়ী খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দেয়। তারা দু'জন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে তাদের সাথে সিরিয়ায় চলে যায়। তাদের পিতা রসুল সা.-এর কাছে তাদের ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানায়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

এ সমস্ত বক্তব্যে বাহ্যিক ও প্রকাশ্য জোর জবরদস্তিমূলক বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। যার ফলে আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক না রেখেও কথায় ও কর্মে ইসলামের বাহ্যিক বিধি বিধানের অধীনতা স্বীকার করে তার মধ্যে প্রবেশ করা হয়।

---

[৪৪০] সুরা তাওবাহ ৭৩ আয়াত, সুরা আত-তাহরীম ৯ আয়াত।

[৪৪১] তাফসির, আল কুরতুবী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮০-২৮১।

www.pathagar.com

আর আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, জোর-জবরদস্তি করে তা অর্জিত হয় না।

এখন আয়াতটি আনসারদের প্রসঙ্গে বা তাদের শুধু ঐ বিশেষ প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য এমন নয়। কারণ কেবল আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ কার্যকারণ নয় বরং শাব্দিক ব্যাপকতার মধ্যেই তার শিক্ষা নিহিত। আহলে কিতাবদের প্রসঙ্গে আয়াতটি আসলে কেবলমাত্র বাহ্যিক জবরদস্তি অর্থেই নাযিল হয়। অন্য দিকে রসুল সা. আরবের মুশরিকদের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মেনে নেননি। সম্ভবত মুশরিকরা ইতোপূর্বে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা চালিয়েছিল এ ছিল তারই ফল। অথবা তারা অন্যের জন্য শিক্ষণীয় স্থানে অবস্থান করছিল। ফলে তাদের বাহ্যত হলেও ইসলামের বিধানের আওতাধীন হওয়া জরুরি ছিল। অথবা তারা বা অন্যান্য মুশরিক অগ্নিপূজক ও মূর্তি পূজারী সম্প্রদায়গুলো আল্লাহ তায়ালার আয়াতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল এবং কুফরি ও কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই তারা বাহ্যত হলেও ইসলামি বিধানের ছায়াতলে এসে গেলে তার নিকটতর হবার সুযোগ লাভ করে। ফলে সচেতনভাবে পূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে।

পার্থিব জীবনকে কল্যাণের দিকে অর্থ হচ্ছে পার্থিব সুখ এবং পরকালীন জীবনকে সাফল্য ও উন্নতির দিকে অর্থ হচ্ছে পরকালীন সুখ। এ সুখ অর্জিত হয় ব্যক্তির বেহেশতের চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভ এবং জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির মাধ্যমে।

এই বিস্তারিত আলোচনার পর এখন বলা যেতে পারে যে, দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি পদ্ধতি, যা তিনি তাঁর রসুলদেরকে প্রদান করেছেন মানুষকে পরিচালিত করার জন্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের পথে এবং আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কল্যাণের পথে। আর ঐ পদ্ধতি ও অধীনতার আওতাধীন হয়ে সে কতিপয় আদেশ ও নিষেধের বিধান লাভ করে, যা তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের বার্তা বহন করে আনে।

দ্বীন শব্দের আভিধানিক ও শরয়ি অর্থের মধ্যে সম্পর্ক

ইতোপূর্বে বলেছি দ্বীন শব্দের সুস্পষ্ট আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : অধীনতা ও আনুগত্য। এ অর্থটি দ্বীনের শরয়ি অর্থের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। তবে শরয়ি অর্থটির পরিসর আভিধানিক অর্থের তুলনায় কিছুটা সংকীর্ণ। কারণ অধীনতা শব্দটি কখনো আল্লাহ তায়ালার জন্য আবার কখনো গায়রুল্লাহ যেমন মানুষ, পাথর, পশু,

www.pathagar.com

নক্ষত্র, চন্দ্র ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শরিয়াহ অর্থে দ্বীন শব্দটি কেবলমাত্র এক আল্লাহ তায়ালার জন্য ব্যবহৃত হয়।

তারপর অধীনতা শব্দটি আভিধানিক অর্থে বাহ্যিক অধীনতা প্রকাশ করে। কারণ এর পেছনে রয়েছে জোর ও শক্তি প্রয়োগ। আর আন্তরিক অধীনতা হয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। আল্লাহ তায়ালার অধীনতা বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় দিক দিয়েই হয়। এখান থেকেই ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অধীনতার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

যদি আমরা সামগ্রিকভাবে মহাশূণ্য জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখি এই মহাশূণ্য জগত তার বিপুল ব্যবস্থাপনা, পরিসর, গতিশীলতা ও বিস্তারসহ একটি জবরদস্ত শক্তির অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে প্রত্যেকটি জিনিস পরিমাণ মত অবস্থান করছে যা তারা লংঘন করে না। প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে এবং সেই মেয়াদ কেউ অতিক্রম করছে না। এভাবে যদি আমাদের এই ভূ-পৃষ্ঠের দিকে তাকাই তাহলে এখানে দেখি সূর্য ও নক্ষত্ররাজি থেকে একটি বিশেষ দূরত্ব বজায় রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো, উত্তাপ, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ইত্যাদিসহ এ গ্রহটি তার কক্ষ পথে এগিয়ে চলছে। অনুরূপভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রাণীকুলের প্রতি তাকালে আমরা দেখি, তারা প্রত্যেকে বার্ধক্য ও জরার আইনে বাঁধা এবং তারপর অবশেষে প্রকাশ্য মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এ সবই প্রাকৃতিক অধীনতার প্রভাব। এর কিছুটা সচেতন এবং কিছুটা অসচেতন ও বাধ্যতামূলক। যেমন উর্ধ্বাকাশে যে উড়ে বেড়ায় সে আসলে বায়ুমণ্ডলের অধীনতা স্বীকার করেছে। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হোক এর মধ্যেই তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে। তবে ভক্তের অধীনতা সচেতন ও ইচ্ছাকৃত উভয়ই। যখন সে তার মাবুদের সামনে নত হয় এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে সিজদা করে তখন মনের তাগিদেই তা করে, ঘৃণা মিশ্রিত অনিচ্ছা সহকারে নয়। কারণ সে শক্তি প্রয়োগের প্রভাব অস্বীকার করে পবিত্র মানসিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই একাজে ব্রতী হয় এবং সন্তুষ্ট চিত্তে যথার্থ পাত্রে এ অধিকার দান করে[৪৪২]।

ইবাদত-বন্দেগী ও পূজা-উপাসনার মাধ্যমে যে অধীনতা স্বীকার করা হয় এবং সাধারণ দাসত্বের মাধ্যমে যে অধীনতার স্বীকৃতি দেয়া হয় এখান থেকেই তার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরই ইঙ্গিত বহন করছে আল্লাহ তায়ালার বাণী :

---

[৪৪২] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দারায, কিতাব আদ দীন পৃষ্ঠা ৪৪।

www.pathagar.com

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার সামনে সিজদাবত হচ্ছে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়[৪৪৩]।

এ থেকে আমরা জানতে পারি, দ্বীন শব্দটি যখন দ্বীনদারী ও ধর্মপ্রাণতা অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তার মধ্যে সাধারণের অধীনতা ও আনুগত্য শামিল হয়ে যায়। অন্যদিকে এর শরিয়াহ অর্থের মধ্যে এক আল্লাহ তায়ালার অধীনতা প্রকাশ পায়। আর এ অধীনতা ও আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বিধানের যা তিনি নাযিল করেছেন। তারই মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করতে হবে এবং সঠিক পথে চলতে হবে।

[৪৪৩] সুরা আর রা'আদ- ১৫ আয়াত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনা

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের তাৎপর্য ও স্বরূপ, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এটিই একমাত্র দ্বীন এবং মানুষের জন্য এর প্রয়োজন

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

ইমান, ইসলাম, বিশ্বাস ও কর্ম সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন গড়ে ওঠে। ইসলাম ও ইমান শব্দ দু'টির পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপরে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি :

একদলের মতে ইমান ও ইসলাম দু'টি সমার্থক শব্দ। অন্যদলের মতে দু'টি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তৃতীয় দল বলেন, শব্দ দু'টি পরস্পর পরিপূরক। এই অর্থের বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে এই যে, শব্দ দু'টি কুরআন ও হাদিসে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে আলেমগণের মধ্যে এর অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

এ শব্দ দু'টিকে আমরা তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবো।

এক. আভিধানিক অর্থে শব্দ দু'টির উদ্দেশ্য ও ভাবধারা।

দুই. শরিয়াহর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ।

তিন. শরিয়াহর বিধানে এর ব্যবহার।

আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ইমান বলা হয় বিশ্বাসকে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا

কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না[৪৪৪]।

আর ইসলাম বলা হয় আত্মসমর্পণ করাকে। জিহ্বার সাহায্যে তার স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তার আনুগত্য করা হয়। কাজেই শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ইমান বিশেষ ক্ষেত্রে।

---

[৪৪৪] সুরা ইউসূফ ১৭ আয়াত।

www.pathagar.com

এভাবে ইমান ইসলামের শ্রেষ্ঠতম অংশে পরিণত হয়। ফলে প্রত্যেকটি বিশ্বাসের পরে আসে আনুগত্য, কিন্তু প্রত্যেকটি আনুগত্যের পেছনে বিশ্বাস থাকে না। কাজেই আভিধানিক দিক দিয়ে ইসলাম ও ইমানের মধ্যে শর্তশূণ্য ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতার সম্পর্ক বিদ্যমান[৪৪৫]।

শরিয়াহ প্রয়োগের দৃষ্টিতে

ইসলাম ও ইমান শব্দ দু'টি কখনো সমার্থক, কখনো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এবং কখনো পরিপূরক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সমার্থক যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ

সেখানে যেসব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম। এবং সেখানে একটি পরিবার ছাড়া কোন মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি[৪৪৬]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ

আর মুসা বলল : হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান এনে থাক তাহলে তার উপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী হও[৪৪৭]।

নবি সা. বলেন :

بُنِيَ الاسلام على خمسٍ.

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

---

[৪৪৫] এহইয়াউ উলুমিদ দীন খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩ এবং দায়েরাতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া শায়খ মুস্তফা আবদুর রাজ্জাকের আলোচনা খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৪।

[৪৪৬] সুরা আয যারিয়াত ৩৫-৩৬ আয়াত।

[৪৪৭] সুরা ইউসূফ ৮৪ আয়াত।

www.pathagar.com

وسُئِلَ عليه الصلاة والسلام عَنِ الإيمان فَأجابَ بِهٰذِه الخمس.

নবি সা.-কে ইমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি ঐ পাঁচটি বুনিয়াদের কথা বললেন।

ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বাণী উদ্ধৃত করা যায় :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا

গ্রামীণ আরবরা বলল : আমরা ইমান এনেছি। (হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, তোমরা ইমান আনোনি বরং তোমরা বল, আমরা বাহ্যত মুসলিম হয়েছি[৪৪৮]।

এখানে ইমান মানে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ইসলাম মানে কণ্ঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে বাহ্যত ইসলামের বশ্যতা স্বীকারের কথা প্রকাশ করা।

আর পরিপূরক অর্থে নবি সা.-এর হাদিস বর্ণনা করা যায় :

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: শ্রেষ্ঠ কাজ কী? জবাব দিলেন : ইসলাম। প্রশ্নকর্তা আবার জিজ্ঞেস করলো : কোন ইসলাম শ্রেষ্ঠ? জবাব দিলেন : ইমান।

এখানে ইসলাম ও ইমান একদিকে ভিন্ন অর্থ এবং অন্যদিকে পরিপূরক অর্থ প্রকাশ করছে। আভিধানিক অর্থে এটিই ইসলাম ও ইমানের সর্বাধিক সহযোগিতামূলক ব্যবহার। কারণ ইমান এখানে আমলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং তা শ্রেষ্ঠ ইসলাম। অন্যদিকে ইসলাম হচ্ছে আত্মসমর্পণ। এ আত্মপসমর্পণ অন্তরের সাহায্যে এবং কণ্ঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যেও। আর এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণ তথা ইসলাম হচ্ছে অন্তর দিয়ে এবং তা হচ্ছে বিশ্বাস[৪৪৯]।

উমদাতুল কারী গ্রন্থের লেখকের মতে, ইসলাম ও ইমানের মধ্যে ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতার সম্পর্ক আছে একদিক দিয়ে। কারণ ইমানও কখনো কখনো ইসলাম ছাড়া পাওয়া যায়। যেমন জনমানবহীন সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গে বসবাসকারী নিঃসঙ্গ এক ব্যক্তির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর আগেই তার নিজের হৃদয়ের অনুভূতি ও স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলী অনুধাবন করতে পারলো। অনুরূপভাবে একজন কাফের ইমান যা কিছুকে অপরিহার্য করে

---

[৪৪৮] সুরা আল হুজুরাত- ১৪ আয়াত।

[৪৪৯] এহইয়াউ উলুমিদ দ্বীন খণ্ড ১, ১০৩ আয়াত, উমদাতুল কারী আলা শারহিল বুখারি, খণ্ড ১, ১২৮ আয়াত।

www.pathagar.com

এমন সবকিছুকে সে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করলো এবং তারপর একদিন একথা সে কণ্ঠে উচ্চারণ করার আগে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করলো[৪৫০]। এহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী রহ. এবং মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম নব্বী এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

ইরশাদুস সারী গ্রন্থে বলা হয়েছে : ন্যায়ত ইমান ইসলাম বিহীন হতে পারে না। এ দু'টি পরস্পর সত্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। তাদের অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ঠিকই। কারণ ইমান বলা হয় আন্তরিক বিশ্বাসকে এবং ইসলাম বলা হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্যক্রমকে। তবে সামগ্রিকভাবে শরিয়াহর দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকে মুমিন বলা হবে কিন্তু মুসলিম বলা হবে না অথবা মুসলিম বলা হবে কিন্তু মুমিন বলা হবে না, এমনটি সঠিক নয়[৪৫১]।

এ ছিল শরিয়াহর বিভিন্ন ক্ষেত্রে শব্দ দু'টি প্রয়োগের ব্যাপারে শরিয়াহ অভিজ্ঞ কতিপয় আলেমের অভিমত। ইসলাম ও ইমানের বিধান ইহকালীন ও পরকালীণ দু'ভাগে বিভক্ত। পরকালীন বিধানে রয়েছে জাহান্নাম থেকে বের হওয়া এবং তার মধ্যে চিরকাল না থাকা।

যেমন নবি সা. বলেন :

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ.

> যে ব্যক্তির দিলে একটি ক্ষুদ্র বালুকতা পরিমাণও ইমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

এ হুকুমটি কিসের ভিত্তিতে কার্যকর হবে এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্নমত পোষণ করেছেন। কারো মতে নিছক আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে এর নিষ্পত্তি হবে। আবার অন্যদের মতে অন্তরের বিশ্বাস, কণ্ঠের সাক্ষ্যদান এবং অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গের কার্যক্রমের ভিত্তিতে এর ফায়সালা হবে[৪৫২]।

মোটকথা সর্বাবস্থায় অন্তরের বিশ্বাস, কণ্ঠের সাক্ষ্য দান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মকাণ্ড এ সবগুলোর পারস্পরিক সংযোগের ভিত্তিতেই এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, এ

---

[৪৫০] এহ্ইয়াউ উলুমিদ দ্বীন খণ্ড ১, ১০৩ আয়াত, উমদাতুল কারী আলা শারহিল বুখারি, খণ্ড ১, ১২৮ আয়াত।

[৪৫১] ইরশাদুস সারী আলা শারহিল বুখারি খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫।

[৪৫২] বুখারি ও মুসলিম, আল এহইয়া খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৪, আল কাশশাফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮।

www.pathagar.com

ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। এটা হচ্ছে একটা মর্যাদা ও শ্রেণি। আবার এক ব্যক্তির বিশ্বাস, সাক্ষ্য দান ও কিছু কিছু আমল সঠিক কিন্তু সে কবীরা গুনাহ্ অথবা কয়েকটা কবীরা গুনাহ করেছে। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ও মু'তাযিলাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। মু'তাযিলাদের মতে, কবীরা গুনাহ্ বা কতিপয় কবীরা গুনাহ্ করার ফলে সে ইমান থেকে খারিজ হয়ে গেছে। আবার সে কুফরীর মধ্যেও প্রবেশ করেনি। এবং তাকে ফাসেক বলা হবে। সে দু'টি অবস্থানের মাঝামাঝি একটি স্থানে অবস্থান করছে। তাদের মতে সে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। অন্যদিকে আহলে সুন্নাতের মতে, সে একজন গুনাহ্গার মুমিন। সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না।[৪৫৩] এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণি।

এক ব্যক্তির বিশ্বাস আছে এবং সে মৌখিক সাক্ষ্যদানও করেছে কিন্তু আমল করেনি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে। আবু তালেব মক্কীর মতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে আমল করাটাও ইমানের অংশ। এছাড়া ইমান পূর্ণ হবে না। তিনি এর ওপর ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবী করেছেন। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে বরং এ ব্যক্তির ইমান আছে কিন্তু আমল নেই। এটি হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণি।

অন্য দিকে এক ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করলো কিন্তু কণ্ঠে তা উচ্চারণ করার বা কোন আমল করার পূর্বে মারা গেল। এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে। সে মুমিন কি না? যারা ইমানের পূর্ণতার জন্য সাক্ষ্য দানের শর্ত আরোপ করেন তাদের মতে সে মুমিন নয়। আবার যাদের মতে কেবলমাত্র অন্তরের বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইমান অর্জিত হয় তারা বলেন সে মু'মিন। এটা হলো চতুর্থ শ্রেণি[৪৫৪]।

ইতোপূর্বেকার আলোচনাগুলো গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে আমরা জানতে পারি যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলতে সবাই তার বাইরের ও ভেতরের উভয় দিকই বুঝিয়েছেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত। পূর্ণাঙ্গ ইমানের ব্যাপারেও একই কথা। উমদাতুল কারী গ্রন্থের লেখক বলেন : একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, বিরোধ নিছক ইমান শব্দটি নিয়ে। কিন্তু কামেল বা পূর্ণাঙ্গ ইমানের জন্য একই সাথে বিশ্বাস, সাক্ষ্য দান ও আমল তিনটিরই প্রয়োজন অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে[৪৫৫]।

---

[৪৫৩] আল এহইয়া খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৪, আল কাশশাফ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮।

[৪৫৪] কাশশাফ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৫।

[৪৫৫] উমদাতুল কারী আলা শারহিল বুখারি খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৯।

www.pathagar.com

সারকথা হচ্ছে : ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বশ্যতা, অধীনতা, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার করা। এ আভিধানিক অর্থই এর শরিয়াহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে

স্থানান্তরিত হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلهِ

অতঃপর বল আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসর্পণ করছি[৪৫৬]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً

তারা কি চায় আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে[৪৫৭]।

ইসলাম শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহার দেখা যায়। যেমন সমস্ত প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকে ইসলাম বলা হয়। ঐতিহাসিক ঘটনার উপরও ইসলাম শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন ইসলামের যুগ অথবা তার সূচনা বা প্রকাশ।

এ সমস্ত প্রয়োগের মধ্যে মুহাম্মদ সা.-এর কাছে প্রেরিত দ্বীনের মধ্যে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এখানে এর ব্যবহার হয় আকীদা-বিশ্বাসের নীতি, ইবাদাতের বিধানাবলী, নৈতিক শিক্ষা ও শরিয়াহর অনুশাসনের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যে একই উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম[৪৫৮]।

---

[৪৫৬] সুরা আল ইমরান- ২০ আয়াত।

[৪৫৭] সুরা আল ইমরান- ৮৩ আয়াত।

[৪৫৮] সুরা আল মায়েদাহ- ৩ আয়াত।

www.pathagar.com

এ অর্থে অন্যান্য ধর্মকে এর মোকাবিলায় দাঁড় করানো যায়। যেমন ইয়াহুদী ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্ম। এর অস্বীকারকারী যেকোন বিশ্বাসের অধিকারীই হোক না কেন তাকে কুফরীর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। কুফরী অর্থ হবে অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, আবরণ দেয়া ও ঢেকে ফেলা। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ সা., যাঁর মাধ্যমে এ দ্বীন এসেছে, তাঁর নবুওয়াতকে সামনে রাখা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে ইমান হচ্ছে নিছক বিশ্বাস। শরিয়াহর দৃষ্টিতে নবি সা. এ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তার অপরিহার্য ফলস্বরূপ এর আগমনের পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি এর আগমনের পথ বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে যেভাবে বাতলেছেন তা ঠিক তেমনিই। শরিয়াহ ও আভিধানিক অর্থের মধ্যে এক্ষেত্রে নিছক ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতার সম্পর্ক রয়েছে। নবি সা.-এর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা একত্র হয় এবং নিছক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেবল আভিধানিক অর্থই প্রযোজ্য হয়[৪৫৯]।

শরিয়াহর দৃষ্টিতে ইসলাম ও ইমানের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পূর্ণাঙ্গ ইসলামের জন্য অন্তরের ও বাইরের উভয়ের সম্মিলন অপরিহার্য। ইমানের ব্যাপারেও একই কথা। এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে উমদাতুলকারী গ্রন্থের লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। এর বিরুদ্ধ মতও আছে।

একদলের মতে, আমল হচ্ছে ইমানের প্রকৃত সত্তার অংশ এবং তা তার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। আমলের বিলুপ্তিতে ইমানও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অন্য দলের মতে, আমল প্রচলিত রীতিনীতির বিভিন্ন অংশ। কাজেই আমলের বিলুপ্তিতে ইমানের প্রকৃত সত্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। এগুলো ঠিক যেন ব্যক্তি করীমের হাত, পা, চুল, নখ ইত্যাদি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত। এগুলো না থাকলে করীম নেই এ কথা বলা যায় না।

তৃতীয় একদল বলেন, ইমানের কারণে বাইরের প্রভাবে আমলের সৃষ্টি হয়। ইমান শব্দটি তার উপর পরোক্ষভাবে প্রযুক্ত হয়। এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই। এ ব্যাপারে শব্দটিকে তার প্রকৃত সত্তার উপর বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করার দ্বিতীয় সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি শাব্দিক বিতর্ক মাত্র।

---

[৪৫৯] উস্তায মুহাম্মদ মুবারক আবদুল কাদেরের আলোচনা, মওসূআহ নাসের লিল ফিকহিল ইসলামি।

www.pathagar.com

অন্য একদলের মতে, আমল ইমান থেকে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস। একথা যারা বলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন খারেজীদের কয়েকজন। তারা বলেন : গুনাহ ইমানের ক্ষতি করে না, যেমন নেকী কুফরীকে লাভবান করে না[৪৬০]।

এখানে যে সমস্ত অভিমত উদ্ধৃত করা হলো তার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিমত দু'টি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের শরিয়াহ অর্থের সবচেয়ে নিকটতর। কারণ এ দুটি অভিমতে ইমানকে অংশ বা কারণ হিসেবে আমলের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কাজেই আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মধ্যে ইমান ও আমল উভয়ের উপস্থিতি অপরিহার্য। অন্যথায় তা পূর্ণতা ও গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছতে পারবে না। কিছু আয়াতে যথার্থ ইমান বিহীন আমলের জন্য মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে। কিছু আয়াতে সৎ আমলের সাথে সম্পৃক্ত করে ইমানের উল্লেখ করা হয়েছে। শুধুমাত্র বিশ্বাসের সাহায্যে দ্বীন অর্জিত হয়। কিন্তু দ্বীনের পূর্ণতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে লাগাতার আমল করার উপর। একটি হচ্ছে দ্বীনে কামেল বা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন এবং এটিই ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র দ্বীন[৪৬১]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত[৪৬২]।

আমলের সাথে ইমানের সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে কুরআনী পদ্ধতি আমাদের যে সঠিক পথ দেখায় তা হচ্ছে সৎকাজ করা ছাড়া ইমানের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই দুনিয়ায় সুখ ও আখেরাতে মুক্তি ইমান ও আমলের সংযুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়।

---

[৪৬০] আল কালামুঙ্গীর হাশিয়া- খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৬, উমদাতুল কারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮, শারহুন নববী আল মুসলিম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪০, ইরশাদুল বারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫।

[৪৬১] সুরা আলে ইমরান- ১৯ আয়াত।

[৪৬২] সুরা আলে ইমরান- ৮ আয়াত।

www.pathagar.com

যদি আমরা ইমানের সাথে আমলের সম্পর্কের তুলনা করি তাহলে আমরা বলবো : ইমানটা হচ্ছে গাছের মূল ও শিকড়ের মতো এবং আমল তার কাণ্ড, শাখা প্রশাখা ও পত্র পল্লব।

মূলের সাথে কাণ্ডের সম্পর্কের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না। এ সম্পর্ক অংশ বা কার্যকারণ ভিত্তিক যাই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। গাছ বলতে কখনো মূলকে বুঝায় আবার কখনো পরোক্ষভাবে কাণ্ডকেও বুঝানো হয়। কিন্তু তাই বলে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা যাদের আছে তারা কেউ একথা বলতে পারবেন না যে, অংশ সমগ্রের সমান বা কার্যকরণ ও কারণ সূচকের মধ্যে কোন তফাত নেই।

মূলত গাছ থেকে যদি ফল লাভ করতে হয় তাহলে মূল ও কাণ্ডকে একসাথে থেকে একত্রে কাজ করতে হবে। মূল যদি একাই কাজ করে এবং তার সাথে কাণ্ড যুক্ত না হয় বা সহযোগিতা না করে তাহলে যেমন তা ফল দিতে ব্যর্থ হবে ঠিক তেমনি কাণ্ডকে মূল থেকে আলাদা করে দিলে তার ফল দেয়া তো দূরের কথা, জীবনী শক্তিই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

গাছের মূল যেমন লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত সম্মুখে অবস্থিত গাছের অন্য একটি অংশ, ঠিক তেমনি ইমান হচ্ছে দ্বীনের একটি গোপন ও অন্তর্নিহিত দিক এবং আমল তার বাইরের ও বাহ্যিক দিক।

এ বিষয়টি স্থিরীকৃত হয়ে যাবার পর এখন আমরা যদি গাছের মূল ও শিকড়কে জীবিত, সুস্থ, সবল ও নিরাপদ রাখতে চাই তাহলে আমাদের তার কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। যখনই বাহির থেকে গাছকে দেখবো সুন্দর, সবুজ ও সতেজ তখনই আমাদের মনের চোখে ভেসে উঠবে তার মূলের সুস্থতা ও নিরাপদ অবস্থা এবং আমরা বুঝতে পারবো গাছের অন্যান্য অংশগুলোতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করার ক্ষমতা তার বহাল আছে। কোন গাছের মূলকে বাদ দিয়ে তার কাণ্ড থেকে ফল লাভ করার আশা যেমন আমরা করি না তেমনি তার কাণ্ডকে বাদ দিয়ে মূল থেকেও করি না।

অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আমল, যা মানুষের চোখে দেখা যায়, তা তার ইমানের সুস্থতা ও সত্যতা প্রমাণ করে। সত্য ইমান মানুষের আমলকে খাদ্য সরবরাহ ও পরিপুষ্ট করে এবং তার অন্তস্থিত নূরকে দীর্ঘায়িত করে দর্শকদেরকে আনন্দিত ও বিমোহিত করে।

www.pathagar.com

আবার কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা বাতাস ও আলোক থেকে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে তা মূলের দিকে ফিরিয়ে দেয়। এর ফলে মূলের শক্তি ও ভারসাম্য বৃদ্ধি পায়। সৎ আমলও তেমনিভাবে ইমানের দিকে তার ফল ফিরিয়ে দেয়। যার ফলে ইমানের শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পায়। ইমান যদি সত্য হয় তাহলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। আর আমল ও কর্ম যদি ভাল ও সঠিক হয় তাহলে ইমানের শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা বেড়ে যায়। ইমান হৃদয়ে গেঁথে যায় এবং আমল তার সত্যতা প্রমাণ করে।

এ থেকে আমরা প্রথম যুগের মুসলমানরা যারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের ইমানের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই তাঁদের আমল নিবেদিত করেছিলেন তাদের সাফল্যের এবং আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত শেষ যুগের মুসলমানদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার রহস্য জানতে পারি। আমরা আমাদের ইমান ও আমলকে কেবল কণ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। ফলে আমাদের ইমানের সাহায্যে আমরা আল্লাহ তায়ালাকে মিথ্যা সাব্যস্ত এবং আমাদের আমলকে বিপর্যস্ত করেছি। আমরা আল্লাহ তায়ালাকে প্রতারিত করতে গেছি কিন্তু আমরা প্রতারিত হয়েছি। তিনি আমাদের ভীতি ও ক্ষুধার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন আমাদের শত্রুদের ও আমাদের দ্বীনের শত্রুদের। তারা আমাদের ও আমাদের দ্বীনের উপর আঘাত হানার ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করছে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তারা আমাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননার চূড়ান্ত পর্যয়ে নামিয়ে দিয়েছে।

পূর্বের আলোচনার সারবস্তু

এক : ইমান ও আমল পূর্ণাঙ্গ ও আল্লাহ তায়ালার নিকট গৃহীত দ্বীনের প্রকৃত সত্তার অন্তর্ভুক্ত। ইমান মূলত সমস্ত আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত আমলের ভিত্তি। এটি গাছের মূল সদৃশ এবং সৎ আমলের খাদ্য সে-ই সরবরাহ করে। অন্য দিকে সৎ আমলও তাকে শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা দান করে।

দুই : যারা সাচ্চা ইমান ছাড়া অথবা দূষিত ও গলিত আমলসহ ইসলামের কল্পনা করে, তারা দুনিয়ায় হতাশা ও আখেরাতে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কারণ তারা আল্লাহ তায়ালাকে ধোকা দিচ্ছে। কাজেই আসলে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছে। এটিই এই উম্মতের প্রথম যুগের এবং আমাদের বর্তমান যুগ পর্যন্ত শেষ যুগের লোকদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ।

তিন : শরিয়াহ বিধানসমূহ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বাইরের ও ভেতরের আমলসমূহের মধ্যে পার্থক্যকারী রয়েছে। বাইরের উপর নির্ভর করে তা প্রয়োগ করা হয়। আর

www.pathagar.com

গোপন বিষয়সমূহের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। কারণ গোপন বিষয়ের খবর জানার ক্ষমতা মানুষের নেই। এরই ভিত্তিতে ফকীহগণ বিচার সম্বন্ধীয় আইন ও বিশ্বাস সম্পর্কীয় বিধানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা বলেন : বিচার সম্বন্ধীয় বিধান হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না। নবি সা.-এর বাণী থেকে তারা এর সপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেছেন :

> إنما أنا بشر, وأنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى بنحو مما أسمع, فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ, فإنما أقطع له قطعة من النار.
>
> আমি তো একজন মানুষ। তোমরা বিবাদের ফায়সালা করার জন্য আমার কাছে এসে থাকো। তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় বলিষ্ঠ ভাষায় নিজে বক্তব্য পেশ করতে পারে। আমি যা শুনি তার ভিত্তিতে ফায়সালা দিয়ে থাকি। যদি আমি কখনো এক পক্ষের হয়ে (শব্দ প্রয়োগের চাতুর্যে প্রভাবিত হয়ে) অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে ফায়সালা দেই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে। সেক্ষেত্রে আমি জাহান্নামের আগুনের অংশ তার জন্য নির্ধারিত করি[৪৬৩]।

আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকারের দিক দিয়ে মানুষের ভিতরের ও বাইরের সমস্ত বিষয় দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া দ্বীন পূর্ণতা লাভ করে না ও গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে মানুষের বাহ্যিক কাজ কর্মের উপর বাহ্যিক বিধান প্রযুক্ত হয়। কারণ এ বিধানগুলো বাহিরকে অতিক্রম করে না। এটিই প্রত্যেকটি শরিয়াহর রীতি।

চার : শাসক ও শাসিতের মধ্যে যখন সাচ্চা ইমান থাকে, তখন তা জনতার মধ্যে ন্যায় নীতি সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং তাদেরকে জুলুমের পথ থেকে সরিয়ে আনে। আল্লাহ তায়ালা সুদৃঢ় ন্যায়নিষ্ঠদেরকে অন্য যে কোন গুণ অর্জন করার পূর্বে ইমানের গুণে গুণান্বিত করেছেন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইমানই হচ্ছে সক্রিয় প্রভাবশালী শক্তি এবং মানুষের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে শাসক-শাসিত নির্বিশেষে ইনসাফ কায়েম করার জন্য ইমানই চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

---

[৪৬৩] নাইলুল আওতার খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৭৮।

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ

হে ইমানদারগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষীস্বরূপ, যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন আল্লাহ তায়ালা উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। কাজেই তোমরা ইনসাফ করার ব্যাপারে কামনার অনুগামী হয়ো না[৪৬৪]।

মানুষের প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের

একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, পৃথিবীতে একজন শ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন এবং তার সাথে রয়েছে উচ্চতম নজির। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার চেয়ে উচ্চতর বা সমকক্ষ কিছু চিন্তা করতে পারে না। এটিই প্রত্যেক গবেষকের টার্গেট এবং প্রত্যেক কর্মীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এটিই সত্য ও কল্যাণ। এ জন্যই এ সম্পর্কিত গবেষণা ও অনুসন্ধান শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর অনুসন্ধান হিসেবে চিহ্নিত। মানুষের যাবতীয় দৈহিক, আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমের পেছনে রয়েছে এ ধরনের টার্গেটে পৌঁছাবার প্রচেষ্টা।

আগেই বলে এসেছি, দ্বীন হচ্ছে : আল্লাহ তায়ালা যা বিধিবদ্ধভাবে প্রণয়ন করেছেন এবং যা তাঁর রসুলগণ এনেছেন মানুষকে প্রকৃত সত্য পথ দেখাবার জন্য। এগুলো বিশ্বাস ও জীবন যাপনের সাথে জড়িত কল্যাণমূলক কার্যক্রমে বিভক্ত।

দ্বীনের এখানে তিনটি অর্থ করা যায়

এক : আল্লাহ তায়ালার ওহি, যা তাঁর রসুলগণের প্রতি নাযিল হয়।

দুই : আল্লাহ তায়ালা, রসুল ও পরকালের প্রতি ইমান।

তিন : শরিয়াহর বিধান, যা মানুষের জীবনকে পরিচালিত করে।

প্রথম : অর্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, আল্লাহ তায়ালার ওহি হচ্ছে সমস্ত হিদায়াতের উৎসস্থল। এখান থেকে মানুষ বিশ্বাস ও কর্মে সত্যের সন্ধান লাভ করে। মূলত পরকালের তো দূরের কথা, দুনিয়ায় কিসে আমাদের কল্যাণ নিহিত

---

[৪৬৪] সুরা আন নিসা- ১৩৫ আয়াত

www.pathagar.com

একথা বলার ক্ষমতাও বুদ্ধির নেই। আর সত্য ও কল্যাণের দিকে এবং সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ পথে চলার জন্য মানুষের নির্দেশিকার প্রয়োজন। কারণ তার বুদ্ধি তাকে এ পথ দেখাতে পারছে না। বুদ্ধিবৃত্তি কামনা ও আবেগের বশবর্তী হয়ে পড়ে। ফলে সত্য ও কল্যাণের পথ দেখাবার ক্ষেত্রে তার ওপর নির্ভর করা যায় না। এজন্য মানুষের জন্য একজন হিদায়াতকারী ও পথপ্রদর্শক দরকার এবং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন এ হিদায়াতকারী ও পথ প্রদর্শক।

ওহির সাহায্যে মানুষ তার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ জানতে পারে এবং অন্যের ক্ষতি সাধন না করে তা অর্জন করার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। তারা দলগত বা জাতিগতভাবে মানুষের মধ্যে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ ইনসাফের নীতি মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে। আর ইসলামের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তায়ালা এ ওহির সমাপ্তি টেনেছেন। কাজেই ইসলামের বিধানের ছায়াতলে আসা ছাড়া দুনিয়ায় ও আখেরাতে সুখ-শান্তি-সৌভাগ্যের আর কোন পথ নেই।

দ্বিতীয় : অর্থটির প্রসঙ্গে বলা যায় : বাহ্যত মানুষের আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের প্রয়োজন। কারণ দুনিয়ায় ও আখেরাতে মানুষের নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে। দুনিয়ায় মানুষকে জীবন সমস্যার মোকাবিলা করতে এবং কালের প্রবাহের সাথে সংঘাত মুখর হতে হয়। তার মোকাবিলায় দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই। সে তার মোকাবিলায় বিধ্বস্ত হয়। তার বুদ্ধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দেয়। অবশেষে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কারণ মানুষ বড়ই দুর্বল। বালা-মুসিবত-ভয়াবহ সঙ্কটের মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার নেই।

সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে গেছে। ফলে মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে স্নায়বিক দুর্বলতা ও জীবন ধারণের প্রতি অনীহা নিজের ইচ্ছা ও মানসিক প্রবণতার বিরুদ্ধে সামান্য সংকটের প্রথম আঘাতেই তারা ভেঙ্গে পড়ে। তাদের বিপুল ধন-সম্পদ এ ব্যাপারে তাদের কোন কাজে লাগছে না। বরং এ সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহায়-সম্পদ-বিত্ত, ক্ষমতাও মর্যাদার অধিকারীদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এ সব ধনী, ক্ষমতা ও মর্যাদাশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট গবেষক, বিজ্ঞানী ও সামরিক নেতৃবন্দ সামান্য ও তুচ্ছ কারণে আত্মহত্যার প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন।

এরপর আমরা দেখি মানসিক ব্যাধি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে পার্থিব জীবনে মানুষ জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হচ্ছে এবং জড়িয়ে পড়ছে আত্মহত্যার

www.pathagar.com

অপরাধে। এসবের কারণ হচ্ছে মানুষের অন্তরের মধ্যে যে ভিত গড়ে উঠেছে তা একান্তই দুর্বল। সেখানে ইমান নেই, যা তাকে দান করবে সবর, দৃঢ়তা ও স্থৈর্য এবং যা তাকে সহিষ্ণুতা দান করবে বিপদ আপদ বরদাশত করার মতো প্রয়োজন পরিমাণ। তার আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান ও বিশ্বাস যত বাড়বে ততই তার সহনশীলতাও বেড়ে যাবে। বিপদ-মুসিবতের সময় এ শক্তিগুলো কখনো সহ্যের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছে যায়, যেমন সাচ্চা মুমিনদের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন। এই মুমিনরা কুফরী ও আল্লাহদ্রোহিতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। কুরআনে এদের ঘটনা ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। যেমন ফেরাউনের দরবারে যাদুকরদের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, যাদু করার ঘোষণা দিল যে তারা মূসা ও হারুনের রবের প্রতি ইমান এনেছে এবং ফেরাউন এর জবাবে ঘোষণা দিল যে, তাদের হাত ও পা বিপরীত দিকে থেকে কেটে ফেলা হবে এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তাদেরকে শূলীবিদ্ধ করা হবে অথবা এধরনের আরো বিভিন্ন কঠিন শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা একটাই জবাব দিয়েছে :

لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ

আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না, কাজেই তুমি কর যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পারো। আমরা আমাদের রবের প্রতি ইমান এনেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদের যে যাদু করতে বাধ্য করেছো তাও[৪৬৫]।

এখানে আমরা দেখছি, ওই মুমিনদের ইমান ফেরাউনের জবরদস্তি ও তার নানা ধরনের শাস্তির ভয় দেখাবার পরোয়া করেনি। তাদের ইমান একটুও টলায়মান হয়নি। তারা তাদের রবের প্রতি ইমান এনেছে এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনি, তার শক্তি ও প্রতাপ যতই বিপুলায়তন হোক না কেন?

---

[৪৬৫] সূরা তা-হা- ৭২-৭৩ আয়াতা।

www.pathagar.com

সুরা আহযাবে সত্যনিষ্ঠ মুমিনদের অবস্থা এবং সম্মিলিত শত্রু বাহিনীকে দেখার পর তাদের দৃঢ়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে বলেন :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো, তারা বলে উঠলো : এতো তাই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল যার প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সত্য বলেছিলেন। আর এতে তাদের ইমান ও আনুগত্যই বেড়ে গেল। মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ তায়ালার সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় আছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন সাধন করেনি[৪৬৬]।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

তাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো। কিন্তু এটা তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক[৪৬৭]।

নবিগণ তো হচ্ছেন মানবশ্রেষ্ঠ। ইমান, দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং ভয়-ভীতি ও শোকে-দুঃখে সকল অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতায় তাঁদের জুড়ি নেই। তাঁদের শত্রুরা তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতারণা জাল বিস্তার করেছিল কিন্তু সবই তাঁরা ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

---

[৪৬৬] সুরা আল আহযাব- ২২-২৩ আয়াত।

[৪৬৭] সুরা আল ইমরান- ১৭৩ আয়াত।

www.pathagar.com

মুমিনের বিপদ মোকাবিলার প্রস্তুতি

মুমিনদের উপর বালা-মুসিবত নাযিল হয়েছে, তারা তার মোকাবিলা করেছে এই অর্থে যে এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পরীক্ষা। তারা জেনেছে সবরকারী মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সুন্দর পরিণাম।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ, وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

> আমি তোমোদের ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করবো। তুমি সবরকারীদেরকে শুভ সংবাদ দাও[৪৬৮]।

এর অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখবো, তোমাদের মধ্যে কে সংগ্রামকারী এবং কে সবরকারী। এভাবে আমি তোমাদের প্রতিদান দিতে পারব। আবার এভাবেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে : এ সম্পর্কে আমি তাদেরকে ভালভাবে জানিয়ে দেবো, যাতে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, শীঘ্রই তারা এসব সঙ্কটের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। ফলে তারা এসবের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেবে এবং শোক-দুঃখ থেকে অনেক দূরে চলে যাবে[৪৬৯]।

দুঃখের প্রথম আঘাতের সময় সবর করাই হচ্ছে আসল সবর। নবি সা. থেকে এ ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন :

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.

> শোকের প্রথম চোটেই সবর করতে হয়[৪৭০]।

অর্থাৎ বিপদ-আপদ যখন চারদিক থেকে চেপে বসে এবং যখন তা বরদাশ্‌ত করা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন তার উপর সবর করা বিপুল সওয়াবের কারণ হয়। কারণ এসময় বিপদ বরদাশত করা অন্তরের প্রচণ্ড শক্তির প্রমাণ পেশ করে।

---

[৪৬৮] সুরা আল বাকারাহ- ১৫৫ আয়াত।

[৪৬৯] আল কুরতুবী- খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৩।

[৪৭০] বুখারি ও মুসলিম।

www.pathagar.com

অন্যদিকে বিপদের প্রচণ্ডতা কমে গিয়ে যখন তা থিতিয়ে আসে তখন যে কেউ সবর করতে পারে। এটা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়[৪৭১]।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অন্যত্র বলেছেন :

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা সবর কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ[৪৭২]।

ফখরুদ্দীন রাযী রহ. তাঁর তাফসীরে বলেছেন :

এ ধরনের সংবাদ পরিবেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদেরকে সবরের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং যাতে তারা দুঃখ না করে এ জন্য আগেভাগে সজাগ করে দেয়া। কারণ বিপদ আসার পূর্বে মানুষ যদি সে সম্পর্কে জানতে না পারে, তাহলে তা তার জন্য অনেক কঠিন হয়ে দেখা দেয়। আর যখন সে জানতে পারে তার উপর একটা বিপদ আসছে তখন তার মুখোমুখি হওয়া তার জন্য সহজ হয়। বিপদের অর্থ কি? বলা হয়, বিপদের অর্থ হচ্ছে :

ক্লেশ, দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র, আহত ও নিহত হওয়া, কাফেরদের হাতে পরাজয় বরণ করা, যে কারণে জিহাদে সবর করাকে অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। আবার বলা হয়ে থাকে, এর অর্থ হচ্ছে : মারাত্মক শারীরিক ও অর্থনৈতিক কষ্ট। আর এসব সালাত, যাকাত ও জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে জড়িত। পৃথকভাবে বা একসাথে এ সবগুলো অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ আয়াতের মধ্যে রয়েছে[৪৭৩]।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

---

[৪৭১] আল কুরতুবী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৩।

[৪৭২] সুরা আল ইমরান- ১৮৬ আয়াত।

[৪৭৩] তাফসির ফখরুদ্দীন রাযী খণ্ড ৩, ১১৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

> লোকেরা কি মনে করে, আমরা ইমান এনেছি এ কথা বললেই তাদের পরীক্ষা না করে এমনিই অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী[৪৭৪]।

এ আয়াতগুলো এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতগুলো থেকে একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, মুমিনদেরকে আসন্ন বালা-মুসিবত সম্পর্কে সতর্ক করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য। যে মানুষটি জানে বিপদ আসবে এবং সে সেজন্য অপেক্ষা করছে আর যে মানুষটি বিপদ সম্পর্কে একেবারেই গাফেল তাদের দু'জনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইমাম রাযীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ইতোপূর্বে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

তাই আল্লাহ তায়ালা মুমিনের দিলকে শোক, দুঃখ ও ভীতিমূলক বিপদ-আপদ বরদাশত করার ক্ষমতা সম্পন্ন করে গঠন করার ব্যবস্থা করেছেন। সকল প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক বিপর্যয়, যা মানুষকে আত্মহত্যা ও স্নায়বিক বৈকল্যের দিকে নিয়ে যায় তা থেকে তাকে রক্ষা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের মধ্যে যদি এছাড়া অন্য কিছু না থাকতো তাহলে ব্যক্তি মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কল্যাণই হতো যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান মানুষকে এ ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে না। বরং আশা মুমিনের হৃদয় ও স্বজ্ঞায় এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়। আশাই তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে কর্মরত ও সক্রিয় রাখে। কাজের ফলাফল বাস্তবায়নের ব্যাপারে তার মধ্যে যেসব দুর্বলতা দেখা দেয় সেগুলো তার মনে হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টির কোন অবকাশ পায় না। মু'মিন না হলে সে কাজে অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। সে সাফল্যের আশা করে। কারণ সে প্রত্যয়লব্ধ জ্ঞানের অধিকারী এবং সে সাচ্চা ইমান রাখে। অবস্থা যেমনই হোক না কেন সে তার কাজের ফলাফলের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখে না। কারণ তার কর্তৃত্বের উপর বিরাজমান রয়েছে আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা।

মানুষের মানসিক ও স্নায়বিক বিপর্যয় রোধ, সে যাতে হতাশার শিকার না হয় এবং হাজার ব্যর্থতা ও পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েও সে যাতে আশাহত না হয় এজন্য

---

[৪৭৪] সুরা আনকাবুত- ২ আয়াতা।

www.pathagar.com

ইমানের প্রয়োজন। একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, মানুষকে এবং তার পার্থিব জীবনকে সহায়তা দানের জন্য এর মধ্যে অপরিহার্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই সঙ্গে যদি তার ইমান সাচ্চা হয় এবং আখেরাতের কর্মকাণ্ডের প্রতি তার আস্থা ও ধৈর্য থাকে অটল তাহলে তার কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান অর্থে গ্রহণ করে মানুষ নিজেকে ও নিজের ব্যক্তি সত্তাকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়। কারণ এক্ষেত্রে দ্বীন সামাজিক জীবনে বিধিবদ্ধ অনুশাসনসমূহ প্রয়োগ করার একটি মাধ্যম ও মহত্তম কাজে পরিণত হয়। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুষ্ঠু দ্বীনী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সহায়ক কার্যকর শক্তি। সঠিক দ্বীন মানুষকে তার শারীরিক প্রয়োজন ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়ে দেয় এবং তার ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। দ্বীনের বিভিন্ন কাজে তার সাথে যারা শরীক হয় তাদের সাথে এবং সমগ্র মানবজাতির সাথে তার মনে ভ্রাতৃত্বভাব জাগিয়ে তোলে। কারণ এক আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। এক পিতা থেকে সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। নবি সা. বলেছেন : তোমরা সবাই আদম থেকে এবং আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে। সঠিক দ্বীন মানবিক প্রকৃতিকে পরিতুষ্ট করে। তাকে সংস্কৃতিবান ও মর্যাদাশালী করে । তার জন্য এমন সব নীতিমালা ও বিধান প্রণয়ন করে যার ফলে তার মধ্যে ভারসাম্য ও কোমলতা সৃষ্টি হয় এবং সে মানুষ ও অন্য প্রাণীকুলের বিপদের কারণ হয় না।

সঠিক দ্বীন আল্লাহ তায়ালার ইবাদত, তাঁর আনুগত্য ও মানুষের কল্যাণকামিতার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী ও মানুষের ক্ষতিগুলোকে চিহ্নিত করে। মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রিয়তা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও প্রীতি ছড়িয়ে দেয় এবং তার মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করে জুলুম, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আত্মম্ভরিতা ও আত্মগরীমার বিরুদ্ধে। সঠিক দ্বীন মানুষের অন্তর দয়া, মমতা ও সম্প্রীতিতে ভরে দেয়।

নিসন্দেহে বলা যায়, মানুষের সমাজকে জীবিত রাখার জন্য এ সমস্ত কল্যাণের অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে। এ অবস্থায় দ্বীনী প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রশাসন, নিরাপত্তা, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃহত্তম কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সমসাময়িক বিশ্বের হতাশা ও নৈরাজ্য বিস্তারের কারণই হচ্ছে এই ধরনের কার্যকর শক্তির অভাব। এই দ্বীনী প্রতিরোধ ব্যবস্থাই জাতি-গোষ্ঠী-ব্যক্তি নির্বিশেষ বিশ্বের সকল মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষের সংশোধন ও মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি গঠনে এর কোন বিকল্প কার্যকর শক্তি নেই।

www.pathagar.com

যে জ্ঞান টর্পেডোবাহী যুদ্ধ জাহাজের মতো মানুষের জীবনে ধ্বংসলীলা ডেকে আনে এই দ্বীন তাকে একটি সীমারেখার মধ্যে বন্দী করে দেয়। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই বস্তুর ভিত্তিতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। অন্যদিকে দ্বীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় হৃদয় ও আত্মার ভিত্তিতে। আর হৃদয় ও আত্মাকে যথাযথভাবে গঠন না করে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে না।

আজকের বিশ্ব যেভাবে বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং দ্বীন ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তারপর আগামীকাল যখন সে নিশ্চিতভাবে জেনে এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিপদ সংকুল পথে চলে ধ্বংস ও ভাগ্যের অনিবার্য পরিণাম থেকে নিস্কৃতির প্রত্যাশা করবে তখন কে তাকে বাঁচাবে? আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান এনে তাঁর দ্বীনের পথে ফিরে আসা ছাড়া তার বাঁচার আর কোন পথ নেই।

এখানেই আমরা শুনি পাশ্চাত্য জাতিদের করুণ আর্তি এবং প্রাচ্যের জাতিদের সকরুণ আর্তনাদ।

এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক কালের জনৈক প্রবীন ইংরেজ ঐতিহাসিকের[৪৭৫] মতামত যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার। তাঁর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মগুলো রক্ষণশীল নয়, তারা প্রগতিবাদিতার দিকে এগিয়ে গেছে। তিনি বলেন, এই ধর্মগুলোর শূণ্যস্থান পূরণ করার মতো কোন জিনিসই আমি দেখি না। আমার বিশ্বাস জন্মেছে ধর্ম ও দ্বীন হচ্ছে আমাদের বন্ধু ও সহযোগী। আমাদের চেতনা ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা থেকে তাকে আলাদা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় আর এ দুটিই মানবাত্মার অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী। তারপর তিনি বলেন : আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক মানবিক সত্তার একটি ব্যক্তিগত ধর্ম আছে এবং প্রত্যেক মানব সমাজের আছে একটি সামাজিক ও সামষ্টিক ধর্ম।

এ দৃষ্টিতে ব্যষ্টি বা সমষ্টির ধারণা করলে বলতে হয়, প্রত্যেক মানুষের জন্য দ্বীন ও ধর্ম অপরিহার্য। তিনি বলেন, মানুষ এটা অস্বীকার করলেও এটাই আমি বিশ্বাস করি। কারণ মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি তার জড় প্রকৃতির মতই শূণ্যতাকে অপছন্দ করে। পুরানো ধর্মগুলোর জায়গায় এসে গেছে নতুন ধর্মগুলো। বিশ্ব মানুষের ব্যক্তি সত্তা সংরক্ষণে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এই নতুন ধর্মগুলোর গুণাবলীর কমতি

---

[৪৭৫] পরলোকগত বৃটিশ ঐতিহাসিক আর্নাল্ড টয়েনবি।

www.pathagar.com

রয়েছে। এমন এক যুগে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ বুনিয়াদি প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে যখন বিজ্ঞানের বিজয় সূচিত হয়েছে এবং ব্যক্তির মানবিক সত্তাকে লঘু করে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছে অতঃপর তাকে নিছক বস্তু পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। কারণ প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিবাদ ও কমিউনিজম মৌমাছি ও পিপীলিকা রাজ্যের মতোই এবং গোষ্ঠীগত জাতীয়তাবাদও অনুরূপ পর্যায়ভুক্ত।

খ্রিষ্ট ধর্মের পরে বিভিন্ন নামে যেসব নতুন নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে তারা তাদের পূর্বসূরীদের তুলনায় বেশি খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে। আর আজকের বিশ্বব্যাপী জুলুম নির্যাতনের যুগে মানুষের অবস্থা আগের চাইতে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। পশ্চিমা জগতের মানুষেরা আজ ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্টের ধর্মীয় বিরোধের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য মানুষের অস্তিত্বই তাকে ইমানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে প্রচণ্ড শক্তিতে, যেমন পথ যখন একটি হয় তখন সমস্ত মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয় ঠিক যেন সামষ্টিক সম্পর্কের মহাসমুদ্রে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বিলোপের মতো। শীঘ্রই ব্যক্তিগত পর্যায়ে লেনদেন করতে মানুষ বাধাপ্রাপ্ত হবে। এমনকি ব্যক্তির প্রযত্নে যদি তা অর্জন করার একটি পথ করা হয় তবুও পুলিশের লাঠি তার মাথায় আঘাত করবে এবং পরের দিন তাকে আদালতে পেশ করা হবে হাকিমের সামনে[৪৭৬]।

এটা এমন একজন বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিকের অভিমত যিনি অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত ধর্মের কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি। তারপর তাঁর মত পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তিনি বিশ্বাস করতে লাগলেন যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি দ্বীন ও ধর্ম অপরিহার্য যদিও মানুষ তা অস্বীকার করে। কারণ মানুষের শরীরের আধ্যাত্মিক চাহিদা যেমন শূণ্যতা অস্বীকার করে তেমনি তার জৈবিক চাহিদাও শূণ্যতার স্বীকৃতি দেয় না। আর প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগুলো যে পর্যায়েই অবস্থান করুক না কেন, মানুষের তৈরি ধর্মগুলোর তুলনায় এগুলো মানুষের জন্য অনেক ভাল। এই বিকল্প ধর্মগুলোর সংখ্যাই অধিক। মানুষ আবার ধর্মের দিকে ফিরে আসবে, এজন্য তাকে যতই চড়ামূল্য দিতে হোক না কেন। কারণ এটা তার অস্তিত্বের প্রশ্ন।

অন্যদিকে প্রাচ্য জগতের ব্যাপারে বলা যায়, জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একটি সমিতি ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পূর্ণাঙ্গ পরাজয়ের পর

---

[৪৭৬] কিতাব আত তাজারুব, আর্নল্ড টয়েনবি, সহীফাতুল আইয়াম আসসুদানীয়া থেকে উদ্ধৃত- ৫৬১৩ সংখ্যা, ১৯৬৯ সালে এর আরবি অনুবাদ করেছেন, আবদুল্লাহ রজব।

www.pathagar.com

জাপানকে বৃহত্তম সাফল্য অর্জন করতে হলে কোন ধরনের রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এ সম্পর্কে বিতর্ক সভায় মিলিত হন।

তারা যে প্রতিবেদন তৈরি করেন তাতে বলা হয়ঃ দেশ প্রথম যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের বিপথগামিতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এখন আর শিক্ষায়তন বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন কর্মে নিযুক্তির জন্য যথেষ্ট হচ্ছে না। চাকুরী অন্বেষনকারীর জন্য এখন সর্ব প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে তার ইমানকে মজবুত করা। এ জন্য শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রত্যেকটি যুবক যখন কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প কারখানায় চাকুরীতে ঢোকে তার পূর্বে তাকে অবশ্যই পরপর কয়েক সপ্তাহের জন্য ধর্মীয় ইবাদতখানাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। এটা কেবলমাত্র চাকুরী গ্রহণকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং চাকুরীদাতা, মালিক, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ সবার জন্য নির্ধারিত হতে হবে।

জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দ ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ এ অভিমত পোষণ করেছেন। তারপর যে বিশ্ব আজ এ ধারণা পোষণ করছে যে, সে বস্তুবাদী সভ্যতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে ইতোপূর্বেকার বিশ্ব পৌঁছুতে পারেনি, সে তার এই বস্তুবাদী সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দ্বীন ও ধর্ম ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছে না, যদিও তার এ ধর্ম পৌত্তলিক বা পৌত্তলিকতা সদৃশ। এক্ষেত্রে আমাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পন্থা হলো আমাদের দ্বীন ইসলামের দিকে ফিরে আসা, তা থেকে দূরে সরে যাওয়ার আগে তার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া এবং এমন ছায়ায় প্রবেশ করা থেকে নিজেকে বাঁচানো যে ছায়া শীতল নয় এবং যা অগ্নি-শিখা থেকে বাঁচায় না। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করলে বুঝা যাবে আমাদের বিশ্বাস, আচরণ, লেনদেন ও নৈতিক চরিত্র সবই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনা অর্থে দ্বীন যখন মানুষের বর্তমান জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় প্রমাণিত হলো তখন তা তার ভবিষ্যত জীবনের জন্যও প্রয়োজনীয়। কারণ যে আমলের ভিত্তিতে আখেরাতে সওয়াব দেয়া হবে অবশ্যই তার বুনিয়াদ আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যথায় তা পরিণত হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকতায়। আল্লাহ তায়ালার কাছে তা সৎ আমল হিসেবে গণ্য হবে না। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ
يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

www.pathagar.com

যারা কুফরী করে তাদের কাজ মরুভূমির মরীচিকার মতো, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার কাছে উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছুই নয় এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহ তায়ালাকে, তারপর তিনি পূর্ণমাত্রায় দেবেন তার কর্মফল। আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে বড়ই তৎপর[৪৭৭]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوراً

আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকতায় পরিণত করবো[৪৭৮]।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

যারা কুফরী করে তাদের রবের কাছে তাদের কর্মসমূহ ছাই ভস্মের মতো। ঝড়ের দিন বাতাস তা প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা উপার্জন করে তার কিছুই কাজে লাগাতে পারে না। এটা ঘোর বিভ্রান্তি[৪৭৯]।

কাজেই আখেরাতে ফল পাওয়া যাবে এমন যে কোন আমলের ভিত্তি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনা এবং তার উপর টিকে থাকার উপর। অন্যথায় তা সৎ আমল হিসেবে গণ্য হবে না।

তৃতীয় : অর্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় : দ্বীন হচ্ছে শরিয়াহর বিধান, যা বিধিবদ্ধ হয়েছে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণার্থে। মানুষের জন্য তার কল্যাণ ও প্রয়োজন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। প্রত্যেকেই যদি ব্যক্তিগতভাবে নিজের কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাচারী হয় এবং নিজের ইচ্ছামতো চলতে থাকে, যেক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবণতাও আলাদা এবং তারা সমষ্টির

---

[৪৭৭] সুরা আন নূর, ৩৯ আয়াত।

[৪৭৮] সুরা আল ফুরকান- ২৩ আয়াত।

[৪৭৯] সুরা ইব্রাহীম ১৮ আয়াত।

www.pathagar.com

সহায়তা ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেদের রুজি রোজগার করতেও সক্ষম নয়, তাহলে তা কোন ক্রমেই অর্জিত হবে না।

যখন দু'জন বা তার চেয়ে বেশি লোক একত্র হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে এমন একজন হতে হবে যে কোন কাজ করার বা না করার হুকুম করবে এবং সবাই তা মেনে চলবে। কাজেই আদেশ ও নিষেধ মানুষের অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ। একজন আমীরের আদেশ নিষেধ মেনে চলা যে ক্ষেত্রে মানুষের জন্য অপরিহার্য সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা ও রসূল সা.-এর হুকুমের আনুগত্যে প্রবেশ করা মানুষের জন্য জুলুম থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় জামানত। কারণ আল্লাহ তায়ালা রসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের সাথে কিতাব দিয়েছেন মানুষের প্রতি অপার দয়া ও করুণা হিসেবে এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করার জন্য। মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে তাঁর রসূল পাঠাবার সিলসিলার পরিসমাপ্তি করেছেন। সর্বশেষ কিতাব পাঠিয়েছেন কুরআন, তাদের জন্য পথ নির্দেশনা হিসেবে যারা এর বেশি উপযোগী এবং এর অনুসারীদের বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠ দল, যাদের উত্থান হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। তারা তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে[৪৮০]।

কাজেই শরিয়াহর বিধান অর্থে দ্বীন সমাজ জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ তায়ালার প্রত্যাদিষ্ট বিধান মানুষের মধ্যে ইনসাফ, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে, যা মানুষের সমাজের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন।

এজন্য আল্লামা ইবনে কাইয়িম বলেছেন : মানুষের জন্য অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজনের তুলনায় শরিয়াহর প্রয়োজন অনেক বেশি জরুরি। এমনকি মানুষের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের যে প্রয়োজন আছে শরিয়াহর প্রয়োজনের সাথে তার তুলনা করা যায় না। কারণ অধিকাংশ মানুষ চিকিৎসা ছাড়াও বাঁচতে পারে[৪৮১]।

আগেই বলেছি, বুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও এক পর্যায়ে অক্ষম। তার একার কল্যাণ অর্জন ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। প্রয়োজন ও উন্নয়নের কল্যাণ সংরক্ষণ ছাড়া তার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নেই।

---

[৪৮০] ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবাতু ফিল ইসলাম ৮৬ এবং পৃষ্ঠা ৪-৫। শায়খ সাইস, সাবাকী ও বারবারী, তারীখ আত তাশরী- পৃষ্ঠা ৮ ও ১০।

[৪৮১] মিফতাহুস সাআদাহ- খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২।

www.pathagar.com

আলোচনার সারসংক্ষেপ

দ্বীন অর্থ ওহি। এ অর্থে বুদ্ধির জন্য সত্য ও কল্যাণের পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে দ্বীনের অতীব প্রয়োজন। অন্যদিকে দ্বীন অর্থ আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান। এ অর্থে ব্যক্তি মানুষের দ্বীনের জন্য জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন। এর ফলে এমন একটি আত্মার সৃষ্টি হয় যা প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত ও স্থৈর্যশীল এবং যা দুঃখ, শোক, অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে দূরে অবস্থান করে। এই সঙ্গে তা পাপের ভারে ভেঙ্গে পড়ে না এবং হতাশার ফলে সৃষ্ট আত্মহত্যা মুক্ত জীবন গঠন করে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান অর্থে দ্বীন মানুষের সমাজ জীবনের জন্যও অতীব প্রয়োজন। কারণ তা শরিয়াহর আইন সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগের নিশ্চয়তা দেয় এবং সামাজিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট করে এমন প্রত্যেকটি রোগ নির্মূল করে।

দ্বীন শব্দটি শরিয়াহর বিধিবদ্ধ অনুশাসন অর্থে মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার ও সাম্যের রীতি প্রতিষ্ঠাকে অপরিহার্য করে তোলে এবং তাদেরকে রক্ষা করে কামনা ও ইন্দ্রিয় লিপ্সার পিচ্ছিল পথ থেকে। এর ফলে পরকালীন জীবনে মুমিনরা চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি লাভ করবে। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দ্বীনের প্রয়োজন প্রমাণ করার জন্য দুনিয়ার একক কল্যাণই যথেষ্ট। বিশ্ব আজ বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়েও অবস্থা যেমনই হোক না কেন শীঘ্রই আবার দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে। কারণ শীঘ্রই সে দেখবে তার জন্য দ্বীনের ছায়া ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই। এবং ইসলাম ছাড়া আর কোন রক্ষাকারী নেই। কারণ ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সত্য দ্বীন। পিপাসায় যার ছাতি ফেটে যাচ্ছে একমাত্র ইসলামই তার পিপাসা মিটাতে পারে। একথা যখন প্রমাণিত হলো যে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য দ্বীনের প্রয়োজন অপরিহার্য তখন তার হেফাযতও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানবজাতির জন্য দ্বীন অপরিহার্য কল্যাণের বার্তা বহন করে আনে এবং তার সাহায্যে তার হেফাযতও হয়। একথা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় দিক দিয়েই সত্য। তাই সামনের দিকে আমরা এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা (পার্ট - ৩)

Md. Moniruzzaman

The Islamic Theory of Jihad and International System ২০০/-

M. Anisuzzaman *PhD* & Prof. Zainul Abedin Majumder

Leadership: Western and Islamic ৭০/-

M. Zohurul Islam *FCA* (Editor)

Islamization of Academic Discipline ২০০/-

ঘ. ইতিহাস - ঐতিহ্য

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

মুসলিম মানসে সংকট ১৫০/-

মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট ২২৫/-

তারিক রমাদান

মুসলিমের ইউরোপ ১৫০/-

পাশ্চাত্যের মুসলিম ও ইসলামের ভবিষ্যৎ ৩৩৫/-

ঙ. বিজ্ঞান ও সভ্যতা

এম এ কে লোদী সম্পদীত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন ১৫০/-

ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী *পিএইচডি*

আল কুরআন ও মহাবিশ্ব : সমন্বিত ধারায় অধ্যয়ন ৭০/-

Muin-Ud-din Ahmad Khan *PhD*

Origin and Development of Experimental Science ১২০/-

Major Md. Zakaria Kamal

Man and Universe ২০০/-

Prof. Omer Hasan Kasule Sr. *PhD*

Medical Education : Islamic Perspective ২০০/-

Medical Ethics ৫০/-

মেডিকেল এথিক্স : ইসলামি দৃষ্টিকোণ ৬০/-

চ. সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মালিক বদরী *পিএইচডি*

অভিচিন্তন : অনুভবের দৃশ্যময়তা ৫০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

নির্মাতাদের দ্বীপ ১২০/-

নির্মাতাদের দ্বীপের গুপ্তধন ১২৫/-

আইআইআইটি স্টাইলশীট

লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড ৫০/-

Poet Farruk Ahmed

Islam in Bengali Verse ১০০/-

www.pathagar.com

তৃতীয় বিষয়টির আলোচনা

দ্বীনের কল্যাণ সংরক্ষণের ধনাত্মক পদ্ধতি

ইতোপূর্বে দ্বীনের অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। একথাও আলোচনা করা হয়েছে যে, সমস্ত কল্যাণের উর্ধে দ্বীনের কল্যাণের স্থান। কারণ ব্যক্তি ও সমষ্টির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে দ্বীনের একান্ত প্রয়োজন। এখন আমরা এই কল্যাণ সংরক্ষণের ধনাত্মক পদ্ধতি আলোচনা করবো। অর্থাৎ সূচনার পথে সংগ্রহ এবং স্থায়ীত্বের পথে সংরক্ষণ। অন্যদিকে কল্যাণ সংরক্ষণের ঋণাত্মক পদ্ধতির আলোচনা সামনের দিকে আসবে এই আলোচনার পরে চতুর্থ বিষয় হিসেবে।

দ্বীনের কল্যাণ বিভিন্ন প্রকার। এর মধ্যে এক ধরণের কল্যাণ হলো অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য। অন্যান্য কল্যাণের সাথে তার মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। এটি হচ্ছে এমন একটি পর্যায় যে পর্যায়ে একটি মহাসত্যের অস্তিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এ পর্যায়টি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ইমান।

এর মধ্যে আর এক ধরনের কল্যাণ হলো প্রয়োজনীয় পর্যায়ের। এগুলো হচ্ছে, চূড়ান্ত নির্দেশের ভিত্তিতে ইবাদত ও আমল। এ পর্যায়টি অখণ্ড লক্ষ্যভিসারী ইমানের অনুসারী। যেমন সালাত, যাকাত, সওম ও হজ।

এর মধ্যে তৃতীয় এক ধরনের কল্যাণ হলো, যা সুসজ্জিত ও অলংকৃত করে। এগুলো হচ্ছে, নফল পর্যায়ের সৎ ও ভাল কাজ এবং এমন সব কাজ যেগুলো চূড়ান্ত ও ফরয পর্যায়ের নয়। এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের পরে আসে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে। যেমন নফল সালাত, নফল সাদকাহ, নফল সওম ও নফল হজ।[৪৮২] এদের প্রত্যেকটি নিম্ন পর্যায় উচ্চ পর্যায়কে পূর্ণতা দান করে। যে মূল ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত থাকে তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ইমান। কাজেই এখান থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু করবো।

আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ইমান

এরই ভিত্তিতে আদেশ এসেছে সমস্ত দায়িত্বশীলদের জন্য। আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে ছাড়পত্র না পেলে কোন আমল নির্ভরযোগ্য হয় না। এ ছাড়া এর আর দ্বিতীয় কোন ভিত্তি নেই। বিষয়টি আগেই আলোচিত হয়েছে। মহাসত্যের অনুসন্ধানে বুদ্ধিকে পথ দেখাবার জন্য কুরআনুল কারিমে বহুবিধ পথের অবতারণা করা

---

[৪৮২] কাওয়ায়েদুল আহকাম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯।

www.pathagar.com

হয়েছে। এই সমস্ত পথের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধি ও প্রকৃতির অধিকারী মানুষ যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সত্যিকার ইমানী পথের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করেছে।

দুনিয়া ও আখেরাতের বিধানের জন্য আসলে অন্তরের বিশ্বাস ও কণ্ঠের উচ্চারণকেই নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হয়। কেবলমাত্র কণ্ঠের উচ্চারণ এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে শুধুমাত্র দুনিয়ার অনুশাসনের জন্য কণ্ঠের উচ্চারণ ও মৌখিক স্বীকৃতিকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। মুখে জবরদস্তি হাঁ বা না বলানোর মাধ্যমে অন্তরের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করা যায় না। বল প্রয়োগ করে বা অন্য কোন ওজর দেখিয়ে ইমান বাতিল বলে ঘোষণা করা বৈধ নয়। যে কোন অবস্থায় ইমান পরিবর্তন করলে কুফরী অপরিহার্য হয়ে পড়ে[৪৮৩]।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের সাথে কিভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায়

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য দু'টি পথ তৈরি করে দিয়েছেন। তার সাহায্যে সে সৃষ্টির তাৎপর্যের সন্ধান লাভ করতে পারে। এর

প্রথম পথ হচ্ছে

বুদ্ধিবৃত্তি, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এই বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে একটি বিকাশমান শক্তিতে পরিণত করেছেন। এর সাহায্যে মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারে। অবশ্য এ বস্তুজগতে এ জ্ঞান মূলত ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং সময় ও কালের প্রেক্ষিতে ক্রম পরিবর্তনশীল। বুদ্ধির কল্যাণের হেফাযত অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অদৃশ্য জগত এবং এই দৃশ্য জগতের যা কিছুর সন্ধান লাভ তার বুদ্ধি একা করতে অক্ষম তা জানার ব্যবস্থা করেছেন। আসলে এ জগতের প্রকৃতি আলাদা। মানুষকে এ জগত সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ও গাফেল রাখতে তিনি চান না। কারণ মানুষ একটি দায়িত্বশীল জীব। দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। এ পথ দিয়ে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় অদৃশ্য জগতের সাথে এবং মহাসত্যের দ্বারা তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে

---

[৪৮৩] উসূলুস সারাখসী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯০।

www.pathagar.com

যায়। এই মহা সত্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য জ্ঞান। এই পথটি হচ্ছে নবি ও রসুলগণের মাধ্যমে ওহি জ্ঞান লাভ[৪৮৪]।

বুদ্ধি যেখানে অদৃশ্য জগত এবং দৃশ্য জগতের অনেক কিছুর সন্ধান লাভ করতে পারে না সেখানে তার ওহির উপর নির্ভর করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর সাহায্যে মানুষ অদৃশ্য জগতের সত্যের সন্ধান পায়, বুদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে এবং গভীর চিন্তা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তার স্রষ্টার কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা কুরআনের কিছু আয়াত উপস্থাপন করবো। এ আয়াতগুলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে গভীর চিন্তা ও অনুশীলনের দিকে ধাবিত করে এবং তাকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে পথের সন্ধান দেয়।

বিশ্বাসের জগতে মানুষকে সত্যপথ দেখাবার কুরআনী পদ্ধতি

কুরআন মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ও পরকালীন জীবনের প্রতি ইমানের আহ্বান জানিয়েছে। মানুষের আল্লাহ তায়ালার সামনে তার কাজের জবাবদিহি করা এবং তার প্রতিদান লাভে সক্ষম হবার ভিত্তিতে তার এই পরকালীন জীবন গড়ে ওঠে। কুরআন বিভিন্নভাবে এ আহ্বান জানিয়েছে। কখনো এই বিশ্বে বসবাসকারী জীব হিসেবে, কখনো একজন মানুষ হিসেবে, আবার কখনো এই বিশ্ব জাহানের সাথে সম্পর্কিত হবার ভিত্তিতে কুরআন এ আহ্বান জানিয়েছে। এ সবেরই একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তা হচ্ছে, মানুষকে মহাসত্য জ্ঞান লাভের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়া, যে সত্যের প্রতি সে ইমান আনবে এবং পরকালে জবাবদিহিতা, হিসাব দান ও পুরস্কার বা শাস্তি লাভের বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইবাদত-বন্দেগী ও অনুগত্যের জীবন-যাপন করবে।

এ বিশ্বকে বিস্তৃত করে তিনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে গতি সঞ্চার করে জীবকুলের বসতি গড়ে তুলেছেন। একে ঘিরে রয়েছে পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, বাতাস, বৃষ্টি ও মেঘমালা। আকাশ ঘিরে রয়েছে নক্ষত্ররাজি। আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত এ ধরনের অসংখ্য বিশ্ব রয়েছে। তার অনেকগুলো আমরা দেখতে পারি আবার অনেকগুলো দেখতে পারি না। অনেকগুলো তিনি সৃষ্টি করেছেন আবার অনেকগুলো সৃষ্টি করবেন। মানুষকে ভিত্তি করে কুরআন এ সবগুলোর আলোচনা করেছে। এর মধ্য থেকে ছোট বড় কোনটাকেই বাদ দেয়নি। শুরু থেকে পৃথিবীর বুকে যাদের অস্তিত্ব ছিল পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী, বন-বনানী, বৃষ্টি-মেঘপুঞ্জ এবং এখানে যা কিছু উৎপন্ন হতো শস্য, ফল, উদ্ভিদ ইত্যাদি সবকিছুরই অবতারণা করা হয়েছে কুরআনে। কুরআনের এ ধরনের কিছু আয়াত এখানে উদ্ধৃত হলো।

---

[৪৮৪] মুহাম্মদ মুবারক আবদুল কাদের, আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাহ।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি। আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন করেছি পরিমিতভাবে। এবং তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও[৪৮৫]।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى- كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى

তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার পথ। তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশুগুলোকে চরাও। এতে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য[৪৮৬]।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ খেতে পারো এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পারো রত্নাবলী, যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান করো, এবং তোমরা দেখতে পাও তার বুক

[৪৮৫] সুরা আল হিজর ১৯-২০ আয়াত।

[৪৮৬] সুরা তা-হা ৫৩-৫৪ আয়াত।

www.pathagar.com

চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এ জন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো[৪৮৭]।

তারপর জল-স্থল থেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রকাশ ঘটে, জল-স্থলের সম্পর্ক তার সাথে গভীর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, যা মানুষের উপকার করে তাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহের, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জনসমষ্টির জন্য বিশেষ নিদর্শন রয়েছে[৪৮৮]।

এর পূর্বে এসেছে নিম্নোক্ত আয়াতটি :

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

এক ইলাহ, তিনিই তোমাদের ইলাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি করুণাময়, অতি দয়ালু[৪৮৯]।

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، لَا

---

[৪৮৭] সুরা আন নাহল- ১৪ আয়াত।

[৪৮৮] সুলা আল বাকারাহ- ১৬৪ আয়াত।

[৪৮৯] সুরা আল বাকারাহ- ১৬৩ আয়াত।

www.pathagar.com

الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত্রি, তা থেকে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সবই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট কক্ষ পথে। এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। শেষ পর্যন্ত তা শুকনো, বাঁকা, পুরানো খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করছে[৪৯০]।

তিনি বলেন :

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

তিনিই তোমদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে। আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য[৪৯১]।

তিনি বলেন :

وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্য স্থলে পৌছতে পার তিনি ভূপৃষ্ঠ পথ

---

[৪৯০] সুরা ইয়াসীন- ৩৭ ও তার পরবর্তী আয়াত।

[৪৯১] সুরা আন নাহল- ১২ আয়াত।

www.pathagar.com

> নির্দেশক চিহ্ন সমূহ রেখে দিয়েছেন। আর তারকার সাহায্যেও মানুষ পথনির্দেশ পায়[৪৯২]।

কুরআনের এই আয়াত ক'টি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তার চারদিকের বিশ্ব ব্যবস্থা ও বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের দিকে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার অন্তস্থিত সত্য নিরীক্ষণ করে তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে। তখন সে বলে ওঠে : যে সৃষ্টি করে সে কি তার মতো হতে পারে যে সৃষ্টি করে না? এ অবস্থায় প্রশান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতি ও সহজ সরল বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে একথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না যে, তারা কখনোই সমান হতে পারে না। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন তারপর পথ নির্দেশন করেছেন। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের সবার রব।

আর মানবজীবনের সকল দিকের ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। একেবারে তার সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে, তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে আলোচিত হয়েছে। যার জবাব তাকে অবশ্যই দিতে হবে এবং জবাব দিতে গেলে তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সে একজন স্রষ্টার সৃষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এ বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। মানুষের অস্তিত্বের সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে তার এ দুনিয়ার জীবনের সকল সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। এভাবে তাকে ক্রমান্বয়ে সত্যের দিকে টেনে এনেছেন। মাঝখান থেকে কোন মিথ্যা এসে এ সত্য থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

> হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন। যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন[৪৯৩]।

---

[৪৯২] সূরা আন নাহল- ১৫-১৬ আয়াত।

[৪৯৩] সূরা আল ইনফিতার- ৬-৮ আয়াত।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

> فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
>
> কাজেই মানুষ চিন্তা করুক কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে। তা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্যখান হতে[৪১৪]।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ
>
> মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিল না[৪১৫]?

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
>
> আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে। তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে। তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি এক সৃষ্টিরূপে। কাজেই সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কত মহান[৪১৬]।

এ আয়াতগুলো এবং আরো বিভিন্ন আয়াত মানুষকে তার অজ্ঞতা এবং তার সৃষ্টি প্রক্রিয়া ভুলে যাওয়া সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করে। এ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা এবং এগুলোর জবাব অনুসন্ধান করাকে এড়িয়ে চলার ক্ষমতা তার নেই।

---

[৪১৪] সুরা আত তারেক- ৫ ও তার পরবর্তী আয়াত।

[৪১৫] সুরা আল কিয়ামাহ ৩৬-৩৭ আয়াত।

[৪১৬] সুরা আল মুমিনূন- ১২ আয়াত।

www.pathagar.com

কাজেই তার নিজের অস্তিত্ব কি পর্যায়ে আছে এবং কে তাকে অস্তিত্ববান করলো এ সম্পর্কে অবশ্যই তাকে চিন্তা করতে হবে। তার সৃষ্টি পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে যখন সে অনস্তিত্বের পর্যায় থেকে অস্তিত্ববান হলো এবং এক বিন্দু তুচ্ছ ঘৃনার্হ পানি থেকে মানুষের অস্তিত্ব লাভ করলো, এ পর্যায়ে প্রথমে রক্তপিণ্ডে পরিণত হলো, তাতে হাড় উৎপন্ন হলো এবং হাড়ে লাগলো গোশতের আস্তরণ, তারপর হয়ে গেল একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস, একজন গর্বিত মানুষ- এ সমস্ত স্তর অস্বীকার করে অযথা বিতর্কে লিপ্ত হবার ক্ষমতা তার নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ- أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

> তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি[৪১৭]?

কাজেই ভারসাম্যপূর্ণ সুসম মানবিক প্রকৃতির পক্ষে একথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই : তুমিই আল্লাহ তায়ালা। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমিই সবকিছুর স্রষ্টা। সবকিছুর উপর তুমি শক্তিশালী। সমস্ত জিনিসের জ্ঞান তুমি রাখো এবং সকল বিষয় তুমি নিয়ন্ত্রণ করে থাকো। বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য তুমি আয়াতগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। তুমি জানো প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে, আর তোমার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। আমরা কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে রব হিসেবে খুঁজছি? তুমিই সমস্ত জিনিসের রব। হে আমাদের রব! আমরা ইমান এনেছি যা কিছু তুমি নাযিল করেছ তার প্রতি এবং আমরা রসুল সা.-এর আনুগত্য করেছি। কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

এ বিশ্ব জাহানের সমস্ত অংশ একটির সাথে অন্যটি সংশ্লিষ্ট এবং তাদের সবার গতির মধ্যেও একটি সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সত্য ও মহাসত্যের অনুসন্ধানে এর সম্পর্কে চিন্তা করে মানুষ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উন্নতী হয় এবং এক অংশ থেকে অন্য এক অংশে পৌছে যায়, যেমন মাতৃগর্ভে গভীর অন্ধকারে তার অস্তিত্বের পথ পরিক্রমায় সে এক পর্যায় থেকে অন্য এক পর্যায়ে পৌছে গিয়ে থাকে।

এই পর্যায়ান্তরে স্থানান্তরিত হবার বিষয়টি আমরা ইবরাহীম আ.-এর ঘটনাবলীতে দেখতে পাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

---

[৪১৭] সুরা আল ওয়াকিয়া- ৫৮-৫৯ আয়াত।

www.pathagar.com

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

এভাবে ইবরাহীমকে আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই এবং যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়[৪৯৮]।

তিনি তাঁর চিন্তা স্থানান্তরিত করলেন নক্ষত্র থেকে চাঁদের দিকে, তারপর চাঁদ থেকে সূর্যের দিকে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মুখ ফিরিয়ে দিলেন সেই সৃষ্টিকর্তার দিকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। শিরক প্রতিরোধ করলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দেয়া পথ নির্দেশনার মাধ্যমে পথ নির্দেশ লাভ করলেন।

মানুষ ওহির পথ নির্দেশনার মাধ্যমে মহাসত্যের কাছে পৌঁছে যায়। এ মহাসত্য হচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তা ও এই বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানা, তাঁর সাথে সম্পর্কের বাঁধন সুদৃঢ় করা, এই স্রষ্টার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে একক সত্তা হিসেবে মেনে নেয়া। তাঁকে মর্যাদা এবং উচ্চ মর্যাদা দান করা এবং এভাবে অন্য কারোর নয়, একমাত্র তাঁর একনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হওয়া।

এ বিশ্বে মানুষের অবস্থান এবং তার সাথে সম্পর্ক

বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক কোন পর্যায়ের? মানুষ এই বিশ্বের জীবকুলের মধ্যে অন্যতম। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা তাকে বসতি স্থাপন করিয়েছেন। এখানে বহু বিচিত্র গুণের অধিকারী সৃষ্টির সাথে নিজস্ব গুণ বৈচিত্রসহ সে একত্র বসবাস করে।

তার মধ্যে বস্তুগুণ রয়েছে। কারণ সে মাটির তৈরি। তার মধ্যে উদ্ভিদগুণ রয়েছে। কারণ উদ্ভিদের মতো সেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও উদ্ভিদের আরো বহুগুণ তার মধ্যে রয়েছে। পশুর বিভিন্ন শ্রেণির প্রবৃত্তি ও গুণাবলীর সাথেও তার মিল রয়েছে। যেমন সেও তাদের মতো পানাহার ও বংশবৃদ্ধি করে।

কিন্তু এই ধরনের একাত্মতা সত্বেও আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে মর্যাদাশীল করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট গুণাবলী দান করে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই গুণগুলোর মধ্যে প্রধানতম হলো বুদ্ধিবৃত্তি। সন্দেহ নেই মানুষ এই বিশ্বের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত এবং এ হিসেবে এখানে তার একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। বরং বলা যায়, মানুষ এই বিশ্বের

---

[৪৯৮] সূরা আল আনআম- ৭৫ আয়াত।

www.pathagar.com

অন্যান্য সমস্ত অংশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে এবং তার সমস্ত লাভ ও কল্যাণ নিয়ন্ত্রণ করছে।

বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্কের দু'টো দিক রয়েছে। এর একটি হচ্ছে : লাভ ও কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ করা ও কাজে লাগানো। আর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে : বিশ্ব এবং তার মধ্যে যেসব নিদর্শন আছে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা।

প্রথম দিকটি হচ্ছে

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে যখনই বিশ্বের কোন একটি অংশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তখনই সেই সাথে তার মধ্যে মানুষের জন্য কি লাভ ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে সে দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি[৪৯৯]।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

এটা তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর ভোগের জন্য[৫০০]।

এর আগে বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসব্জির কথা বলা হয়েছে। এ সমস্ত উদ্ভিদজাত খাদ্য মানুষের ও তার পশুর ভোগ্যসামগ্রী। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ- وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ- وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ

তিনি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং তা থেকে তোমরা খাদ্য

---

[৪৯৯] সুরা আবাসা ২৪-২৫ আয়াত।

[৫০০] সুরা আবাসা ৩২ আয়াত।

www.pathagar.com

পেয়ে থাকো। এবং তোমরা যখন গোধুলি লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি থেকে গৃহে নিয়ে এসে থাকো এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর। এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে চূড়ান্ত ক্লেশ ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না[৫০১]।

চতুষ্পদ জন্তুর সাহায্যে মানুষ যে উপকৃত হয় তার মধ্যে এগুলো ছাড়া কুরআনে আরো বিভিন্ন বস্তু, নদী, বায়ু, মেঘমালা, বৃষ্টি, সূর্য চন্দ্র, নক্ষত্র, রাত দিন ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুকে নিজের কল্যাণে নিয়োগ ও ব্যবহার করার পর্যায়ে মানুষকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এ থেকেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, এই বিশ্বে সে সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন সত্তা। এর ফলে তার স্রষ্টা তার জন্য এই বিশ্বে বিশেষভাবে যেসব অনুগ্রহের সমাবেশ ঘটিয়েছেন সেদিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত হয় এবং সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনার পথে অগ্রসর হয়।

দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে

বিশ্ব ও প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক। এই বিশ্বকে সে তার চিন্তার ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। তাই বিশ্বের সমস্ত অংশ ও ঘটনাবলীকে কুরআন মানুষের অনুভবগ্রাহ্য শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছে। যেমন গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা, চোখে দেখা, কানে শোনা এবং এমন সব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ণনা করা যা থেকে চিন্তা করার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেমন- ভেবে দেখে, চিন্তা করে, জানে, গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে, বিশ্বাস করে, বোঝে, স্মরণ করে এবং এ ধরনের আরো অনেক শব্দ।

যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً

তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উৎপন্ন করি শস্য?[৫০২]

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

---

[৫০১] সুরা আন নাহল ৫ ও তার পরবর্তী আয়াত।

[৫০২] সুরা আস সাজদাহ- ২৭ আয়াত।

www.pathagar.com

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক না কেন[৫০৩]।

তিনি বলেন :

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

তারা কি নিজেদের সত্তার ব্যাপারে চিন্তা করে না[৫০৪]?

চিন্তা-ভাবনা করা সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর শেষে বলা হয়েছে :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

এ মধ্যে রয়েছে বহুবিধ নিদর্শন বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে[৫০৫]।

আরো বলা হয়েছে,

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

এর মধ্যে রয়েছে বহুবিধ নিদর্শন বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য[৫০৬]।

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত এগুলো ছাড়া আরো বহু আয়াত উল্লেখিত হয়েছে। উল্লেখিত দুই ধরনের সংযোগ পদ্ধতিতে এবং এই সঙ্গে আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এবং মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার পদ্ধতিতে কুরআন বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

---

[৫০৩] সূরা আবাসা- ২৪ আয়াত।

[৫০৪] সূরা আর রুম- ৮ আয়াত।

[৫০৫] সূরা আন নাহল- ১১ আয়াত।

[৫০৬] সূরা আর রাআদ- ৪ আয়াত।

www.pathagar.com

নিশ্চিত বিশ্ববাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে এবং তোমাদের নিজ সত্তার মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক-এর উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। আকাশ ও পৃথিবীর রবের শপথ, একথা সত্য এবং তেমনি নিশ্চিত যেমন তোমরা কথা বলছো[৫০৭]।

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের সাহায্যে মানুষ ইমানে পৌঁছে যায়। আল্লাহ তায়ালার মহিমান্বিত ও পূর্ণতার গুণাবলীতে সে তাঁকে গুণান্বিত করে। আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের অন্তরকে বিনত ও বিনম্র করে মু'মিন ও সত্যবাদীতে পরিণত হয়। কণ্ঠের সাহায্যে সে ওহিবাহিত সংবাদের স্বীকৃতি দেয়। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না এবং তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করে না।

সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানই দ্বীনের মূল বিষয়। আল্লাহ তায়ালার পথ নির্দেশনায় মানুষ সেখানে পৌঁছে যায়। বুদ্ধির সামনে নানান যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে ওহির সাহায্যে আল্লাহ তায়ালা এ পথনির্দেশ দান করেন। কুরআন তার যুক্তি-প্রমাণ ও নির্দেশের মাধ্যমে বহু পথ দেখায়, যাতে বুদ্ধির অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার বিশ্লেষণ করে যথার্থ পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে কুরআন বিশ্বের ছোট বড় প্রত্যেকটি অংশের প্রতি ইঙ্গিত করে এবং এ সম্পর্কে বুদ্ধিকে সতর্ক ও সজাগ করে তোলে। তার মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ ও দ্বন্দ্বমূলক যুক্তি-প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআন মানুষের চিন্তাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পাকড়াও করে মহাসত্যের কাছে নিয়ে যায়। এই মহাসত্য হচ্ছে এই অস্তিত্বের জগতের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান। এভাবে যথার্থ ইমানের মাধ্যমে দ্বীনও অর্জিত হয়। দ্বীনের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ হচ্ছে তা নিজের ব্যাপারে হয় উদারচেতা, নিকৃষ্টতম বিপথগামীকেও সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে উপরে উঠায় এবং অধিকতর বাঞ্ছনীয় কল্যাণকে টেনে আনে। নবি করীম সা.-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ কাজটি সবচেয়ে ভাল? জবাব দিয়েছিলেন : আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান। এক্ষেত্রে ইমানকে শ্রেষ্ঠ কর্মরূপে চিহ্নিত করার মূলে ছিল তার সর্বোত্তম কল্যাণের ধারক হওয়া ও নিজের ও পরিপার্শ্বের মর্যাদা বোধে উজ্জীবিত হয়ে নিকৃষ্টতম অসৎবৃত্তিকে হটিয়ে দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করা। এর কল্যাণ দুই প্রকারের। একটি দ্রুত অর্জিত হয়। যেমন ইসলামের বিধান জারী করা এবং ধন, প্রাণ, সহায়-সম্পদ,

---

[৫০৭] সুরা আয যারিয়াত ২০-২৩ আয়াত।

www.pathagar.com

মর্যাদা ও সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা লাভ করা। দ্বিতীয়টি বিলম্বে অর্জিত হয়। যেমন **জান্নাতে প্রবেশ করা এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করা**[৫০৮]।

মানুষের দ্বিতীয় অবস্থান ফরয ইবাদত

অন্তরে ইমানকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পর মানুষ দ্বিতীয় অবস্থানে চলে আসে। এটি হচ্ছে ইবাদতের পর্যায়। ইবাদত বলা হয় চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে আনুগত্য করাকে। এ অবস্থায় ইবাদতকারীর জন্য ইবাদতগৃহের প্রয়োজন হয়। এটিই প্রচলিত রীতি। দ্বীন প্রতিষ্ঠা, তাকে পূর্ণতা দান ও সংরক্ষিত করার জন্য এটি একটি বুনিয়াদি কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এর মধ্যে মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য উভয় কাজকেই শামিল করা হয়। মহান ও পাক-পবিত্র আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের স্বীকৃতির সাথে এগুলো জড়িত। তিনি মানুষ ও বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা। আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের এই স্বীকৃতি হচ্ছে গোপন বিনয় ও নম্রতা। আর ইবাদত হচ্ছে প্রকাশ্য বিনয় ও নম্রতা এবং অন্তরের স্বীকৃতির পরই এটি সম্ভব হয়। অন্যদিকে এই প্রকাশ্য বিনয় ও নম্রতা বিশ্বাসকে নির্জলা চিন্তার স্তর থেকে অন্তরের অন্তস্থলে স্থানান্তরিত করে। এর ফলে অনুভূতি ও চেতনার জগতে সে প্রবেশ করে এবং বিশ্বাস অন্তরকে উত্তাপ ও আলো সরবরাহ করে তার পরিচালক শক্তিতে পরিণত হয়।

এক ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব জানে এবং চিন্তাগতভাবে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আর অন্য এক ব্যক্তি তাঁর ঔজ্জ্বল্য ও নিয়ন্ত্রণ অনুভব ও উপলব্ধি করে, তাকে প্রকাশ্যে ও গোপনে জানে এবং তাঁর সাথে নির্দিষ্ট সাক্ষাত ও তাঁর সামনে জবাবদিহির কথা মনে মনে কল্পনা করে। এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে ইবাদত এমন একটি মাধ্যম যার সাহায্যে মানুষ প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় চলে আসে। এটি হচ্ছে অনুভব ও চেতনার অবস্থা। এই চেতনা বিশ্বাসের কাষ্ঠখণ্ডকে জ্বালিয়ে তাকে খাদ্য পরিবেশন করে এবং নিজেও তার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাকে জীবিত রাখে এবং নিজেও তার সাহায্যে জীবিত হয়।

এ থেকে আমরা কুরআনে রসুলগণের অবস্থা ও তাঁদের রিসালাতের উৎস অনুসন্ধান করার পথের সন্ধান পাই। যদি আমরা এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করি

---

[৫০৮] কাওয়ায়েদুল আহকাম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম পৃষ্ঠা ২১।

www.pathagar.com

তাহলে ইমান ও তাওহিদের বিষয়কে আমরা সব সময় ইবাদতের অগ্রে দেখতে পাই। অন্য কথায় ইমান ও তাওহীদ সম্পর্কিত বিধান প্রকাশ্য ইবাদতের বিধানের অগ্রবর্তী। এক্ষেত্রে আমরা মুসা আ.-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রথম যখন নবি হিসেবে মনোনীত করেন তখন বলেন :

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي

এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, কাজেই যে ওহি প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগ সহকারে শোন। আমি আল্লাহ তায়ালা, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। কাজেই আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো[৫০৯]।

তওহিদকে ইবাদতের অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কারণ তওহিদ হচ্ছে মূল ও আসল এবং তওহীদ ছাড়া ইবাদত কায়েম হয় না।

আল্লাহ তায়ালা ঈসা আ.-এর পক্ষে বলেন :

وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

আল্লাহ তায়ালাই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, কাজেই তাঁর ইবাদত কর, এটি সরল সোজা পথ[৫১০]।

এখানেও মৌখিক স্বীকৃতিকে ইবাদাতের উপরে স্থান দেয়া হয়েছে। মুহাম্মদ সা.-এর পক্ষে বলা হয়েছে :

لاَ تَجْعَل مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً، وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً

আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোন ইলাহ স্থির করো না। যদি কর তাহলে নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। তোমার রব আদেশ দিয়েছেন তাঁকে

[৫০৯] সুরা তা-হা- ১৩-১৪ আয়াত।

[৫১০] সুরা মারয়াম- ৩৬ আয়াত।

www.pathagar.com

ছাড়া আর কারো ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে[৫১১]।

এ আয়াতের বক্তব্য সুস্পষ্ট। কারণ আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ না করাটাই যথার্থ তাওহীদ। আর আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন মানে হচ্ছে, তাঁর ইবাদত করার ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করার নির্দেশ দিয়েছেন[৫১২]। কারণ তিনি শরীকানা থেকে মুক্ত।

ইমান ও ইবাদাতের মধ্যে এটি একটি ন্যায়ানুগত বিন্যাস। কারণ ইবাদত হচ্ছে বিনত হওয়া এবং নম্রতা ও বিনয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া। ইবাদত হচ্ছে, মাবুদের শ্রেষ্ঠত্বকে নিজের অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিয়ে তাকে প্রাকৃতিক প্রবণতায় পরিণত করা এবং তাঁর নৈকট্যকে এমনভাবে অনুভব করা যেন মনে হবে তাঁকে একেবারে সে নিজের সামনেই দেখতে পাচ্ছে।

এজন্য প্রথমে দরকার হচ্ছে মাবুদকে জানা। এর দ্বিতীয় পর্যয়টি হচ্ছে, ইমানের আলোকে অন্তর ভরে ফেলা এবং নিজের অনুভূতি ও প্রেরণার চাহিদা অনুযায়ী অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তায়ালা রহমানুর রহীমের অনুগত করা[৫১৩]।

আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত প্রত্যেকটি দ্বীনেরই ইবাদত এসেছে তাওহিদের পরেই। এভাবে ইবাদত আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানকে পরিপূর্ণ করেছে। তাওহিদের ব্যাপারে সমস্ত নবি ও রসূলগণ যেমন একই নীতির অনুসারী তেমনি তাঁদের ইবাদতের মূলনীতিও একই। কারণ আল্লাহ তায়ালার একত্বে বিশ্বাস ও তাঁর ইবাদত দুটো পৃথক জিনিস নয়, যদিও পরিবেশের প্রেক্ষিতে ইবাদত পালনের রীতির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

নবি ও রসূলগণের তাওহিদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে একই মূলনীতি অনুসরণের উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

---

[৫১১] সুরা আল ইসরা ২২-২৩ আয়াত।

[৫১২] আল কুরতুবী খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২৩৮।

[৫১৩] জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম পৃষ্ঠা ৩১। তাফসীর আল মানার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮।

www.pathagar.com

> তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহি করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে মতভেদ করো না[৫১৪]।

তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার এবং সেই সঙ্গে তার মধ্যে মতভেদ করতে নিষেধ করেছিলেন। এ থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, দ্বীনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ যদি সবগুলো একই দ্বীন না হয়ে থাকবে তাহলে তাদের মধ্যে পার্থক্য না করতে বলাটা সঠিক হয় কেমন করে? আর যেহেতু আমরা আগের শরিয়াহর মধ্যে পার্থক্য ও মতভেদ দেখি শুধুমাত্র শাখা-প্রশাখায় ও খুটিনাটি বিষয়ে, তাই দ্বীন বলতে মূলত দ্বীনের মূলনীতিই বুঝাবে অর্থাৎ যা স্থান-কালের অধীন হয় না। ইমাম কুরতুবী বলেন : এর মানে হচ্ছে- হে মুহাম্মদ ও নূহ! আমি তোমাদের দ্বীনের বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিচ্ছি। অর্থাৎ দ্বীনের এমন মূলনীতি যার ব্যাপারে শরিয়াহর মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এগুলো হচ্ছে : তাওহীদ, সালাত, যাকাত, সওম, হজ, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সৎকাজের সাহায্যে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ, সত্যবাদিতা, অঙ্গিকার পূরণ, আমানত আদায় ও আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার, যেকোন অবস্থায়ই হোক না কেন অকৃতজ্ঞ না হওয়া, হত্যা ও ব্যভিচার না করা এবং সৃষ্ট জীবকে কষ্ট না দেয়া। এগুলো সবই একই দ্বীনের শরিয়াহ এবং একটি মিল্লাতের অংশ। নবিদের সুন্নাতের মধ্যে এক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই, যদিও তাঁদের সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ আছে[৫১৫]।

ইমানের পরে দ্বিতীয় পর্যয়ে আসে ইবাদাতের চারটি বুনিয়াদ। ইমান ইবাদাতের প্রয়োজন মুক্ত নয়। আবার ইমানের অস্তিত্ব না থাকলে মূলত ইবাদত অনুষ্ঠিত হতে পারে না। যদি তেমন হয় তাহলে সবকিছু বিক্ষিপ্ত ধুলিকতায় পরিণত হবে এবং এক প্রবল বাত্যা বিক্ষুদ্ধ দিনে বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

ইবাদতের এই অস্তিত্ব জগতে মানুষকে তার আসল অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের মধ্যে দ্রুত স্বাদ গ্রহণ করার ও নিকটবর্তী লাভের ভাগী হবার প্রবণতা রয়েছে। এর বাইরে যা কিছু আছে তা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। যখনই তার চেতনা ও জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে এবং সে নিকটবর্তী সাময়িক লাভ ও দূরবর্তী চিরস্থায়ী লাভের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে তখনই দূরবর্তী স্থায়ী লাভের

---

[৫১৪] সুরা আশ শূরা- ১৩ আয়াত।

[৫১৫] আল কুরতুবী খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১১।

www.pathagar.com

জন্য তার আকাঙ্ক্ষা শক্তিশালী হয়। আর যখনই এমনটি হয় তখনই সে জৈব কামনা থেকে দূরে সরে নির্ধারিত মানবিক মানের উপরে উঠে যায় এবং আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে অনেক উর্ধে অবস্থান করে[৫১৬]।

এই বস্তুজগতে যে ব্যক্তি তার মহান অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে সক্ষম হয় সে মানবতার উচ্চতর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে চলে যায়। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি সচেতন হয় এবং সৃষ্টি জগতের জন্য তাদের চেয়ে বেশি কর্মতৎপর হয়।

আর ইবাদত মানুষের সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার সাথে জুড়ে দেয়। এই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আনন্দ-সুখ এবং পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, জাতি-গোত্র, দেশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবার উপর এ সম্পর্ককে স্থাপন করে।

সে সম্পর্কের এ সমস্ত বলয় অতিক্রম করে সব সম্পর্ককে ঘিরে শেষ পর্যায়ে সম্পর্কের যে উচ্চতর স্তর গড়ে উঠেছে সেখানে পৌঁছে যায়। এটি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, হুকুমকর্তা ও ফায়সালাকারী আল্লাহ তায়ালার সাথে তার সম্পর্ক। এটি মানবতার পূর্ণতার উচ্চতম মর্যাদা। যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় সে আবদুল্লাহ এই উত্তম নামে আখ্যায়িত হবার যোগ্যতা লাভ করে[৫১৭]।

কাজেই স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্পর্ক এং অন্য কোন সম্পর্ক এর উপরে উঠতে পারে না। ঐ সম্পর্কগুলোর স্বীকৃতি দিতে নিষেধ করা হয়নি কিন্তু সেগুলো হবে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কের তুলনায় ভিন্ন পর্যায়ের। কুরআন এ কথাই বলছে :

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ

---

[৫১৬] আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু পৃষ্ঠা ১৯১।

[৫১৭] আল কুরতুবী খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২০৫, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩২ এবং আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু, পৃষ্ঠা ১৯১।

www.pathagar.com

> বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসুল এবং আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করার চাইতে প্রিয় হয় তোমাদের বাপ, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাসো, তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহ তায়ালার বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ তায়ালা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না[৫১৮]।

যে সব মানুষ নিজের চারপাশে কেবল খাবার-দাবার, পানীয় ও সুস্বাদু জিনিস ছাড়া আর কিছুই দেখে না তারা পশুর মতো। পশুর ক্ষুধা পেলে খাবার খাওয়া ও পানি পান করা ছাড়া নিজেদের জীবনের আর কোন অর্থই বোঝে না। এই শ্রেণির মানুষরা তাই এই পশুদের সমতুল্য।

এদের মধ্য থেকে যারা পরিবার পরিজনদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়, তারপর নিজেদের জাতির ও দেশের জনগণের মধ্যে নিজেদের অবস্থান জেনে নেয়, তারা এদের থেকে উপরে উঠে যায়। তারা সমগ্র বিশ্বে নিজেদের অবস্থান জেনে নিয়ে সে সম্পর্কে সচেতন হয়। যে নির্ধারিত সময় ও কালের মধ্যে তারা জীবন-যাপন করছে এবং ভবিষ্যতে যে অনন্তকাল তাদের জীবন-যাপন করতে হবে, তার সীমারেখা সম্পর্কে তারা সচেতন।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান ও তাঁর আনুগত্য ছাড়া মানুষ এই উন্নত মর্যাদায় পৌছতে পারে না। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, ইমানই হচ্ছে আসল যার ভিত্তিতে দুনিয়ায় ও আখেরাতের জীবনে মানুষের প্রয়োজনে আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সামনের দিকে আমরা ইবাদাতের চারটি বুনিয়াদের প্রতিও সংক্ষেপে ইঙ্গিত করবো অর্থাৎ সালাত, যাকাত, সওম ও হজ।

প্রথম বুনিয়াদ সালাত

সালাত একটি ইবাদত। প্রত্যেক নবির শরীয়তে এই ইবাদতটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি অন্তরে ইমানের আলোকে শক্তিশালী করে এবং রাশিকৃত অশ্লীল ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ময়লা আবর্জনা থেকে মানুষকে রক্ষা করে। নির্ধারিত সময়ে শরিয়াহর কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী সহকারে ইবাদত করার কারণে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে মানুষ দূরে থাকতে সক্ষম হয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেছেন :

---

[৫১৮] সুরা আত তওবা- ২৪ আয়াত।

www.pathagar.com

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে[৫১৯]।

সালাত ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহ্য। জামায়াতের সাথে সালাত পড়ার মাধ্যমে এ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ইসলামের প্রথম স্তম্ভ। এটি দ্বীনের স্তম্ভ। যে একে কায়েম করেছে সে দ্বীনকেও কায়েম করেছে এবং যে একে ধ্বংস করেছে সে দ্বীনকে ধ্বংস করেছে। কুরআন ও হাদিসে এর অনেক ফযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। তবে ইমানের পরেই সালাতের কথা এসেছে এটিই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট। আর বিনীতগণ ছাড়া সবার জন্য এটি যথার্থই কঠিন।

সালাতের বিভিন্ন রুকন, শর্ত, কারণ ও নিষিদ্ধ কাজও আছে। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে ও পূর্ণতা সহকারে সালাত পড়তে চায় তার জন্য এগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি।

দ্বীনের হেফাযতের ক্ষেত্রে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ

এ কারণে যে ব্যক্তি জেনে বুঝে সালাত পরিত্যাগ করে তার ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রথমে দেখতে হবে, সে সালাত পড়া ফরয এ কথা অস্বীকার করে কিনা। যদি সে এর ফরয হওয়া অস্বীকার করে তাহলে তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ নেই। আর যদি সে কুড়েমির কারণে সালাত না পড়ে থাকে, তবে সালাত পড়া ফরয একথা বিশ্বাস করে, যেমন বেশির ভাগ লোকের অবস্থা, তাহলে এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

প্রথম যুগের পরবর্তীকালের অধিকাংশ ফকীহ, যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী, এমত প্রকাশ করেছেন যে, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে না তবে ফাসেক অবশ্যই হবে। যদি সে তওবা করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অন্যথায় বিবাহিত যিনাকারীর শাস্তির বিধান তার উপর জারী করে তাকে হত্যা করা হবে। তবে পাথর নিক্ষেপে নয়, তরবারির সাহায্যে তাকে হত্যা করা হবে।

প্রথম যুগের ফকীহগণের একটি দল এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সে কাফের হয়ে যাবে। আলী ইবনে আবু তালেব থেকে এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের দুটি অভিমতের মধ্যে একটি অভিমত এ ধরনেরও আছে। শাফেয়ী ফকীহদের কেউ কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা এবং কুফাবাসীদের একটি দল ও শাফেয়ীদের মধ্য থেকে মাযানী এ

---

[৫১৯] সুরা আল আনকাবুত- ৪৫ আয়াত।

www.pathagar.com

অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সে কাফের হয়ে যাবে না এবং তাকে হত্যা করাও হবে না বরং তার ওজর গ্রহণ করা হবে এবং তাকে কারারুদ্ধ করা হবে যে পর্যন্ত না সে সালাত পড়ে[৫২০]।

প্রথম দলটির যুক্তির ভিত্তি :

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

> আল্লাহ তায়ালা তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন[৫২১]।

১. এ আয়াতটি এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সাথে শির্কের বাইরে যে সমস্ত কাজ গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হয় সেই সব গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার বাইরে অবস্থান করে না।

২. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবি সা.-কে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রথমে যে বিষয়টির হিসাব দিতে হবে সেটি হচ্ছে ফরয সালাত। যদি সে সালাত পূর্ণ করে থাকে তাহলে ভাল, অন্যথায় বলা হবে তার নফল ইবাদতের মধ্যে কিছু আছে নাকি দেখ? যদি তার নফলের মধ্যে থেকে কিছু পাওয়া যায় যা তার ফরযের কমতি পূর্ণ করতে পারে তাহলে তা দেয়া হবে। এভাবে অন্যান্য ফরয ইবাদতগুলোর ব্যাপারেও করা হবে[৫২২]।

৩. নবি সা. আরো বলেন : যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল, ঈসা আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও তাঁর কালেমা যা তিনি মারয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর আদেশ এবং জাহান্নাম ও জান্নাত সত্য, তাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন[৫২৩]।

---

[৫২০] নাইলুল আওতার খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪০।

[৫২১] সুরা আন নিসা ৪৮।

[৫২২] সিহাহ সিত্তার প্রথম ৫টি গ্রন্থ এ হাদিসটি রেওয়ায়েত করেছে এ ছাড়া নাইলুল আওতার-খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৫।

[৫২৩] নাইলুল আওতার খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৬ এবং বুখারি ও মুসলিম।

www.pathagar.com

৪. নবি সা. বলেন : যে ব্যক্তি আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে মানুষের মধ্য থেকে সে-ই আমার শাফায়াত লাভে ধন্য হবে[৫২৪]।

এ হাদিসগুলো থেকে প্রমাণ হয়, সালাত পরিত্যাগকারী যদি সালাতের ফরয হওয়ায় বিশ্বাস করে তাহলে সালাত না পড়ার ফলে সে কাফের হয়ে যায় না। কারণ কাফের হয়ে গেলে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের লক্ষ্য নির্ধারিত হতে পারে না। সে মাগফিরাত ও শাফায়াতও লাভ করতে পারে না এবং জাহান্নামে চিরকাল থাকার হাত থেকে নিস্কৃতিও লাভ করতে সক্ষম হয় না। কারণ কাফের সর্বসম্মতভাবে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। সে শাফায়াত ও মাগফিরাতও লাভ করবে না। এখানে কুফর ছাড়া অন্য গুনাহর ব্যাপারেই মতবিরোধ দেখা দিয়েছে[৫২৫]।

সালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করার ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছে তার সপক্ষে আল্লাহ তায়ালার বাণী উপস্থাপন করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ

কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দেবে[৫২৬]।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কেবলমাত্র তাওবা করা তাদের পথ ছেড়ে দেবার জন্য যথেষ্ট নয় বরং এর পর তাদের অবশ্যই সালাত কায়েম করতে হবে এবং যাকাত দিতে হবে।

নবি সা. বলেন : লোকেরা যতক্ষণ না লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর সাক্ষ্য দেয় এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় ততক্ষণ আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। তারপর যখন তারা সেসব করবে তখন আমার হাত থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নেবে, কেবলমাত্র ইসলামের হক ছাড়া। আর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ তায়ালার কাছে হবে তাদের হিসাব[৫২৭]।

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবি সা. ইন্তিকাল করার পর আরবদের মধ্যে ইরতিদাদ (ইসলাম ত্যাগ করা) শুরু হলে উমর রা আবু বকর রা.-

---

[৫২৪] বুখারি এবং নাইলুল আওতার খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৬।

[৫২৫] নাইলুল আওতার- খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৭।

[৫২৬] সুরা আত তওবা- ৫ আয়াত।

[৫২৭] নাসাঈ ও নাইলুল আওতার।

www.pathagar.com

কে বললেন, হে আবু বকর! আরবদের সাথে তুমি যুদ্ধ করবে কেমন করে? আবু বকর বললেন, রসুল সা. বলেছেন : লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত না সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ তায়ালার রসুল আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে[৫২৮]।

এ হাদিস দু'টি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এই কর্তব্যগুলোর যে কোন একটির যে বিরোধিতা করবে তার রক্ত ও সম্পদ হালাল হয়ে যাবে। কাজেই একই কর্তব্যগুলো পালন করার সাথে রক্ত ও সম্পদের নিরাপত্তা জড়িত।

বলা যায়, উপরোক্ত আলোচনাগুলো আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দা ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা– এ হাদিসটির ব্যাখ্যা প্রদান করছে। এবং এই সংগে এমন সমস্ত হাদিসেরও ব্যাখ্যা প্রদান করছে যেগুলোতে সালাত পড়া ফরয একথা বিশ্বাস করার পরও সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সালাত পরিত্যাগকারী কুফরীর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়। আর এ শাস্তি হচ্ছে হত্যা অথবা সালাত পরিত্যাগকারীর কাজ কাফেরের কাজ[৫২৯]।

দ্বিতীয় দলটির যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে :

১. নবি সা. বলেন : (আল্লাহ তায়ালার অনুগত) ব্যক্তি ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা[৫৩০]। এ হাদিসটি একথা প্রকাশ করে যে, সালাত পরিত্যাগ করা হচ্ছে কুফরীর অপরিহার্য অংশ।

২. নবি সা. বলেন : আমাদের ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে সালাতের অঙ্গীকার। কাজেই যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে কুফরী করে[৫৩১]।

তিনি আরো বলেন : যে ব্যক্তি জেনে বুঝে সালাত পরিত্যাগ করে সে প্রকাশ্যে কুফরী করে[৫৩২]।

---

[৫২৮] বুখারি ও মুসলিম এবং নাইলুল আওতার খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৫।

[৫২৯] নাইলুল আওতার খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪১।

[৫৩০] বুখারি ও নাসাঈ ছাড়া একদল মুহাদ্দিস তাদের গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

[৫৩১] সিহাহ সিত্তার একজন ছাড়া পাঁচজন এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং নাইলুল আওতার খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

[৫৩২] তাবারানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

এই দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাগণ সবাই জেনে বুঝে সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে এই হাদিসগুলোর উপর আমল করেছেন। তাঁরা হাদিসের বাহ্যিক বক্তব্য এবং এর মধ্যে যে অর্থ পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে তাঁদের যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন।

অন্যদিকে তৃতীয় দলটি প্রথম দলটির প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁদের কাফের না হওয়ার যুক্তি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হত্যা না করার হাদিস উপস্থাপন করেছেন। নবি সা. বলেছেন : তিনটি অবস্থার কোন একটি ছাড়া মুমিনের রক্তপাত হারাম। এক. বিবাহিত যিনাকারী, দুই. প্রাণের বদলে প্রাণ, তিন. দ্বীন পরিত্যাগ করে দল থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভকারী[৫৩৩]।

এই তিনটি অবস্থা, এগুলো হচ্ছে ইসলামের হক। যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. তাঁর রসুল, তাদের কেউ উপরে উল্লেখিত তিনটি অবস্থার কোনো একটির দায়ে অভিযুক্ত হলে তার রক্তপাত মুবাহ হবার ব্যাপারে সমস্ত মুসলমান একমত। এ তিনটি অবস্থার মধ্যে সালাত পরিত্যাগকারীর কথা বলা হয়নি। কাজেই হত্যা ওয়াজিব নয়। যদি ওয়াজিব হতো তাহলে অবশ্যই এই সঙ্গে উল্লেখ করা হতো[৫৩৪]।

হয়তো কেউ এর বিরুদ্ধে বলতে পারেন যে, এখানে সালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়নি। কারণ হাদিসে দ্বীন পরিত্যাগকারীর কথা বলা হয়েছে এবং সালাত পরিত্যাগকারী তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ দ্বীন পরিত্যাগ করা বলতে কখনো দ্বীনের অনুশাসনের বিরোধিতা বুঝায় আবার কখনো কুফরী ও অস্বীকার করাও বুঝায়। প্রথম দলটির বক্তব্য বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ কুফরী হচ্ছে অন্তরের ক্রিয়া। আর অন্তরের ইমান সালাত পরিত্যাগ করার পর অবিচলিত আছে। সালাত পড়া ফরয এটা সে বিশ্বাস করতো। এই বক্তব্যকে সমর্থন করে আল্লাহ তায়ালার এ বাণী :

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ

তবে যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ইমানে অবিচলিত[৫৩৫]।

---

[৫৩৩] বুখারি ও মুসলিম।

[৫৩৪] জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম পৃষ্ঠা ১০৬।

[৫৩৫] সুরা আন নাহল- ১০৬ আয়াত।

www.pathagar.com

কাফের না বলার ব্যাপারে তাদের সাথে তৃতীয় দলটির একাত্মতা তাদের বক্তব্যকে আরো জোরালো করে। আর হত্যার রায় যারা দিয়েছেন তাদের পক্ষে অবশ্য চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। তবে ব্যাপারটি ভীতি প্রদর্শনের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যখনই আমরা বলবো, তাদের কেউ কেউ হত্যার রায় দিয়েছেন তখনই এই হত্যা হবে ভীতি প্রদর্শনের অর্থে, শরিয়াহর দণ্ডবিধি প্রবর্তনের অর্থে নয়। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে যে বিধান সেটিই আমাদের এ অভিমত সমর্থন করে। কারণ যুদ্ধ করা ছাড়াই যদি তাদেরকে দমন করা যেতো তাহলে অবশ্যই তাদের থেকে যাকাত আদায় করা যেতো এবং তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হতো। কিন্তু যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত ছাড়া তাদের উপর প্রতিপত্তি লাভ করা যাচ্ছে না তখন এ অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু এ হত্যাকে শরিয়াহর দণ্ডবিধি প্রয়োগ বলা যাবে না। বরং একে বলা যাবে রক্তপাত। অনুরূপভাবে সালাত পরিত্যাগকারী যদি ভীতি প্রদর্শন করার পরও সালাত পড়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাকে প্রতিরোধকারী মনে করা হবে। এ অবস্থায় সে হবে প্রতিরোধ প্রবণতা ও প্রচেষ্টাসহ বিরত থাকা ব্যক্তি। এ অবস্থায় সে কঠিন শাস্তি লাভের উপযুক্ত হবে এবং এ শাস্তি হবে হত্যা[৫৩৬]।

দ্বিতীয় বুনিয়াদ-যাকাত

ইসলামের গুরুত্ব ও এর স্তম্ভগুলোর ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী সালাতের পরে হলো যাকাতের স্থান। এটি একটি আর্থিক ইবাদত। কুরআনে বহু স্থানে একে সালাতের সাথে যুক্ত করে এবং বহুস্থানে সালাতের পরে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি বিশেষ নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে এ ইবাদতটি আদায় করা হয়। সেটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদ। দুনিয়ার নিয়ামত দুই প্রকারের : শারীরিক ও আর্থিক। দুনিয়ার নিয়ামতের শোকর আদায় করে আখেরাতে সওয়াব উপার্জন করার জন্য ইবাদতের প্রচলন করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা যে শরীরের নিয়ামত দান করেছেন সমস্ত শরীর দিয়ে যেমন তার শোকর আদায় করা হয় এবং এ শোকর হচ্ছে সালাত, ঠিক তেমনি যে সম্পদ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তার শোকরও আদায় করা হয় তারই অর্থাৎ ঐ সম্পদেরই অংশ থেকে। অভাবীকে অর্থ দান করার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা হয়। আর এ নৈকট্য তখনই অর্জিত হয় যখন অর্থদানকারী একনিষ্ঠভাবে

---

[৫৩৬] শাওকানি, নাইলুল আওতার খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৫।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালার জন্যেই অভাবীকে অর্থ দান করে। কাজেই সালাতের এক স্তর নিচেই হয় এর মর্যাদা[৫৩৭]।

যাকাত ফরয হয়েছে ধনীদের জীবন ও গরীবদের হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য। ধনীদের জীবন পরিশুদ্ধ করে কৃপণতা, লোভ ও লালসা থেকে এবং জুলুম ও অত্যাচারের আধিপত্য থেকে। অন্যদিকে গরিবদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করে হিংসা, বিদ্বেষ ও আক্রোশ থেকে, অভাবের তাড়নায় যা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটা যদি শুধু বাহ্যিক ক্রিয়াসর্বস্ব হয়ে থাকে তাহলে ধনীদের জন্য বহন করে আনে ক্ষতির পসরা। এই ফরযটি আদায়ের মাধ্যমে ইসলাম মুমিনদের দিল থেকে হিংসা ও বিদ্বেষ সমূলে উৎপাটন করে এবং তাদের ও এই সমস্ত মানসিক রোগীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়। জামায়াত ও উম্মতের জীবনের জন্য এই সমস্ত রোগ থেকে হৃদয় ও মনের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক বিশ্বের ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যে আমরা এই রোগগুলোর বিপুল ক্রিয়া লক্ষ্য করছি। এই সমস্ত রোগ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে সক্ষম না হলে কোন সমাজ টিকে থাকতে পারে না।

ইবনে আবদুস সালাম রহ. বলেন : কখনো দু'টি কাজের কল্যাণ সবদিক দিয়ে সমান হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা যার জন্য অথবা যার উপর ঐ কল্যাণ ওয়াজিব করেছেন তার জন্য দু'টির মধ্য থেকে একটি কল্যাণ আহরণ করা ওয়াজিব করে দেন। যেটি তিনি ওয়াজিব করেননি সেটির তুলনায় যেটি ওয়াজিব করেছেন সেটির প্রতিদান পূর্ণ করে দেন। কারণ নফল সাদাকার অর্থ এবং যাকাতের অর্থের মধ্যে কোন তফাত নেই। অথচ যাকাতটি তিনি ওয়াজিব করেছেন। কারণ যদি এটি না করতেন তাহলে ধনীরা গরীবদেরকে অর্থ প্রদান করার ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে নিতো। এর ফলে গরীবরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আর অন্যদের দেবার তুলনায় এর প্রতিদান বেশি করেছেন যাতে তারা দিতে উৎসাহিত হয়[৫৩৮]।

যাকাত যখন ধনীদের আত্মা ও গরীবদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে, গরীবদের অভাব দূর করে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং সমাজের লোকদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করে তখন তা মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্য কল্যাণে এবং দ্বীনের বুনিয়াদী স্তম্ভে পরিণত হয়। কারণ দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণার্থেই তৈরি করেছেন।

---

[৫৩৭] উসূলুস সারাখসী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯১।

[৫৩৮] কাওয়ায়েদুল আহকাম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯।

www.pathagar.com

যাকাত ওয়াজিব হবার পরও যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না তাকে হত্যা করা বৈধ। আর তাকে হত্যা করা হলে তার রক্তও হবে মূল্যহীন। কারণ সে আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার প্রতি জুলুম করেছে। আর সে যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে সেই সাথে তাকেও হত্যা করা হবে। কারণ সে বিনা কারণে একজনকে হত্যা করেছে। ফকীহগণ এ ব্যাপারে সবাই একমত। কারণ আবু বকর রা. যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি বলেছেন : যদি তারা উটের গলার রশিটাও আমাকে দিতে অস্বীকার করে যা তারা রসুল সা.-কে দিতো তাহলে তাদের এই অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো[৫৩৯]।

তৃতীয় বুনিয়াদ-সওম

আল্লাহ তায়ালা যে শরীরের নিয়ামত দান করেছেন তার শোকর আদায় করার জন্য সওম ফরয করেছেন। কিন্তু এর মর্যাদা সালাতের চাইতে কম। সালাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শামিল হয়, সওমে তা হয় না। বরং সওমে কেবলমাত্র দু'টি দৈহিক কামনাকে তাদের অবাধ বিচরণ থেকে বিরত রাখা হয়। তাদের একটি হচ্ছে পেটের কামনা এবং অন্যটি যৌনাঙ্গের। যে নফস স্বাদ ও কামনাপূর্তির নেশায় মত্ত থাকে তার মাধ্যমেই এই সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এই নফস হচ্ছে অসৎ প্রবণতামুখী আত্মা। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাকে এভাবেই চিত্রিত করেছেন। কামনার চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রেখে তাকে আল্লাহ তায়ালার মর্জিমত চলার ব্যবস্থা করেছেন। এটিই সৎকর্ম তথা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ[৫৪০]।

সওমের ফলে মানুষ যে সুবিধাটা লাভ করে তা হচ্ছে এই যে, তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা একটা অনুশীলনের মাধ্যমে দৃঢ় সংকল্পের উপর স্থান লাভ করে এবং স্বাদ ও কামনা এমন মুবাহ কাজগুলোর উর্ধে ওঠার শক্তিও তাকে দান করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত রাখার জন্য তার ইচ্ছা শক্তিকে প্রবল করে। এই সাথে মানুষ তাকওয়া ও আনুগত্যের নিকটবর্তী হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী থেকে প্রকাশিত হয় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

---

[৫৩৯] শাওকানী, নাইলুল আওতার খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৪।

[৫৪০] উসূলুস সারাখসী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯১।

www.pathagar.com

হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সওমের বিধান দেয়া হলো যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার[৫৪১]।

এভাবে সওম তাকওয়ার কারণে পরিণত হয়। আর তাকওয়া আল্লাহ তায়ালার আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে অবস্থান করে তাঁর আনুগত্য করার কারণ হয়, ফলে মানুষের পক্ষে সালাত পড়া, যাকাত দেয়া এবং এ ছাড়া অন্যান্য ওয়াজিব ও বৈধ কাজগুলো সহজ হয়।

চতুর্থ বুনিয়াদ- হজ

হজ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার মহিমান্বিত ঘর যিয়ারত করা। আর এটি হিজরত তথা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার মাধ্যমে আদায় করা হয়। এ জন্য কয়েকটি বড় বড় অপরিহার্য কাজ করতে হয় বিশেষ সময়ে ও বিশেষ স্থানে। এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের যে বিষয়টি আছে তা আসলে এই বিশেষ সময় ও স্থানগুলোকে মর্যাদা প্রদান অর্থেই নির্ধারিত হয়েছে[৫৪২]।

আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি এভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য[৫৪৩]।

হজ ইসলামের একটি অন্যতম রুকন তথা স্তম্ভ এবং তার বৃহত্তম ও মহত্তম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ইসলামি দলগুলোর পরিচিতি, তাদের পারস্পরিক অবস্থা অনুসন্ধান এবং দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময় ইত্যাদি ব্যাপারে তার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। সফরের ফলে হজযাত্রীদের নিজস্ব পর্যায়েও অনেক লাভ হয়। সামর্থবানদের উপর সারা জীবন এক বার হজ করা ফরয করা হয়েছে।

সামর্থ্যের ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। ব্যক্তি ব্যক্তির মধ্যে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে এ ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়েছে[৫৪৪]। হজ্জের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন

[৫৪১] সুরা আল বাকারাহ- ১৮৩ আয়াত।

[৫৪২] সারাখসী, উসূলুল ফিকহ- খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯১।

[৫৪৩] সুরা আলে ইমরান- ৯৭ আয়াত।

www.pathagar.com

রুকন, শর্ত, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কার্যক্রম। আবার কিছু কাজ এমন আছে যা করলে হজ নষ্ট হয়ে যায়। হজকে সঠিকভাবে ও পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার জন্য এগুলো জানা অপরিহার্য।

এগুলো ইবাদাতের চারটি বুনিয়াদ এবং ইসলামের চারটি স্তম্ভ। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান এদের সবার উপরে অবস্থান করছে। আর এটি হচ্ছে সমস্ত সৎ কাজের শাখা প্রশাখার কাণ্ড ও মূল, সেগুলোর সঠিক হওয়া ও আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হওয়ার শর্ত এবং এরি ভিত্তিতে আখেরাতের জীবনে সওয়াব নির্ধারিত হবে।

এ ইবাদতগুলো বান্দাদের উপর আল্লাহ তায়ালার হক হওয়া সত্বেও এগুলোর কল্যাণ দুনিয়ায় ও আখেরাতে ব্যক্তি ও সমাজের দিকেই ফিরে আসবে।

এ ইবাদতগুলো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় কল্যাণ ও সাফল্যের প্রাণ প্রবাহ। ভরে দেয় তাদের অন্তর ইমানের আলোয় ও আল্লাহ তায়ালা ভীতিতে। দূরত্ব সৃষ্টি করে তাদের ও অশ্লীল অসৎ কাজের আবর্জনা স্তুপের মধ্যে। পবিত্র করে তাদের হৃদয় ও আত্মাকে হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা থেকে। সেখান থেকে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বের করে নিয়ে প্রেম-প্রীতি দয়া-মমতায় ভরে তোলে সমস্ত অন্তর। শেষ পর্যন্ত তারা এক দেহে পরিণত হয় এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করে নিজের ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করতে শুরু করে। তাদের ব্যক্তির মানসিক সংকল্পকে দৃঢ়তর করে, যার ফলে তারা বড় শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়। আর এ বড় শত্রু হচ্ছে অসৎ প্রবণতাবাহী নফসে আম্মারাহ। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে পূর্ব ও পশ্চিমের বিশাল ব্যবধানের মধ্যে যোগাযোগ, পরিচিতি ও সহযোগিতা।

এ ইবাদতগুলো আবার ব্যক্তি ও দলের জীবনের যাবতীয় উন্নততর নৈতিক প্রয়োজন যেমন সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, অঙ্গীকার পালন এবং অন্যান্য মানবিক আচরণ ইত্যাদি পূরণের মাধ্যম। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকেও এগুলো তাদেরকে রক্ষা করে। কারণ এগুলো তাদের অন্তর ও শরীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে এবং তাদেরকে এমন সব রোগ থেকে দূরে রাখে যেগুলো ক্ষতি ও বিপর্যয় সৃষ্টির সহায়ক।

আর একারণে এগুলো উন্নততর কল্যাণ তথা দ্বীনের কল্যাণ সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণেই এগুলো দ্বীনের স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। এগুলোর উপরই দ্বীনের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। যেমন- নবি সা. বলেছেন : পাঁচটি জিনিসের

---

[৫৪৪] নাইলুল আওতার খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২২।

www.pathagar.com

উপর ইসলামের বুনিয়াদ কায়েম করা হয়েছেঃ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও রসুল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহর হজ করা ও রমাদানের সিয়াম সাধনা করা[৫৪৫]।

ইসলামের এই স্তম্ভগুলোই আল্লাহ তায়ালার নিকট দ্বীন হিসেবে গৃহীত। বুনিয়াদ ও স্তম্ভ ছাড়া কোন অট্টালিকা গড়ে উঠতে পারে না। ইসলামের অন্যান্য আচরণগুলো এই অট্টালিকাকে চূড়ান্তরূপ দিতে সহায়তা করে। এদের কোন একটির অনুপস্থিতিতে অট্টলিকা ত্রুটিপূর্ণ হয়। তবে অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর এই ত্রুটি তাকে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। অন্যদিকে উল্লেখিত পাঁচটি বুনিয়াদে ত্রুটি থাকলে অট্টালিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এগুলোর অনুপস্থিতিতে ইসলাম খতম হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। অনুরূপভাবে দু'টি শাহাদাত তথা সাক্ষ্য না পাওয়া গেলেও ইসলাম খতম হয়ে যায়। এই শাহাদাত দু'টি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা.-এর প্রতি বিশ্বাস। এ সাক্ষ্য দু'টি থাকার পর যদি অন্য চারটি বুনিয়াদ অনুপস্থিত থাকে তাহলে এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইতোপূর্বে সালাত পরিত্যাগ করার আলোচনায় আমরা এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছি।

এই পাঁচটি বুনিয়াদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। নবি সা.-এর একটি বাণীতে এরই প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে :

الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت هذه واحدة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة والزكاة طهور من الذنوب ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها.

[৫৪৫] বুখারি ও মুসলিম।

www.pathagar.com

পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়ে দ্বীন গঠিত। এদের একটি ছাড়া অন্যটি আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন না। সাক্ষ্য দেয়া এই মর্মে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রসুলগণের প্রতি এবং জান্নাত, জাহান্নাম ও মৃত্যুর পরে জীবনের প্রতি ইমান আনা। এগুলো সব মিলিয়ে একটি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দ্বীনের স্তম্ভ। সালাত ছাড়া আল্লাহ তায়ালা ইমান কবুল করবেন না। আর যাকাত গুনাহ থেকে পবিত্র করে। আল্লাহ তায়ালা ইমান ও সালাত গ্রহণ করবেন না যাকাত ছাড়া। যে ব্যক্তি এ তিনটি করলো তারপর রমযান এলো এবং সে জেনে বুঝে সওম পরিত্যাগ করলো, আল্লাহ তায়ালা তার ইমান, সালাত ও যাকাত কবুল করবেন না। যে ব্যক্তি এ চারটি করলো এবং তারপর হজ করার সুযোগ এলো কিন্তু সে হজ করলো না, কাউকে হজ করার অসীয়তও করলো না এবং তার পরিবারের কেউও তার পক্ষ থেকে হজ করলো না, এ ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে সে যে চারটি কাজ করেছিল আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করবেন না[৫৪৬]।

এ হাদিসটি রেওয়াতের করেছেন উসমান ইবনে আতা খুরাসানী তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে। ইবনে আবু হাতেম এটি উল্লেখ করেছেন- তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, এটি মুনকার হাদিস[৫৪৭]। এটি আতা খুরাসানীর বক্তব্য হবারও সম্ভাবনা আছে। আমার মতে, বাহ্যত এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের হাদিসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর আতা হচ্ছেন সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ আলেমগণের অন্যতম[৫৪৮]।

হাদিসটিতে ইনকার বা যঈফী যাই থাক না কেন এটি যে পূর্ণতার অর্থ প্রকাশ করেছে সে ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। কারণ এই স্তম্ভগুলোকে আল্লাহ তায়ালা একটি মাত্র সত্যকে পূর্ণতা দান করা ছাড়া অন্য কোন কারণে ওয়াজিব করেননি। আর সেই সত্যটি হচ্ছে দ্বীন। আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে যে আকৃতিতে গঠন করেছেন তার প্রকৃত সত্তার অস্তিত্বের জন্য এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হওয়া একান্ত জরুরি। অন্যথায় তা ত্রুটিমুক্ত হবে না এবং কামালিয়াত বা পূর্ণতা লাভ করবে না।

---

[৫৪৬] জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম পৃষ্ঠা ৩৯।

[৫৪৭] কোন যঈফ রাবীর হাদিস অপর কোন যঈফ রাবীর হাদিসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত বেশি যঈফ হাদিসটিকে মুনকার বলা হয়। ইনকার হাদীসের ক্ষেত্রে একটি মস্তবড় দোষ।- অনুবাদক।

[৫৪৮] জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম পৃষ্ঠা ৩৯।

www.pathagar.com

এভাবে আমরা দ্বীনের কল্যাণের জন্য মানুষের দ্বিতীয় অবস্থানের শেষ পর্যায়ে পৌছে গিয়ে থাকি। কারণ আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের কল্যাণকে তার সমস্ত কল্যাণের শীর্ষে স্থান দিয়েছি। তারপর স্থান দিয়েছি অপরিহার্য ইবাদতগুলোর কল্যাণকে। এগুলোকে অন্যান্য ইবাদতগুলোর ভিত্তিভূমি মনে করা হয়েছে, যেগুলো শেষ পর্যায়ে অবস্থান করছে। এগুলো হচ্ছে মানদুব তথা বৈধ ইবাদতসমূহের কল্যাণ। আর দ্বীনের কল্যাণ ধীরে ধীরে ইমান থেকে পৌছে যায় জনপথ থেকে কাঁটা সরিয়ে ফেলা পর্যন্ত। যেমন নবি সা. বলেছেন : ইমান সত্তরোর্ধ বা ষাটোর্ধ শাখায় বিভক্ত। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতমটি হচ্ছে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলা এবং নিম্নতমটি হচ্ছে জনপথ থেকে কাঁটা সরিয়ে ফেলা[৫৪৯]।

দ্বীনের কল্যাণের তৃতীয় অবস্থান

এ অবস্থানটিকে দ্বিতীয় অবস্থানের অধীন এবং তাকে পূর্ণকারী মনে করা হয়। এর কারণ হচ্ছে, আনুগত্যমূলক কর্মকাণ্ডগুলো সালাত পড়া, অর্থ দান করা, সওম রাখা বা হজ করার মধ্যে বিভক্ত। এগুলো করা ফরয হবে অথবা ফরয হবে না। যদি এগুলো ফরয হয় তাহলে এগুলোর আলোচনা সামনে দিকে চলবে। আর যদি ফরয না হয় তাহলে ফরযের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য তার অধীন হবে।

কাজেই সমস্ত নফল সালাত ফরয সালাতের অধীনে তাকে পূর্ণকারী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার বলয়ের মধ্যেই হবে তাদের অবস্থান। কিয়ামতের দিন ফরয সালাতের মধ্যে কোন ক্রুটি দেখা দিলে এই নফল সালাতগুলো তাকে পূর্ণতা দানে সাহায্য করবে। নবি সা.-এর একটি বাণীতে একথা সুস্পষ্টবাবে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেন :

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

কিয়ামতের দিন বান্দা সর্বপ্রথম ফরয সালাতের হিসেবের সুম্মখীন হবে। যদি সে তা পূর্ণ করে থাকে এবং তার পুরোপুরি হিসাব দিতে পারে তাহলে ভাল কথা, অন্যথায় বলা হবে দেখো, তার কোন নফল সালাত

---

[৫৪৯] মুসলিম, জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম পৃষ্ঠা ২৪।

www.pathagar.com

আছে কিনা। যদি তার এমন নফল থেকে থাকে যা ফরযকে পূর্ণ করতে পারে তাহলে তা করা হবে। এরপর তার সমস্ত ফরয আমলের সাথে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে[৫৫০]।

এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, নফলগুলো ফরযগুলোর উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। সব রকম নফলের ব্যাপারে এই একই কথা। অন্য কোন কারণে অর্থ দান করাকেও ফরয যাকাতের উদ্দেশ্য পূর্ণতা দানকারী বলে বিবেচিত হবে। কখনো নফল সালাতের মতো নফল সাদাকাও কিয়ামতের দিন এ হিসেবে বিবেচিত হবে, আবার কখনো দুনিয়াতেও। কারণ যাকাত যদি গরীব-মিসকিনদের অভাব দূর করতে না পারে তাহলে ধনীদের থেকে যাকাতের বাইরে অন্যান্য সাদাকার অর্থ সংগ্রহ করে গরীবদের অভাব পূরর্ণ করা হবে। কারণ সম্পদে রয়েছে যাকাতের হক এবং এ থেকে আমরা যে পথ নির্দেশনা পাই তা হচ্ছে এই যে, নফল সাদাকার সাহায্যে অর্থদানের মাধ্যমে ফরয যাকাতের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে, যা শুধুমাত্র বছরে একবার ঘুরে ফিরে আসে এবং তা নির্ধারিত হয় অভাবীদের অভাব পূর্ণ, তাদের সামগ্রিক দায়িত্ব পালন এবং দ্বীনের একটি স্তম্ভ হিসেবে দ্বীনকে পূর্ণতা দান করার জন্য। সওম ও হজ্জের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা হয়। প্রত্যেকটি সৎ ও আনুগত্যমূলক নফল কাজ এই চারটি বুনিয়াদের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং সেগুলোর অবস্থান হবে একটি ছায়া তলে।

---

[৫৫০] সিহাহ সিত্তার মধ্য থেকে পাঁচটি হাদিসের কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং নাইলুল আওতার- খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৫।

www.pathagar.com

চতুর্থ বিষয়টির আলোচনা

দ্বীনের কল্যাণ সংরক্ষণের ঋণাত্মক পদ্ধতি

এটি চার ভাগে বিভক্ত

এক. আল্লাহ্ তায়ালার পথে ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করার শরিয়াহী বিধান।

দুই. মুরতাদ ও যিন্দীকদের হত্যা করার শরিয়াহী বিধান।

তিন. দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং বিদআতী ও যাদুকরদেরকে শাস্তি দেয়া।

চার. গুনাহকে হারাম করা এবং যারা গুনাহ্ করে শরিয়াহ্র দণ্ডবিধি অনুযায়ী তদের শাস্তি দান করা।

প্রথম পদ্ধতি : জিহাদের শরিয়াহী বিধান

রসুল সা.-এর রিসালাত সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য। অন্য দিকে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মতকে শ্রেষ্ঠ মানব গোষ্ঠীতে পরিণত করেছেন।

মুহাম্মদ সা.-কে তিনি সর্বশেষ রসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁর রিসালাতকে সমস্ত যুগের সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত করেছেন ব্যাপকভাবে। তাঁর উম্মতকে বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাদের উত্থান হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। তাঁর রিসালাত সমস্ত মানুষের জন্য। এর স্বপক্ষে কুরআন ও হাদিস থেকে শক্তিশালী প্রমাণ পেশ করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(হে মুহাম্মদ!) বলো, হে মানুষ তোমাদের সকলের জন্য আমি আল্লাহর রসুল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই তোমরা ইমান আনো আল্লাহ তায়ালার প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর

www.pathagar.com

নবির প্রতি, তিনি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীতে ইমান রাখেন এবং তোমরা তাঁর অনুরসণ করো যাতে তোমরা পথ পাও[৫৫১]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[৫৫২]।

এ আয়াত দু'টি প্রমাণ করে যে, তাঁকে সমগ্র মানবজাতির ও সমস্ত প্রজন্মের কাছে পাঠানো হয়েছে। কাজেই তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করবে এবং তাঁর রিসালাতের বিরোধিতা করবে তার বিরুদ্ধে ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

নবি সা. বলেছেন : আমাকে সমগ্র মানবজাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন : আমাকে লোহিতকায় ও কৃষ্ণকায় সবার কাছে পাঠানো হয়েছে। রিসালাতের সার্বজনীনতার উপর আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি[৫৫৩]। আবার এই উম্মত যখন মানবজাতিকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে রুখবে তখন তারা শ্রেষ্ঠ মানব সম্প্রদায়ে পরিণত হবে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা একথাটিই বলেছেন :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরা শ্রেষ্ঠ মানব সম্প্রদায়। সমস্ত মানবজাতির জন্য তোমাদের উত্থান হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস করবে[৫৫৪]।

---

[৫৫১] সুরা আল আরাফ- ১৫৮ আয়াত।

[৫৫২] সুরা সাবা- ২৮ আয়াত।

[৫৫৩] কিতাবের শুরুতে ভূমিকার আওতায় ইসলামি শরিয়াহর সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন। প্রথম হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে সুয়ূতির জামেউস সগীর কিতাবে এবং দ্বিতীয়টি রেওয়ায়েত করেছেন মুসলিম, দারেমী ও আহমদ।

[৫৫৪] সুরা আল ইমরান- ১১০ আয়াত।

www.pathagar.com

সমগ্র মানবজাতির দায়িত্ব দিয়ে এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত করার মূলে যে চরিত্র বৈশিষ্ট্য কাজ করছে সেটি হচ্ছে এই যে, এদের উপর সৎ কাজের আদেশ করার এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। উসূলবিদ তথা ইসলামি শরিয়াহর মূলনীতিবিশারদগণের মতে কোনো হুকুমকে যখন তার সাথে সম্পৃক্ত কোন গুণের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয় তখন তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ঐ হুকুমটি পালিত হলেই ঐ গুণটি অর্জিত হবে। চোরের হাত কাটা হয় এবং তার কারণ হচ্ছে সে চুরি করেছে। ব্যভিচারীর উপর হদ জারী করা হয় এবং এর কারণ হচ্ছে সে ব্যভিচার করেছে। অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতের সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলী সম্পৃক্ত করার বিধান দিয়েছেন এবং তারপর এই আনুগত্য করার হুকুমটির উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ সৎ কাজ করার আদেশ ও অসৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখার এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনার। কাজেই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব গুণ এই ইবাদতগুলো করার কারণেই অর্জিত হবে।

এখানে দু'টি প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন।

প্রথম প্রশ্ন : এ উম্মতের উদ্ভব ঘটিয়ে সমগ্র মানবজাতির জন্য একে শ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত করা হলো কেন? এ জন্যই কি তারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে? পূর্ববর্তী নবিদের উম্মতগণ তাদের আমলে এসব গুণে গুণান্বিত ছিল।

জবাব : এ উম্মত জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করে অর্থাৎ যুদ্ধ করে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে বলেই একে পূর্ববর্তী সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। কারণ এই আদেশ ও নিষেধ কখনো অন্তর, কখনো কণ্ঠ আবার কখনো হাতের সাহায্যে করা হয়। আর এর সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে যুদ্ধ। কারণ এর ফলে মানুষ রক্তপাতের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। আর সর্বোত্তম সৎ কাজ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনা, তাঁর একত্বে বিশ্বাস করা এবং নবুওয়তের প্রতি ইমান আনা। অন্য দিকে নিকৃষ্টতম অসৎ কাজ হচ্ছে কুফরী করা, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অবাধ্য হওয়া। এ ক্ষেত্রে জিহাদ হয়ে দাঁড়ায় অন্যকে শ্রেষ্ঠতম লাভের ভাগী করার নিকৃষ্টতম ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে দুনিয়ার বৃহত্তম ক্ষতির বাহক। কাজেই জিহাদ এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম আমলে পরিণত হয়। আর জিহাদ যখন অন্য শরিয়াহর তুলনায় আমাদের শরিয়াহকে বেশি শক্তিশালী করে তখন সন্দেহাতীত ভাবে এটিই অন্য উম্মতের মোকাবিলায় আমাদের উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করাকে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ইমান আনার পূর্বে উল্লেখ করা হলো কেন? অথচ আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান সমস্ত হুকুম ও আনুগত্যের উপরে স্থান লাভ করেছে।

জবাব : সমস্ত সত্যপন্থী উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ইমানের বিষয়টি স্থান লাভ করেছে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন অন্য সত্যপন্থী উম্মতদের উপর। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামতটি অর্থাৎ ইমান যা সবার মধ্যে রয়েছে সেটি অর্জন করা কঠিনতর করে দিয়েছেন এবং তা অর্জন করার জন্য এ উম্মতকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে তার অবস্থাকে বেশি শক্তিশালী করেছেন।

এখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করাই হচ্ছে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উদ্যোক্তা। আর আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ইমান হচ্ছে এ হুকুমের মধ্যে এই উদ্যোক্তার প্রভাব বিস্তারের শর্ত। কারণ যতক্ষণ ইমান পাওয়া যাবে না ততক্ষণ শ্রেষ্ঠত্ব গুণের মধ্যে আনুগত্যমূলক কর্মের মধ্য থেকে কোন কিছুই প্রভাবশালী হিসেবে গণ্য হবে না। তাহলে প্রমাণ হয়ে গেলো যে, এ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সৎ কাজের আদেশকারী ও অসৎ কাজে নিষেধকারী হওয়া। তবে ইমান হচ্ছে এ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের শর্ত। আর উদ্যোক্তা প্রভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় প্রভাব বিস্তারের শর্তের দ্বারা। এ কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ইমানের অগ্রবর্তী করেছেন। অবশ্য সঠিক বিষয় আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন[৫৫৫]।

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি, উম্মতে মুসলিমা যদি সৎ কজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা এবং সর্বোপরি জিহাদ করা পরিত্যাগ করে তাহলে সে আর শ্রেষ্ঠ উম্মত থাকবে না। কারণ এর ফলে তার গুণাবলী অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং দোষ-ত্রুটিগুলো চার দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। তার দুর্বলতাগুলো বের হয়ে পড়বে এবং শত্রুরা তাকে ভয় করবে না। তার দলের মধ্যে মতভেদ, বিরোধ ও ভাঙ্গন দেখা দেবে এবং তারা নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ফলে অদৃশ্য হয়ে যাবে তাদের ইমানী শক্তি ও শৌর্য-বীর্য। তাই তাদের এ গুণাবলী সংরক্ষণের আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে উৎসাহিত করেছেন। তাদের শক্তিমত্তা সংহত ও বৃদ্ধি করার এবং যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায় যথাযথ পর্যায়ে তা প্রকাশ করার হুকুম দিয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন, দ্বীনের মধ্যে দুর্বলতা

---

[৫৫৫] তাফসীর ফখরুর রাযী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭, আল মাবসূত সারাখসী খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২।

www.pathagar.com

সৃষ্টিকারী বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর হুকুম অমান্য করলে তারা স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়া খড় কুটোয় পরিণত হবে। তাদের দলের মধ্যে এসে যাবে বিচ্ছিন্নতা, তাদের অন্তর শতধা বিভক্ত হয়ে যাবে এবং কঠিন বিপদ তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে। সৎ কজের যে উচ্চ পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহকে পৌঁছুতে হবে সেটি হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ইমান আনা এবং তার চাহিদা অনুযায়ী আমল করা। ইতোপূর্বে এর আলোচনা করা হয়েছে আর যে অসৎ কাজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তাকে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে কুফরী ও তার অধীনস্ত অসৎ কর্মসমূহ। এগুলো সম্পর্কে এ অধ্যায়েই আমরা আলোচনা করবো।

জিহাদের অর্থ

জিহাদ শব্দের শাব্দিক আসল অর্থ হলো : কষ্ট, কাঠিন্য, কঠোর প্রচেষ্টা। বলা হয় আমি কঠোর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়েছি, আমি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। শরিয়াহর দৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে : আল্লাহ্ তায়ালার কালেমা বুলন্দ করার জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধে কঠোর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো। দ্বীনী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া এবং তারপর তার উপর আমল করার জন্য আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো অর্থেও জিহাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়। সুসজ্জিত কামনা-বাসনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তির মোকাবিলা করার জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করাকেও জিহাদ বলা হয়।

ফাসেকদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে, তারপর কণ্ঠ ও লেখনীর সাহায্যে এবং সবশেষে অন্তর দিয়ে যুদ্ধ করা অর্থেও এর ব্যবহার হয়। নবি সা.-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পরে শক্তি প্রয়োগ ও অর্থ ব্যয় করে এবং কণ্ঠ ও অন্তরের সাহায্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জিহাদ এ ব্যাপারে আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন[৫৫৬]।

মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের মধ্যে পাঠিয়েছেন প্রথমত তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেবার জন্য। যারা তাঁর উপর মিথ্যারোপ করে তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

> মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান করো বুদ্ধিমত্তা ও সদুপদেশের সাহায্যে এবং তাদের সাথে বিতর্ক আলোচনা করো সদ্ভাবে[৫৫৭]।

---

[৫৫৬] মুআত্তার উপর যারকানীর শারাহ খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২।

[৫৫৭] সুরা আন নাহল- ১২৫ আয়াত।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলো[৫৫৮]।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে আল্লাহ তায়ালা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করবেন। রসুল তাঁর রিসালাত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং যারা কুফরী, পাপাচার, মিথ্যাচার ও গোমরাহীতে লিপ্ত থাকতে চায় তারা দৃঢ়ভাবেই তাতে লিপ্ত থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুল সা.-এর প্রতি এবং যারা তাঁর প্রতি ইমান এনেছে তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করে তাঁর রসুলকে ও তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো যদিও তোমাদের কাছে তা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ করো সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ করো সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর[৫৫৯]।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ

তারপর নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো, তাদেরকে বন্দী করো, অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকো। তবে যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও[৫৬০]।

---

[৫৫৮] সুরা আরাফ- ১৯৯ আয়াত।

[৫৫৯] সুরা আল বাকারাহ- ২১৬ আয়াত।

[৫৬০] সুরা আত তওবা, আয়াত ৫ ।

www.pathagar.com

এই সমস্ত হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে নবি সা. মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা তাঁর রিসালাত চ্যালেঞ্জ এবং তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। আবার আল্লাহ তায়ালার হুকুমে তাদের একটি দলের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শান্তিচুক্তি করে তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাদের চুক্তি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করার হুকুম দিয়ে বলেন :

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

> এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা.-এর পক্ষ থেকে সেই সমস্ত মুশরিকদের সাথে যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে[৫৬১]।

জিহাদ ফরজে কিফায়া

মুলত জিহাদ ফরজ হয় কিফায়া হিসেবে[৫৬২]। ফরযে কিফায়ার অর্থ হচ্ছে : সমগ্র লোকের একটি অংশ যদি এটি প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে বাকী লোকেরা এর দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। কখনো ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থায় যেমন মুসলিম রাজ্যের উপর শত্রুর আক্রমণের ফলে ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যায়। অথবা ইমাম যদি জিহাদের আহ্বান করে কোন ব্যক্তির জন্য তাহলে সবার উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যায়। অন্যথায় তা ফরযে কিফায়ার পর্যায়ে থাকে। এর কারণ, জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুফরীর প্রতাপ ও ক্ষমতা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা এবং মুসলিম দেশের নিরাপত্তা বিধান করা। আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর নিজের সত্তার জন্য মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করেননি। বরং ফরয করেছেন কুফরীকে পদানত এবং মুসলমানদের দ্বীনকে ফিতনামুক্ত করার উদ্দেশ্যে। আর ফিতনা হচ্ছে হত্যার চাইতেও ভয়াবহ।

মুসলমানদের একটি দলের সক্রিয়তার কারণে যখন জিহাদের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হলো তখন অবশিষ্টরা গুনাহমুক্ত হয়ে গেলো। যদিও বিনা ওজরে যে ব্যক্তি বসেছিল সে আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদেরত মুজাহিদের সমান হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

---

[৫৬১] সুরা আত তাওবা, আয়াত ১ ।

[৫৬২] আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২, আল উম্ম খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৫, আল মাবসূত খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩, বিদায়াতুল মুজতাহিদ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯১ এবং ফতহুল কাদীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭৮।

www.pathagar.com

لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً

মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন[৫৬৩]।

ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদকারী আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা পুরস্কার লাভ করবে। অর্থের সাহায্যে বিভিন্নভাবে জিহাদ করা যায়। এটি প্রাচীন বা আধুনিক যুগের কোন প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়। কারণ অর্থসম্পদ ছাড়া বস্তুগত ক্ষমতা অর্জন সম্ভব নয়। আজকের যুগে অর্থ নিয়োগ করে আদর্শ ও মৌলিক চিন্তাধারার প্রচার এবং এজন্য বইপত্র ছাপানো, বক্তৃতা-সভা-সেমিনারের আয়োজন করার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আর প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমাদের সামনে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার দুশমন, আমাদের দেশ ও জাতির দুশমন এবং মানবতার দুশমন ইয়াহুদী, কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক গোষ্ঠী। এখানে জিহাদের ফরযে কিফায়া হবার আর একটি কারণ রয়েছে। সেটি হচ্ছে, জিহাদ যদি সব সময় ও সবার উপর ফরয করা হতো তাহলে প্রত্যেককে বারবার জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে ক্ষতির পসরা বেড়ে যেতো। কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মুমিনদের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিশ্চিত করা। আর সবাই যখন জিহাদে মশগুল হয়ে পড়বে তখন তাদের দুনিয়ার কল্যাণ ও উন্নয়নে সময় ক্ষেপন করার সুযোগ তারা পাবে না। তাই তাদের কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে যাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় এ জন্য জিহাদের ফরযকে কিফায়ার পর্যায়ে রাখা হয়েছে।

এর ফলে কখনো দুশমনদের মুসলিম দেশের উপর ব্যাপক আক্রমণের সময় সবার উপর জিহাদ ফরয হবার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয় না। তখন যে কোন অবস্থায়ই সকল মুসলমানের দেশের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হওয়া ফরয হয়ে যায়। মুসলিম আলেম সমাজ এই অভিমতই পোষণ করেছেন।

---

[৫৬৩] সুরা আন নিসা- ৯৫ আয়াত।

www.pathagar.com

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব হবার কারণ : কুফরী অথবা যুদ্ধবাজিতা

এক. আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দিয়েছেন। আর হুকুম পালন করা ওয়াজিব। হাতে গোনা কয়েকটি অবস্থা ছাড়া এই ফরয ফরযে কিফায়া হিসেবে স্বীকৃত এবং এই অবস্থাগুলো নির্ধারিত হয়ে গেছে। এই যুদ্ধের হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকবে। যখনই এর কার্যকারণ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে তখনই এর হুকুম কার্যকর হবে। জিহাদের আইনগত উদ্দেশ্যই হচ্ছে দ্বীনের হেফাযত করা, রব্বুল আলামীনের কালেমা বুলন্দ করে সমগ্র মানব সামাজের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া, মুসলমানদের থেকে ফিতনাকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং নারী, পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে থেকে দুর্বল ও মজলুমদের সাহায্য করা।

দুই. ইতোপূর্বে আলোচিত ঐকমত্যের পর আলেমগণ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ওয়াজিব হওয়ার উত্তেজক কারণের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষেণ করেছেন। তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব কি তাদের কুফরীর কারণে অথবা এর মূলে আছে তাদের যুদ্ধবাজ নীতি[৫৬৪]?

অধিকাংশ ফকীহ এ মত পোষণ করেছেন যে, এর কারণ তাদের যুদ্ধবাজ নীতি। এদের মধ্যে রয়েছে ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু হানীফা।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের কোন কোন সাথী নিছক কুফরীকেই কারণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন[৫৬৫]।

কুরআনে যুদ্ধ সম্পর্কিত যে সমস্ত আয়াত উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোকেই তাঁরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন এবং সেগুলোর ভিত্তিতেই তাদের বিভিন্ন অভিমত গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ নিছক যুদ্ধকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন আবার কেউ কেউ যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করার যে লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার সাথে যুদ্ধকে শর্তাধীন করেছেন।

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অধিকাংশ ফকীহর প্রমাণ সংগ্রহ

কুরআনের আয়াত থেকে তাঁরা এভাবে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন :

---

৫৬৪ ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল কিতাল পৃষ্ঠা ১১৭।

৫৬৫ ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল কিতাল পৃষ্ঠা ১১৭।

www.pathagar.com

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার পথে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না[৫৬৬]।

এখান থেকে প্রমাণ এভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর মধ্যে একটি ঝুলন্ত হুকুম রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে : তারা মুসলমানদের হত্যা করছে। এটি যুদ্ধের হুকুম দেয়ার কারণ। কাজেই এখানে তাদের মুসলমানদের হত্যা করাটাই কারণে পরিণত হয়েছে। তারপর তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে। মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা না করা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। তাদের এই সীমা লঙ্ঘন সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

কাজেই যে কেউ সীমা লঙ্ঘন (আক্রমণ) করবে তোমরাও অনুরূপ তার উপর সীমা লঙ্ঘন (আক্রমণ) করবে[৫৬৭]।

এভাবে বাড়াবাড়িকে বৈধতা দেয়া হয়নি।

আল্লাহ তায়ালার আর একটি বাণী থেকেও প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়[৫৬৮]।

মুসলমানকে তার দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় নিক্ষেপ করাই হচ্ছে ফিতনা। যেমন মুসলমানরা ইসলাম গ্রহণের কারণে মুশরিকরা তাদেরকে ফিতনায় নিক্ষেপ করছিল। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

আর ফিতনা হত্যার চাইতেও মারাত্মক[৫৬৯]।

---

[৫৬৬] সুরা আল বাকারাহ ১৯০ আয়াত।

[৫৬৭] সুরা আল বাকারাহ- ১৯৪ আয়াত।

[৫৬৮] সুরা আল বাকারাহ- ১৯৩ আয়াত।

www.pathagar.com

আর মুসলমানদের যখন কোন শাসক থাকে এবং মুশরিকরা তাদের ওপর এ ধরনের সীমা লঙ্ঘণ জনিত আক্রমণ করে থাকে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। মুসলমানরা ফিতনামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এখানে বলা হয়নি যে, তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। বরং ততক্ষণ আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ফিতনা না থাকে এবং সমগ্র দ্বীন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য না হয়ে যায়। অর্থাৎ যাতে আল্লাহ তায়ালার কালেমা বুলন্দ হয়ে যায় এবং এ উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হবে যখন তারা জিযিয়া আদায় করবে স্বহস্তে বিনত হয়ে[৫৭০]।

তাঁরা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী থেকেও প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন :

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

> তোমাদের কী হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করছো না আল্লাহ তায়ালার পথে এবং নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ– যার অধিবাসী জালেম, তা থেকে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও[৫৭১]।

এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, যুদ্ধের হুকুম দেয়ার কারণ হচ্ছে কাফেরদের অন্যের উপর জুলুম করা। অবশ্য কুফরী এমনিতেই ব্যক্তি সত্তার ভিত্তিতে নিজের জন্যই জুলুম, অন্যের জন্য না হলেও। আর অন্যের জন্য যখন জুলুম হয় তখন তা বিপর্যয়ে পরিণত হয়, যা তাদের সবার দিকে বিস্তৃত হয়। এর ফলে তারা সত্য দ্বীনের আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এই সত্য দ্বীন তাদের জুলুম ও জুলুমতন্ত্র থেকে বের করে আনে আদল, ইনসাফ ও আলোর দিকে। আর তারা আরো বঞ্চিত হয় তাদের পার্থিব অধিকার থেকে। এই দুই ধরনের জুলুম তাদের বিনাশের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব করে দেয়। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

> যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে[৫৭২]।

---

[৫৬৯] সুরা আল বাকারাহ- ১৯১ আয়াত।

[৫৭০] ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল কিতাল।

[৫৭১] সুরা নিসা- ৭৫ আয়াত।

[৫৭২] সুরা আল হাজ্জ, ৩৯ আয়াত।

www.pathagar.com

অন্য দিকে যে কুফরী তার বিপর্যয় অন্যের মধ্যে ছড়ানোর ক্ষমতা রাখে না সে অন্যকে হত্যার কারণ হয় না। কাজেই মুরতাদ হওয়া ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় এই ধরনের কাফেরকে হত্যা করা যাবে না।

কাজেই কারণ হচ্ছে তাদের যুদ্ধবাজী, দুর্বলদের প্রতি জুলুম ও মুসলমানদের ওপর আক্রমণ। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীনের কালেমা বুলন্দ করা, দুর্বলদের সাহায্য করা এবং তাদের প্রতারণা, চালবাজিতা, অনিষ্টকারিতা ও অপকার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করা[৫৭৩]।

আর সুন্নাত সম্পর্কে বলা যায়, অসংখ্য হাদিসে অন্ধ, পাগল, নারী, শিশু, যোগী-সন্যাসী, বৃদ্ধ-জ্ঞানতাপস ও কৃষকদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

রসুল সা. বলেন : বৃদ্ধ, ছোট শিশু ও নারীকে হত্যা করো না এবং বাড়াবাড়ি করো না[৫৭৪]।

তিনি আরো বলেন : তোমরা শীঘ্রই এমন এক জাতি দেখবে যারা মনে করবে, তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তায়ালার জন্যই আটকে রেখেছে (অর্থাৎ সংসার ত্যাগী করেছে) তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং নিজেদেরকে যার জন্য তারা আটকে রেখেছে তাকেও।

তিনি আরো বলেন : তোমরা নারীদের, শিশুদের এবং থুর থুরে বুড়োদেরকে হত্যা করো না[৫৭৫]।

এ দু'টি হাদিস ছাড়া যুদ্ধে শামিল হয়নি এমন সব লোকদের হত্যা না করার নির্দেশ দিয়ে বিভিন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে সাহাবাগণের বর্ণনাও প্রনিধানযোগ্য। বর্ণিত আছে, আবু বকর রা. যখন সিরিয়ার দিকে সেনা বাহিনী পাঠাচ্ছিলেন তিনি নিজে হাঁটতে থাকেন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ানের সাথে। তিনি ইয়াযিদকে বললেন : তুমি শীঘ্রই এক জাতিকে দেখবে তারা মাথার মাঝখান থেকে মুণ্ডন করে। তাদের মাথায় তলোয়ার মারো। আর তুমি এমন এক জাতিকে পাবে যারা মনে করবে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তায়ালার জন্য আটকে রেখেছে। তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং যার জন্য তারা নিজেদেরকে আটকে রেখেছে বলে মনে করে তাকেও। তারপর তাকে বললেন,

---

[৫৭৩] তাফসির আল ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬১, ২৮৩।

[৫৭৪] আবূ দাউদ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বিদায়াতুল মুজতাহিদেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

[৫৭৫] নাইলুল আওতার খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৬০।

www.pathagar.com

আমি তোমাকে দশটি বিষয়ে অসিয়ত করছি : হত্যা করো না নারীকে, শিশুকে, থুরথুরে বুড়োকে। ফলবান বৃক্ষ কেটো না। কোন জনবসতি বিরান করো না। খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া কোন ছাগী ও হত্যা করো না। খেজুর গাছ পুড়িয়ে দিয়ো না বা কেটো না। গনীমাতের সম্পদ চুরি করো না এবং ভীরুতা প্রদর্শন করো না[৫৭৬]।

এ হাদিস ও সাহাবাগণের আমল এ কথা প্রমাণ করে যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ যোগী-সন্যাসী ইত্যাদি যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়। আর এ থেকে জামহুর অর্থাৎ ফকীহদের বৃহত্তর অংশ এ প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ তাদের কুফরী নয়। যদি কুফরীই প্রভাবশালী কারণ হতো তাহেলে উপরোক্ত নারী, শিশু ইত্যাদিকে হত্যা করা বৈধ হতো। কিন্তু তাদের হত্যা করা জায়েয নয়। কাজেই প্রমাণিত হলো, কুফরী ছাড়া অন্য কিছু এর কারণ। আর প্রকৃত কুফরীর ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ফারাক নেই। কাজেই কুফরী যদি কারণ হতো তাহলে নারীকেও হত্যা করা হতো। যেমন মুরতাদ, কিসাস ও বিবাহিতা নারীর যিনার ক্ষেত্রে করা হয়। কোন মেয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করার সমর্থনও এ থেকে পাওয়া যায়।

ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য এ ব্যাপারে ভিন্ন। তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও ইবনে রুশদ। তাঁদের মতে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ হচ্ছে তাদের কুফরী। ইবনে রুশদ যদিও তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে স্পষ্ট যুক্তি দেননি তবে তিনি ইমাম শাফেয়ীর কিছু হাদিস থেকে যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তার ফলাফলের উপর নির্ভর করেছেন। ইবনে রুশদ বলেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব হবার কারণ হচ্ছে তাদের কুফরী। কাজেই সমস্ত কাফেরদের থেকে এ কারণটি দূর করাও ওয়াজিব[৫৭৭]।

কিন্তু আমরা যদি ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো, তিনি আহলে কিতাব ও আমাদের মধ্যে ফারাক করেছেন : তিনি আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্য স্থির করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করো অথবা জিযিয়া দাও নত মস্তকে। আর তাদের বাইরে মূর্তি পূজারীদের ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে : ইসলাম গ্রহণ করো, এছাড়া দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে তিনি কারণের কথা সুস্পষ্ট করে বলেননি।

---

[৫৭৬] আল মুআত্তা, যুরকানীর শারাহ সহকারে, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০।

[৫৭৭] ইবনে তাইমিয়্যা, রিসালাতুল কিতাল, পৃষ্ঠা ১১৬, বিদায়াতুল মুজতাহিদ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৫।

www.pathagar.com

তিনি তাঁর কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা মূর্তি পূজরীদের ও আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত মূর্তি পূজারীদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়েছেন। অন্য দিকে আহলে কিতাবদের ব্যাপারে বলা হয় তারা জিযিয়া দেবে নয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে এবং এদু'টি কোন একটি না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করেছেন।

আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নবি সা.-এর হুকুম থেকে তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। নবি সা. থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে : তিনি যখনই কোন সেনাদল পাঠাতেন একজনকে তার আমীর বানাতেন এবং তাকে বলতেন : যখন মুশরিকদের মধ্যে থেকে তোমরা শত্রুদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবে। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তা মেনে নাও এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, যদি তারা হিজরত করে মুসলমানদের জনবসতিতে চলে আসে তাহলে তারা সেই সমস্ত অধিকার ভোগ করবে যা মুহাজিররা করছে। আর যদি তারা হিজরত না করে গ্রামীণ মুসলমানদের মতো নিজেদের এলাকায় বসবাস করতে চায় তাহলে তাদেরকে গ্রামীণ মুসলমানদের মতো মনে করা হবে এবং গ্রামীণ মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে হুকুম জারী করেছেন তা তাদের উপরও জারী হবে। এ অবস্থায় তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদের অংশ পাবে না। তবে যদি তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশ নেয় তাহলে গনীমতের মালের অংশ পাবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণের আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে তাদেরকে জিযিয়া আদায় করার আহ্বান জানাও। যদি তারা এ আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে তা মেনে নাও এবং তাদেরকে ছেড়ে দাও। আর যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।... অতঃপর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এটা বিশেষ করে আহলে কিতাবদের জন্য, মূর্তি পূজারীদের জন্য নয়। এটা বলতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করা বা জিযিয়া দেবার কথা বুঝিয়েছেন[৫৭৮]।

তারপর তিনি বলেছেন, হাদিসটি আবু হুরায়রার রা. হাদিসের বিরোধী নয়। আবু হুরায়রা নবি সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো[৫৭৯]।

কিন্তু এখানে মূর্তি পূজারীদের কথা বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা যাদের থেকে জিযিয়া নেয়ার হুকুম দিয়েছেন তারা হচ্ছে আহলে কিতাব। এ থেকে দু'টি যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে একথা প্রমাণ হয়।

---

[৫৭৮] আহমদ ও ইবনে মাজাহ।

[৫৭৯] বুখারি ও মুসলিম।

www.pathagar.com

এটা দ্বীন আল্লাহ তায়ালার জন্যে নির্ধারিত না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি মুশরিকদের সাথে লড়াই করার এবং যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই তাদেরকে হত্যা করার যে হুকুম দিয়েছেন, যে পর্যন্ত না তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, তার বিরোধী নয়। এটা আহলে কিতাবরা জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে হুকুম দিয়েছেন তারও বিরোধী নয়।

এটা কুরআনের কোনো আয়াতকে এবং উপরে উল্লেখিত হাদিস দুটির কোনোটিকে রহিত করছে না। আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন এবং তাঁর রসুল সা. যার প্রচলন করেছেন তাদের কোনোটি এর রহিতকারী ও বিরোধী নয়[৫৮০]।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. তাঁর কিতাবুল উম্ম নামক গ্রন্থে এসব কথা বলেছেন। তিনি আহলে কিতাব ও মূর্তি পূজারীদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধের লক্ষ্য তিনি স্থির করেছেন তাদের ইসলাম গ্রহণ করা অথবা বিনত হয়ে জিযিয়া দেয়া। আহলে কিতাবরা ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে ইসলাম গ্রহণ ছাড়া দ্বিতীয় কোন লক্ষ্যই তিনি স্থির করেননি। তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ কুফরী না অন্য কিছু তাও সুস্পষ্ট করেননি।

আমার মতে, প্রকৃত বিরোধ এটা নয় যে, যুদ্ধের কারণ কুফরী কি না বরং বিরোধ হচ্ছে এ বিষয়টি নিয়ে যে, জিযিয়া দেয়া ইসলাম গ্রহণের বিকল্প হতে পারে কিনা[৫৮১]।

যাদের জিযিয়া গ্রহণ না করার কথা বলা হয়েছে, এর প্রবক্তাদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ীও আছেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করার কারণ যে কুফরী একথা কিন্তু বলা হচ্ছে না, বরং এক্ষেত্রে জমহুর তথা ফকীহদের বৃহত্তর অংশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা হচ্ছে। এখানে জমহুর যে কারণ দর্শিয়েছেন সেটিই কারণ হিসেবে গৃহীত হয়েছে তারপর কুরআনের বহু আয়াতে কুফরীর কারণ দর্শানো ছাড়াই যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

কাফেরদের সাথে যুদ্ধের উদ্যোক্তা ও যুদ্ধকারী

পাঁচটি কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক. শত্রুর সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া। দুই. শৌর্য-বীর্য-বীরত্ব প্রদর্শন। তিন. লোক দেখানো শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী করা। চার. নিজের বংশ গৌরব ও মর্যাদা প্রমাণ করা। পাঁচ. ক্রোধের বশবর্তী হওয়া। এদের

---

[৫৮০] আল উম্মম খণ্ড ৪. পৃষ্ঠা ৯৪–৯৫।

[৫৮১] নাইলুল আওত্তার খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬০।

www.pathagar.com

প্রত্যেকটির প্রশংসার ও নিন্দার উভয় দিকই আছে। ইসলামে যুদ্ধের উদ্যোক্তাগুলোর মধ্য থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনটির ভিত্তিতে একজন মুজাহিদ তার প্রতিদান পাবে?

আবু মুসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সা.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শন করার জন্য যুদ্ধ করলো, নিজের বংশ গৌরব ও মর্যাদা প্রদর্শন করার জন্য যুদ্ধ করলো এবং লোকদেরকে দেখানোর ও মর্যাদা প্রদর্শন করার জন্য যুদ্ধ করলো। এগুলোর কোনটি আল্লাহ তায়ালার পথে হলো?

জবাব দিলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কালেমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, সেই আল্লাহ তায়ালার পথে যুদ্ধ করে[৫৮২]।

আল্লাহ তায়ালার কালেমা অর্থ হলো, মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া। এর এ অর্থ হবার সম্ভাবনা আছে যে, যে ব্যক্তির যুদ্ধের কারণ কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার কালেমা বুলন্দ করা একমাত্র তার যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ আল্লাহ তায়ালার পথে হবে না। অর্থাৎ যদি উপরোক্ত কারণগুলোর মধ্য থেকে কোন কারণ এতে বাধার সৃষ্টি করে তাহলে এ যুদ্ধ আল্লাহ তায়ালার পথে হবে না। ইমাম তাবারী বিষয়টি এভাবে স্পষ্ট করে বলেছেন : যদি এটা আসল ও উদ্দেশ্য হিসেবে নয় বরং তার আওতাধীনে বাড়তি হিসেবে অর্জিত হয় তাহলে বাধার সৃষ্টি করবে না। জমহুর তথা ফকীহগণের বৃহত্তম অংশও একথাই বলেছেন। আল ফাতাহ গ্রন্থে এভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে[৫৮৩]। নবি সা. বলেছেন : কোন কাজ আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ভেজালভাবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে না করলে আল্লাহ তায়ালা তা গ্রহণ করবেন না[৫৮৪]।

ইবনে আবু জামরাহ বলেন: মুহাককিক তথা গভীর অনুসন্ধানী ফকীহগণ এ অভিমত পোষণ করেন যে, প্রথম উদ্যোক্তা যখন আল্লাহ তায়ালার কালেমা বুলন্দ করার সংকল্প করে তখন তার সাথে সম্পর্কিত অন্যকিছু তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না[৫৮৫]। আগেই বলা হয়েছে[৫৮৬] দায়িত্বশীলের সংকল্প যদি শরিয়াহ প্রণেতার

---

[৫৮২] মুহাদ্দিসদের একটি দল এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং নাইলুল আওতারেও খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২২৬ বর্ণিত হয়েছে।

[৫৮৩] নাইলুল আওতার খণ্ড ৭, ২২৭ পৃষ্ঠা।

[৫৮৪] আহমদ, ও নাসাঈ এবং নাইলুল আওতার খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২২৭।

[৫৮৫] নাইলুল আওতার খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২২৭।

[৫৮৬] মূল কিতাবের ৬৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

www.pathagar.com

সংকল্পের অনুগামী হয় অথবা আওতাধীনে অর্জিত হয় তাহলে তা কর্মের সুস্থতাকে প্রভাবিত করেনা, বিশেষ করে যখন তা আসল উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী করে। দ্বীনের কল্যাণের হেফাযতের উদ্দেশ্যেই জিহাদ ফরয হয়েছে। এটি ফরযে কিফায়া। কাফেরদের সাথে যুদ্ধের কারণ হচ্ছে, তাদের যুদ্ধবাজিতা, জুলুম ও সীমালঙ্ঘন। আর আল্লাহ তায়ালার পথে যুদ্ধের উদ্যোক্তা হচ্ছে, নিসন্দেহে কুফরীকে বিতাড়ন, তার শান-শওকত পরাক্রম চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং ইসলামের ও তার দাওয়াতের বিস্তারের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কালেমাকে বুলন্দ করা। এভাবেই এক ব্যক্তি পুরস্কার লাভের অধিকারী হতে পারে।

কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার আগে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা ওয়াজিব। এ দাওয়াত গ্রহণ না করলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানের এবং ইসলামি রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হবার আহ্বান জানাতে হবে। এসব প্রত্যাখ্যাত হলে ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিস ও সাহাবাগণের বক্তব্যে বিধৃত নিয়ম ও সুবিধা প্রদানের ভিত্তিতে তাদের যুদ্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

এটিই হচ্ছে জিহাদ। ঋণাত্মক দিক দিয়ে দ্বীনের হেফাজতের ক্ষেত্রে একে গুরুত্বপূর্ণ উপায় মনে করা হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে অন্যায় ও অসৎকে নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ তা নির্মূল করে বৃহত্তম অন্যায় ও বিপর্যয়কে। এবং সেটি হচ্ছে কুফরী ও তার প্রভাব-প্রতিপত্তি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : মুরতাদ ও যিনদীকদের হত্যার শরিয়াহী বিধান

ইরতিদাদ ও মুরতাদ হওয়া : এ বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে যেখান থেকে আসা আবার সেখানেই ফিরে যাওয়া। মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি কুফরীর সাথে সংশ্লিষ্ট। কুরআন কারীমে আল্লাহ তায়ালা ইরতিদাদ সম্পর্কে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ,,...

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তার দ্বীন থেকে ফিরে যায়...[৫৮৭]।

অন্যত্র বলেছেন:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ,, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ...

---

[৫৮৭] আল সুরা মায়েদা- ৫৪

www.pathagar.com

আর তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি তার দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফের হিসেবে মারা যায়...[৫৮৮]।

সে ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে ফিরে যায়। এ ছাড়া অন্য অর্থে আল্লাহ তায়ালা একে ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً

তারা দু'জন নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললো[৫৮৯]।

অর্থাৎ মুসা আ. ও তাঁর যুবক সাথী।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ...

এবং তোমরা পশ্চাদপসরণ করো না।[৫৯০]

অর্থাৎ কোন বিষয়ে যখন নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং তার কল্যাণ বুঝতে পারবে তখন আর তা ছেড়ে দিয়ে পেছন দিকে ফিরে যেয়ো না[৫৯১]।

মুসলমানের কাফের হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে ইরতিদাদ। সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে একজন মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। যেমন সে কুফরী, শির্ক বা নাস্তিকতাপূর্ণ বক্তব্য পেশ করে। যেমন দ্বীন যে বিষয়গুলোকে অপরিহার্য বলেছে সেগুলো সে অস্বীকার করে। যেমন সালাত ও যাকাত ওয়াজিব হওয়া এবং যিনা এবং না হক কাউকে হত্যা করা হারাম হওয়া। অথবা এমন কাজ করা যা সুস্পষ্টভাবে কুফরীকে অপরিহার্য করে তোলে। যেমন কুরআন বা তার কিছু অংশ ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ময়লা আবর্জনার মধ্যে। এই ধরনের যে কোন কাজই, যা আল্লাহ তায়ালার কালাম ও তাঁর শরিয়াহকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে করা হয়, এর অন্তর্ভুক্ত হবে[৫৯২]।

---

[৫৮৮] সুরা আল বাকারাহ- ২১৭ আয়াত।

[৫৮৯] সুরা আল কাহাফ- ৬৪ আয়াত।

[৫৯০] সুরা আল মায়েদাহ- ২১ আয়াত।

[৫৯১] নাইলুল আওতার- খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০১।

[৫৯২] আশশারহুল কবীর, দারদীরী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০১ এবং দাআয়েমুল ইসলাম খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৭।

www.pathagar.com

মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সময় থেকে নিয়ে তিন দিন পর্যন্ত মুরতাদকে তওবা করার আহ্বান জানানো হবে। এ সময় তাকে ক্ষুৎপিপাসার বা অন্য কোন কষ্ট দেয়া হবে না। তওবা করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। অন্যথায় তরবারির আঘাতে হত্যা করা হবে। জমহুরের মতে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হানাফীয়াদের মতে, নারীকে হত্যা করা হবে না, বরং কারারুদ্ধ করে রাখা হবে। হানাফীয়াদের এ অভিমতও বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্বাধীন বা দাসী যে কোন নারীই হোক না কেন তাকে মারধর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে হবে[৫৯৩]।

হানাফীয়াগণ এক্ষেত্রে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন যুদ্ধে আসল কাফের নারীদেরকে হত্যা না করার সাধারণ নির্দেশ নামা থেকে। কারণ এক্ষেত্রে আসল হচ্ছে, তাদের আখেরাতের জীবনের প্রাপ্তিকে বিলম্বিত করা। তারা যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। পুরুষদের মোকাবিলায় তাদের মধ্যে মোকাবিলা করার ক্ষমতা নেই বলে তাদের এ দিকটাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই মুরতাদ নারীরা হয়েছে আসল কাফের নারীদের পর্যায়ভুক্ত। আর কাফের নারীদেরকে ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত কারারুদ্ধ করে রাখা হয়, কাজেই মুরতাদ নারীদের বিধানও তাই[৫৯৪]।

আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কোন নারী মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে ততক্ষণ কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে যতক্ষণ না সে ইসলা'ম গ্রহণ বা মৃত্যুবরণ করে। তবে তাকে হত্যা করা যাবে না। যদি সে দাসী হয় এবং তার মালিক তার খেদমত লাভের মুখাপেক্ষী হয় তাহলে তার খেদমত লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে তার সাথে অত্যাধিক কড়াকড়ি করবে। তাকে পরার জন্য মোটা ও খসখসে কাপড় দেবে। যতটুকু পরিমাণ কাপড়ে সতর ঢাকা যায় এবং গরম ও ঠাণ্ডা থেকে সে আত্মরক্ষা করতে পারে কেবল ততটুকু কাপড়ই তাকে দেবে। কেবলমাত্র পেটের জ্বালা মেটাবার মতো নিম্নশ্রেণির খাদ্য তাকে দান করবে। আর দাসের ব্যাপারটি স্বাধীন পুরুষের মতো[৫৯৫]।

হানাফীয়াগণ ইরতিদাদের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন উপরোক্ত নসটি থেকে তার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়।

আলী রা. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করার পর যারা মুরতাদ হতো তাদেরকে তিনি তওবা করাবার হুকুম দিতেন। তিনি বলতেন, যারা দ্বীন

---

[৫৯৩] ফাতহুল কাদীর ও হেদায়া পৃষ্ঠা ২৮৬, এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫২ ।

[৫৯৪] শিফাউল গালীল পৃষ্ঠা ১৪১ ।

[৫৯৫] দাআয়েমুল ইসলাম খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৮।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ করে আবার তা থেকে ফিরে গেছে কেবল তাদেরকেই তওবা করানো হবে। কিন্তু যারা মুসলমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে অর্থাৎ জন্মগতভাবে মুসলমান তারা ইসলাম ত্যাগ করলে তাদেরকে আমরা অবশ্যই হত্যা করবো। তওবা করাবো না। আর তিনি যিন্দীক তথা নাস্তিকদের তওবা করাতেন[৫৯৬]।

জমহুর আলিম নবি সা.-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেছেন : من بدل دينه فاقتلوه যারা দ্বীন পরিবর্তন করে তাদেরকে হত্যা করো[৫৯৭]।

তাঁরা মু'আয ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটি থেকেও প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। নবি সা. মু'আযকে যখন ইয়ামানে গভর্ণর বানিয়ে পাঠান তখন বলেন : কোন ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবে। যদি সে ইসলামের দিকে ফিরে আসে তাহলে ভাল, অন্যথায় তাকে হত্যা করো। আর কোন নারী ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দাও। যদি সে ফিরে আসে তাহলে ভাল, অন্যথায় তাকে হত্যা করো[৫৯৮]।

এ হাদিস দু'টি সুস্পষ্ট। বিতর্কের ক্ষেত্রে এ দু'টি দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ। কাজেই এর উপর আমল করা ওয়াজিব। মুরতাদ হয়ে যাবার কারণে পুরুষ ও নারীকে হত্যা করার ব্যাপারে এখানে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

তারা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল কারী বর্ণিত একটি আছর (সাহাবীর বর্ণনা) থেকেও প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন : উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে এক ব্যক্তি এলো। সেখানে আবু মূসা আশআরীও ছিলেন। উমর তাকে জনগণের সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। সে তাঁকে জানালো। তারপর উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাগরিবের (অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম আফ্রিকান রাজ্য) কোন খবর আছে? সে বললো, হাঁ আছে। এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার কাফের হয়েছে। উমর বললেন, তার ব্যাপারে তোমরা কি পদক্ষেপ নিয়েছে? লোকটি বললো, আমরা তার কাছে গিয়েছি এবং তার শিরচ্ছেদ করেছি। উমর বললেন : তোমরা কি তাকে তিনদিন কারারুদ্ধ করোনি? প্রতিদিন তাকে একটুকরা করে রুটি দাওনি? তাকে তওবা করতে উদ্বুদ্ধ করোনি? যাতে সে ইসলামের দিকে এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুমের আওতায়

---

[৫৯৬] দাআয়েমুল ইসলাম খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৮।

[৫৯৭] মুসলিম ছাড়া সিহাহ সিত্তার বাকি পাঁচটি গ্রন্থ ও নাইলুল আওতার বর্ণনা করেছে খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০১

[৫৯৮] নাইলুল আওতার এবং হাফেয বলেন এর সনদ হাসান, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০৪।

www.pathagar.com

ফিরে আসতে পারতো? তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা! আমি সেখানে হাজির ছিলাম না এবং এ খবর আমার কাছে পৌছুবার পর আমি এতে সন্তুষ্ট হইনি[৫৯৯]।

জমহুর ফকীহগণ এরই ভিত্তিতে প্রমাণ পেশ করেছেন। তাঁরা তওবার আহ্বান জানাবার পর তা প্রত্যাখ্যাত হলে মুরতাদকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন। এবং মুরতাদ নারীকেও মুরতাদ পুরুষের ন্যায় হত্যা করার ঘোষণা শুনিয়েছেন। জমহুরের মতে এ হাদিসটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অন্যদিকে হানাফীগণ একে পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন এবং কাফের নারীকে হত্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদিস থেকে মুরতাদ নারীকে হত্যা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জমহুর ফকীহগণ নারী হত্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞাকে আসল কাফের নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. মুরতাদ নারীকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : আবু বকর সিদ্দীকের রা. খিলাফত আমলে একটি মেয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। তিনি তাকে হত্যা করার হুকুম দেন। তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবী বেঁচে ছিলেন। তাদের একজনও এর প্রতিবাদ করেননি। এটি একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। ফলে জমহুর ফকীহগণ এরই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মুরতাদ হবার কারণে পুরুষ ও নারীকে হত্যা করার মধ্যে পার্থক্য না করার ভিত্তিতে জমহুর ফকীহগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেটিই বেশি গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী বলে মনে হয়। কারণ মুরতাদকে হত্যা করার পেছনে তার মধ্যে ইরতিদাদ ছাড়া আর কোন প্রকাশ্য ও সুসংহত দোষ আমরা দেখি না। আর এ দোষটি পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই থাকে। কারণ মুরতাদ হওয়া একটি একক দোষণীয় ঘটনা। এদিক দিয়ে হানাফীয়াদের মুরতাদ নারীকে আসল কাফের নারীর উপর কিয়াস করাটাই যথার্থ নয়। কারণ তাঁরা বলেন, আসল কাফেরের হত্যার পেছনে কারণ হচ্ছে তার যুদ্ধবাজিতা।

অন্য দিকে মুরতাদকে হত্যার পেছনে আসল কারণ হচ্ছে তার কুফরী। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নেই। নারীত্বের পার্থক্য একেবারেই প্রভাবহীন, যেমন অবশিষ্ট দণ্ডবিধি ও সেই ধরনের আরো বিষয়াদির মধ্যে পার্থক্যটা প্রভাবহীন।

অতঃপর জমহুর ফকীহগণের যুক্তি প্রমাণগুলো শক্তিশালী ও দ্ব্যর্থহীন। আমাদের বক্তব্য আমরা তার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। কারণ মুরতাদদের হত্যার পেছনে

---

[৫৯৯] ইমাম শাফেয়ী এটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং নাইলুল আওতারেও উদ্ধৃত হয়েছে খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০২

www.pathagar.com

তাদের ইরতিদাদ ছাড়া আর কোন কারণ নেই এবং এ বিধানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই।

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। মুরতাদকে হত্যা করা ওয়াজিব হবার কারণ কুফরী কেন? অথচ আসল কুফরীর ক্ষেত্রে এটাকে কারণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। শরিয়াহর উৎস ও উপকরণগুলোর ক্ষেত্রে এর কোন নজির আছে কি? এ ব্যাপারে আমরা মনে করি: ইসলাম গ্রহণ করার পর একজন মুসলমানের কুফরী করা তার ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যে আসল কুফরীর তুলনায় ইসলামি ব্যবস্থার জন্য বেশি বিপদজনক। এটা এ জন্য যে, ইসলামে প্রবেশ করার জন্য তার উপর কোন বল প্রয়োগ করা হয়নি। বরং সে নিজের মানসিক সন্তুষ্টি লাভের পর ইসলামে প্রবেশ করেছিল এবং তার অনুগত হয়েছিল। তারপর আবার নিজের বের হয়ে যাবার ঘোষণাও দিল। এটা তার চিন্তার নৈরাজ্যের প্রকাশ। তার এহেন কার্যক্রমের ফলে এই দ্বীন বা ব্যবস্থার সাথে জড়িত লোকদের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগবে। এ থেকে আল্লাহ তায়ালা প্রদর্শিত এ মহাসত্যে পৌঁছে যাই :

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

> আহলে কিতাবদের একদল বললো, যারা ইমান এনেছে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে দিনের প্রারম্ভে তা বিশ্বাস করো এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান করো; হয়তো তারা ফিরতে পারে[৬০০]।

মুরতাদ হওয়ার ঘটনা কখনো মুসলমানদের সারিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিণত হয়। আবার কখনো তাদের আভ্যন্তরীণ অঙ্গনে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপণ করে। এর মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের জন্য বিরাট বিপর্যয় ও ব্যাপক ক্ষতি। কারণ এর ফলে মুসলিম উম্মাহর জীবনে সংশয়ের বীজ অনুপ্রবেশ করে এবং তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তারা যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসে। মুসলিম বিশ্বের চতুর্দিকে আমরা এখন এই চিন্তার নৈরাজ্য ও নাস্তিক্যবাদের দাপাদাপি দেখছি। মুসলিম দেশগুলোর সীমানার বাইরে থেকে এ প্রকাশ্য কুফরীর আক্রমণ আসছে ইসলামের বিরুদ্ধে। শত্রুদের সহায়তায় রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যে সন্দেহ ও মুসলমানদের সারিতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ কারণে ইসলাম আসল কাফেরের চিন্তার ও আকিদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষায় কঠোর প্রয়াসী

---

[৬০০] সুরা আল ইমরান ৭২ আয়াত।

www.pathagar.com

হলেও মুরতাদকে ইচ্ছামতো ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা দিতে নারাজ।

তারপর মুরতাদের ব্যাপারে বলা যায়, সে ইসলাম গ্রহণ করার আগে তার যুক্তি প্রমাণসমূহ যাচাই বাছাই করে তার কাছে নতি স্বীকার করে নিজেই ইসলামকে নির্বাচন করে নিয়েছিল এবং তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কাজেই এরপর তার ক্ষেত্রে আর কোন ওজর খাটে না। অন্য দিকে আসল বা জন্মগত কাফের, যে ঐ সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের সাথে পরিচিত হতে পারেনি, তার জন্য অবশ্যই ওজর আছে। কারণ সে এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার বা করানোর আশা করে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। তারপরও সে আশা করে যে, তাকে সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

মুরতাদের কুফরী ও আসল কাফেরের কুফরীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে একে বিবাহিত পুরুষের যিনা করা ও অবিবাহিতের যিনা করার মধ্যেকার পার্থক্যের সাথে তুলনা করা যায়। বিবাহিত পুরুষের শাস্তির ব্যাপারে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ সে মানবিক প্রবৃত্তিকে প্রতিপালন করার সহজ সরল পথ লাভ করার পর আবার তা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপর্যয় ও নৈরাজ্যের পথ অবলম্বন করেছে। প্রথম পথের মূল্যের বিনিময়ে এখানে পরবর্তীদের জন্য রয়েছে সংশয়। কাজেই অন্যদেরকে নসিহত ও সংযত করার জন্য তাকে কঠিন শাস্তি দেয়াই উচিত। আর অবিবাহিত পুরুষ যখন এই উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলতে গিয়ে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তখন সে এই গোমরাহীর পথ ছেড়ে সহজ সরল পথ অবলম্বন করে এবং সেটি হচ্ছে বিবাহ। মুরতাদের কুফরী ও অন্যান্য বিষয়ে এটি একটি উৎকৃষ্ট নজির। অবশ্য সঠিক ব্যাপার আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

যিন্দীক : কুফরীকে লুকিয়ে রেখে ইসলামকে প্রকাশ করার নাম যিন্দীকী। ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তওবা না করলে যিন্দীককে হত্যা করতে হবে। তবে তওবা করলে তার তওবা গ্রহণ করা হবে কিনা এ ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সাথে সম্পর্কিত দুটি স্পষ্টতর বর্ণনা এ কথা বলে যে, তাঁদের মতে তা গ্রহণীয় হবে না। ইমাম মালেকের মযহাবও এরই সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ তিনি বলেন, তার কুফরী সম্পর্কে তাকে জানানোর আগেই যদি সে তওবা না করে তাহলে তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, তার তওবা গ্রহণ করা হবে। এ ধরনের বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদ থেকেও এসেছে[৬০১]।

[৬০১] আল উম্ম খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬, দারদীরী, আশ শারহুল কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০৬, আল ইশরাফ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৩, আল মুহাযযাব খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৯, আল ওজীয খণ্ড ২, পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

ইমাম গাজ্জালী রহ. তাঁর শিফাউল গালীল গ্রন্থে তওবা করার পরও যিন্দীককে হত্যা করার ব্যাপারটি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এটি একটি ইজতিহাদী বিষয়। দুই মযহাবের একটিকে বাতিল করে দিলেই বিষয়টি খতম হয়ে যাবে না এবং হত্যা করার ও হত্যা না করার মধ্যেকার কারণও দূরীভূত হবে না।

যিন্দীককে হত্যা করতে বিরত থাকার কারণটি একটি হাদিসের সাধারণ বিধান থেকে সুস্পষ্ট হয়। নবি সা. বলেন :

أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله.

> লোকেরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

কাফের ও মুরতাদদের যে কোন শ্রেণি যখন তওবা করবে, তাদের জন্য এ নসটি প্রযোজ্য হবে। অন্যদিকে যিন্দীককে হত্যা করার কারণ হচ্ছে, শরিয়াহর বিধান থেকে জানা গেছে যে, কাফের হত্যাযোগ্য। আর আমরা তার তওবার কারণে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকছি। তার তওবার অর্থ হচ্ছে, সে বাতিল ধর্মমত ও মতবাদ পরিত্যাগ করেছে। আর যিন্দীকের অবস্থা হচ্ছে, মুখে সে কালেমা শাহাদত উচ্চারণ করেছে অথচ তার বাতিল ধর্মমত ও মতবাদ পরিত্যাগ করেনি বরং তার হুকুম মেনে চলছে। ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা এবং অন্য সমস্ত ধর্মমত ও মতবাদে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস সহকারে মুখে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে নিজেদের প্রতি কুফরী করে এবং তাকে পরিত্যাগ করে। তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাদের দ্বীনের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, তারা তাদের দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু যিন্দীক যখন কালেমায়ে শাহাদত উচ্চারণ করে তখন তার থেকে যা অনিবার্য হয়ে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, সে তার দ্বীনের উপর আমল করেছে। এটিই হচ্ছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিরোধের কারণ। একথা বলা যাবে না যে, মাসলিহাত বা কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই শাস্তিটা দেয়া হয়েছে। বরং যারা তাকে তার কুফরীর জন্য একজন ক্রমাগত চলমান কাফের বলে জানে তাদের পক্ষে এটা কুফরীর শাস্তি হিসেবে হত্যা। বিরোধ হচ্ছে এ বিষয়টি নিয়ে যে, তার কালেমায়ে শাহাদত পাঠ কাফেরের কালেমা পাঠ এবং মুরতাদের তওবা করার অর্থে বিবেচিত হবে না। কারণ তাদেরটা তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করার এবং যিন্দীকেরটা তার দ্বীনের

১৬৬, হাশিয়া ইবনে আবেদীন খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৮, আবূ ইউসূফ, কিতাবুল খারাজ পৃষ্ঠা ১৭৯।

www.pathagar.com

উপর অবিরতভাবে টিকে থাকার জন্য করা হয়। কাজেই এ দু'টি এক নয় এবং একে নিছক মাসলিহাত ভিত্তিক বলা যাবে না[৬০২]।

এ বক্তব্যের প্রতিবাদে বলা হয় : নবি সা. মুনাফিকদেরকে এড়িয়ে গেছেন অর্থাৎ তাদের হত্যা করাকে। অথচ তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে তাঁকে লাগাতার ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি অপ্রকাশ্যের ভিত্তিতে হুকুম দিতে চাননি। উসামাকে তিনি বলেছেন : তুমি তো তার দিল চিরে দেখোনি[৬০৩]।

মুসলমানরা যখন কাফেরদের কোন দেশ আক্রমণ করে বিজয় লাভ করে, তাদের শক্তি-প্রতিপত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং কাফেররা কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতে থাকে তখন মুসলমানরা তাদের তরবারি কোষবদ্ধ করে এবং সংযত হয়ে যায়। তবে তারা ভালভাবেই জানে কাফেররা মনেপ্রাণে এবং হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও প্রত্যয় সহকারে দ্বীনের হিদায়াত গ্রহণ করছে না। কিন্তু তারা কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করছে। এটা হচ্ছে একটা বাহ্যিক কার্যকারণ। ভেতরের আকীদা বিশ্বাস জানা যাচ্ছে না যেমন শরিয়াহর নজিরসমূহ জানা যায়।

এর হয়তো এ রকমও একটা জবাব দেয়া যায় যে, জনগণ ও দ্বীনের সাধারণ অনুসারীরা দ্বীনের ভিত গড়ে তোলে মাসলিহাত–এর উপর। এর ফলে যাদেরকে দ্বীন গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তাদের ব্যাপারটি অস্পষ্ট হয়ে যায়। তারা এক দ্বীন ত্যাগ করে আর এক দ্বীন গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে মুখের কথার ভিত্তিতে তাদের বিশ্বাসকে মেনে নিতে হয়। তাই আকিদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে যারা আপোসহীন তারা মুখের কথার উপর নির্ভর করতে রাজী হয় না। অন্যদিকে মুনাফিকরা তাদের কুফরীকে লুকিয়ে রাখে সন্দেহজনক কথার মধ্যে। তারা সুস্পষ্ট কথা বলে না। আর সন্দেহজনক কথার উপর কোন বিষয়ের ভিত রাখা যায় না। বিপরীতপক্ষে যিন্দীক তার ইলহাদ ও ধর্মবৈরিতা প্রকাশ করে এবং তারপর তাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে এই ভয়ে যে, তার কাছ থেকে দ্বীন ছিনিয়ে নেয়া হবে[৬০৪]।

বর্ণিত আছে, আলী রা. যিন্দীকদের অগ্নিদগ্ধ করেছেন। বসরা থেকে যিন্দীকদের আনা হলো এবং তাদের সামনে ইসলাম পেশ করা হলো। তাদের তওবা করতে

---

[৬০২] শিফাউল গালীল- পৃষ্ঠা ১৪০।

[৬০৩] বুখারি ও মুসলিম উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন যখন তাঁকে নবি সা. একদল লোকের কাছে পাঠিয়েছিলেন, ইমাম আবূ ইউসূফের কিতাবুল খারাজেও ১৭৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে।

[৬০৪] শিফাউল গালীল পৃষ্ঠা ১৪১।

www.pathagar.com

বললেন। তারা অস্বীকার করলো। তাদের জন্য গর্ত খনন করলেন এবং বললেন: আজ তোমাদের পেট ভরে গোশত ও চর্বি খাওয়াবো। তারপর তাদের শিরচ্ছেদ করার হুকুম দিলেন এবং গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তার উপর আগুন ছড়িয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে ফেললেন[৬০৫]।

যিন্দীকদের হত্যার ব্যাপারে সবাই একমত হয়ে একথাই বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনের কল্যাণের হেফাজত এবং কৌতুককারীদের কৌতুক থেকে একে বাঁচানো। আর যিন্দীকরা এমন একটি দল যাদের নাম বদল হলেও কোন যুগে তারা বিলুপ্ত হয়নি। ইসলামের প্রথম যুগে মুনাফিকদের একটি দল ছিল, তারা তাদের অবস্থা ও দুষ্ট মানসিকতার ভিত্তিতে কুরআনের অর্থ করতো। তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে যিন্দীকদের এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটলো যারা যেনতেনভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে লাগলো। আর আমাদের বর্তমান যুগে কম্যুনিষ্ট মূলহিদদের এবং অন্যদের এমন একটি দলের জন্ম হয়েছে যারা ইসলামি দেশগুলোর মধ্য অনুপ্রবেশ করেছে। তারা নিজেদের কুফরী ও ইলহাদের কথা ঘোষণা করার সাহস করে না রবং নিজেদের ইসলামের কথা ঘোষণা করে জনগণকে ধোকা দেয়। আমার মতে, এই সবগুলো দলের একই শাস্তি হওয়া দরকার- তা শরিয়াহর পূর্ণদণ্ডনিধি জারী করে বা ভীতিমূলক অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করে হোক না কেন।

তৃতীয় পদ্ধতি : দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং বিদআতী ও যাদুকরদেরকে শাস্তি দেয়া

বিদআত কোন নতুন জিনিস শুরু করার নাম। অর্থাৎ পূর্বে যা ছিল তা থেকে ভিন্নতর কিছু উদ্ভাবন করা। তারপর এর ব্যবহার শুরু হয় দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু কম-বেশি করা অর্থে। তবে কখনো এমন কিছু বিদআত হয় যা মাকরূহ নয়। তখন তাকে মুবাহ বিদআত বলা হয়। আর এই ধরনের বিদআত আসল শরিয়াহর মধ্যে থাকে অথবা মাসলিহাতের কারণে শরিয়াহ তা দাবী করে, যেহেতু তার সাহায্যে কোন বিপর্যয় রোধ করা হয়। যেমন জনতার ভীড় থেকে বাঁচার জন্য খলীফার পর্দান্তরালে থাকা[৬০৬]।

---

[৬০৫] দাআয়েমুল ইসলাম খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮০।

[৬০৬] আল মিসবাহুল মুনীর পৃষ্ঠা ১৩ এবং আল কামূসুল মুহীত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৩।

www.pathagar.com

শাতবী এর দু'টি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, শরিয়াহর দৃষ্টিতে বিদ'আতের অর্থ হচ্ছে শরিয়াহর সমান্তরালে আর একটি পথ উদ্ভাবন করা এবং এ পথে চলাচলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার বন্দেগীর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা[৬০৭]।

এ সংজ্ঞাটি তাদের যারা শরিয়তে বিদআত সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভ্যাস ও আচার-আচরণের স্বীকৃতি দেয় না। তারা কেবলমাত্র ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে বিদ'আতের স্বীকৃতি দেন। আর যারা আচার-আচরণকেও বিদআতের অন্তর্ভুক্ত করেন তাদের মতে বিদআতের সংজ্ঞা হচ্ছে : বিদআত দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবিত এমন একটি পদ্ধতি যা শরিয়াহর উপর চলার জন্য আর একটি সমান্তরাল পথ তৈরি করে[৬০৮]।

আর পথ চলা ও পদ্ধতি এবং সুন্নাত– এ সবগুলোর অর্থ একই। অর্থাৎ যার উপর চলার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। অবশ্য দ্বীনকে এর সাথে অনিবার্যভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ তার মধ্যে উদ্ভাবন করতে হবে এবং ব্যক্তিকে তার সাথেই সম্পর্কিত হতে হবে। যদি দুনিয়াবী কোন বিষয়ে কোন বিশেষ পথ আবিষ্কার করা হয় তাহলে তাকে বিদআত বলা হবে না। যেমন নতুন শিল্প সামগ্রী উৎপাদন এবং নতুন দেশ উদ্ভাবন ইত্যাদি[৬০৯]।

দ্বীনের পদ্ধতি দু'ভাগে বিভক্ত। একটির মূল শরিয়াহর মধ্যে নিহিত আছে এবং অন্যটির মূল শরিয়াহর মধ্যে নেই। এর মধ্য থেকে যার সীমানা নির্ধারিত হয়েছে সেটিকে নির্দিষ্ট করে নেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি। অর্থাৎ যে পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং শরীয়তে তার কোন নজির নেই। কারণ তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শরিয়াহ প্রণেতার বর্ণনার বাইরে তার অবস্থান। এভাবে চিহ্নিতকরণের ফলে বাহ্য দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে এগুলো নতুন করে উদ্ভাবিত। দ্বীনের উদ্দেশ্যের সাথে উপকরণগত দিক দিয়ে এর সম্পর্ক আছে। যেমন ব্যাকরণ ও শব্দ প্রকরণ বিদ্যা, শব্দার্থ ও অভিধান, উসূলে ফিকহ ও উসূলে দ্বীন এবং শরিয়াহকে জানার ও অনুশীলন করার কাজে সহায়ক যাবতীয় বিদ্যা। যদিও এগুলো ইসলামের প্রথম যুগে উদ্ভাবিত হয়নি তবুও শরীয়তে এগুলোর মূল্য রয়েছে। কাজেই এগুলোকে পরোক্ষ পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত বিদআত ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না।

---

[৬০৭] আল ই'তিসাম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০ ।

[৬০৮] আল ই'তিসাম- খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

[৬০৯] আল ইতিসাম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১।

www.pathagar.com

এগুলোর শরিয়াহর সমান্তরাল হবার অর্থ হচ্ছে : এগুলো শরিয়াহর পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল যদিও প্রকৃতপক্ষে তা নয় বরং তার বিপরীত[৬১০]।

ইয্য ইবনে আবদুস সালাম বিদআতের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এভাবে : নবি সা.-এর যুগে পরিচিতি লাভ করেনি এমন যে কোন কাজই বিদআত। তিনি একে নিম্নোক্ত প্রকারে বিভক্ত করেছেন : ওয়াজিব বিদআত, হারাম বিদআত, মানুদূব বিদআত, মাকরূহ বিদআত, মুবাহ বিদআত। তারপর এগুলোর সাথে পরিচিত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: বিদআতকে শরিয়াহর নীতি-নিয়মের উপর পেশ করো। যদি তা ওয়াজিবের নীতির আওতায় এসে যায় তাহলে তা হবে ওয়াজিব। আর যদি হারামের নীতির মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে হবে হারাম। এভাবে মানদূব, মাকরূহ ও মুবাহ হবে[৬১১]।

ইয্য ইবনে আবদুস সালামের মতানুসারে বিদআত শরিয়াহর পাঁচটি বিধানের বাইরে অবস্থান করে না। এটি একটি যুক্তি সঙ্গত কথা। কারণ ব্যক্তি যখনই কোন কাজ করে, তা শরিয়াহর বিরোধী বা তার সমর্থক হবে। এসবের যে কোনটিই ঐ পাঁচ প্রকারে অর্থাৎ ওয়াজিব, মানদূব, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ- এর বাইরে যাবে না। কাজেই হারাম বা মাকরূহ থেকে এর সকল শ্রেণির হেফাযতই উদ্দেশ্য।

মিসবাহ গ্রন্থের লেখক বিদ'আতের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন : এর ফলে দ্বীনের মধ্যে কোন কমতি অথবা কোন বৃদ্ধি দেখা দেবে।

নতুন উদ্ভাবন বা বিদ'আতের কারণ

শাতবীর মতে, শরিয়াহর মধ্যে নতুন সৃষ্টি হয় অজ্ঞাত অথবা বুদ্ধিদীপ্ত সদিচ্ছা কিংবা সত্যের সন্ধানে কামনার অনুগামী হবার কারণে। আর কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আরোহ পদ্ধতিতে এর মধ্যে সীমাবদ্ধতা আসে। এ তিনটি কারণ কখনো স্বতন্ত্রভাবে দেখা দেয় আবার কখনো এরা একত্র হয়ে যায়। একত্র হয়ে গেলে কখনো দু'টি আবার কখনো তিনটি একসাথে এসে পড়ে।

অজ্ঞতার কারণটির ব্যাপারে বলা যায়, কখনো উদ্দেশ্য অনুধাবন করার অর্থাৎ শব্দের অর্থ, তার গঠন প্রণালী ও প্রয়োগ রীতির সাথে এর সম্পর্ক থাকে। আবার কখনো

---

[৬১০] আল ইতিসাম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১।

[৬১১] কাওয়ায়েদুল আহকাম- খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৪।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য অর্থাৎ লাভ ও ক্ষতি আহরণের ক্ষেত্রে ও তার পূর্ণতাকে পুরোপুরি অনুধাবন করার সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আর বুদ্ধিদীপ্ত সদিচ্ছা কখনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরিয়াহর সাথে শরীক হয়ে যায় আবার কখনো তার চাইতে এগিয়ে যায়। এই দু'টি ক্ষেত্রই আসলে একটি ক্ষেত্রে একত্র হয়। অন্যদিকে কামনার অনুগামী হওয়ার ক্ষেত্রে বোধ পরাজিত হয়, এমনকি ব্যক্তি তার যুক্তি পরিবর্তন করে ফেলে অথবা অযৌক্তিকতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এই দু'টি ক্ষেত্রও একটি ক্ষেত্রে একত্র হয়। এভাবে সবগুলো চার প্রকারে বিভক্ত হয় : বোধের অজ্ঞতা উদ্দেশ্যের অজ্ঞতা, বুদ্ধিদীপ্ত সদিচ্ছা ও কামনার অনুগামিতা[৬১২]।

এ থেকে আমরা জানতে পারি, দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করা আসলে কল্পনা বিলাসিতা, কামনা-বাসনা ও বুদ্ধির প্রতি আস্থাশীলতা ও তার দ্বারা প্রতারিত হওয়া এবং শরিয়াহ নির্ধারিত সীমারেখা থেকে বের হয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে দ্বীনের উদ্দেশ্য থেকে সরে যাওয়া ও তার ধ্বংসের জন্য একটি সতর্ক ঘন্টা। এ অবস্থায় শরিয়াহ তার দ্বীনের ধ্বংস ও বিকৃতি রোধ করার, তার আরকান, স্তম্ভ, ঐতিহ্য ও উদ্দেশ্যাবলীকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার এবং তার বিধান ও নীতিসমূহকে বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার জন্য বিদআত সৃষ্টিকারীদের জন্য কি শাস্তি নির্ধারিত করেছে?

বিদআতীদের জন্য কোন সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত শাস্তি নেই। তবে ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তাদের বিদ'আতের ফলে যদি শরিয়াহর কোন ক্ষতি হয় তাহলে এজন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু এ শাস্তির কোন সীমা নির্ধারিত হয়নি। তাই একে তিরস্কার ও ভর্ৎসনামূলক শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তবে শাস্তির পরিমাণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এ শাস্তি শাস্তির সর্বনিম্ন পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যাবে কিনা? কারোর মতে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থাৎ হত্যা পর্যন্ত এর শাস্তি হতে পারে। আবার কারোর মতে এর সর্বনিম্ন শাস্তির পরিমাণ হবে চল্লিশ ঘা বেত্রাঘাত। কারোর মতে বিদআত যে ধরনের ব্যাপক বা সীমিত বিপর্যয় ডেকে আনবে সেই অনুযায়ী এর শাস্তি নির্ধারিত হবে। এ কারণেই গোপন বিদআতকারী ও প্রকাশ্য বিদআতকারীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। প্রকাশ্য বিদআতকারী কখনো তার বিদ'আতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে আবার কখনো করে না। আর আহ্বানকারী কখনো অবস্থার শিকার হয়ে ন্যায়-নিষ্ঠ ইমাম ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আবার কখনো এ পর্যায়ে পৌঁছে না। কখনো তার

[৬১২] আল ইতিসাম খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮০।

www.pathagar.com

বিদআত প্রচারের জন্য সে শাসকদের সহায়তা লাভের চেষ্টা করে। আবার কখনো কোনো প্রকার চেষ্টা করে না[৬১৩]।

আমার মতে, এটি সবচেয়ে যুক্তি সংগত অভিমত। এটি শরিয়াহর মূল ও তার উদ্দেশ্যের বেশি নিকটবর্তী। কারণ বিপর্যয় ও ক্ষতিকর কাজের ভিত্তিতে শাস্তি দেয়াই শরিয়াহর মূলনীতি। ক্ষতির ক্ষেত্র যতই ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে শাস্তিও হবে ততই কঠিন ও কঠোর। এরই ভিত্তিতে দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টিকারীর শাস্তি হবে নিন্দা ও তিরস্কারমূলক। জনগণের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের হেফাযতের লক্ষ্যে শাসকগণ শাস্তি নিয়ন্ত্রণ করেন। শাস্তির মাধ্যমে শরিয়াহ যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় তা হচ্ছে, বিপর্যয় রোধ করে কল্যাণ নিশ্চিত করা। আর শক্তি ও দুর্বলতার ভিত্তিতে এই কল্যাণ বিভিন্ন প্রকারের। ইতোপূর্বে কল্যাণের প্রকারভেদ ও তার মধ্যেকার পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে[৬১৪]।

এবার আমরা যাদুকরের আলোচনায় আসছি। যাদুকর শব্দটির মূল আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে সাহের। সাহের শব্দটি সিহর থেকে গঠিত। সিহর- এর আসল অর্থ হচ্ছে : ছল-চাতুরী করে ছদ্মবেশে প্রতারণা করা। অর্থাৎ যাদুকর কোন জিনিস নিয়ে এমন কিছু করে যার ফলে দর্শক ভাবতে থাকে জিনিসটা যা ছিল তা আর নেই। যেমন মরীচিকা দেখে দর্শক দূর থেকে তাকে পানি মনে করতে থাকে। যেমন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া দৌড়িয়ে চলার সময় দেখতে পায় গাছপালা, পাহাড়, নদী সব তার সাথে ছুটে চলছে[৬১৫]।

যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে ফকীহগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের কারো মতে, যাদু একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। কারোর মতে, যাদুর মধ্যে কোন সত্য ও বাস্তবতা নেই। ফকীহগণ মুসলিম যাদুকর ও যিন্দীক যাদুকরের ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালেকের মতে, মুসলিম যাদুকর যখন তার কথার সাহায্যে যাদু করে, সে কাফের হয়ে যায়। তাকে হত্যা করা হবে। সে তওবা করলে তা গ্রহণ করা হবে না। কারণ যাদু এমন একটা কাজ যার মাধ্যমে যাদুকর তার ইমানকে ঢেকে দেয় যিন্দীক ও যিনাকারীর মতো। আল্লাহ তায়ালা যাদুকে কুফরী আখ্যা দিয়েছেন :

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

---

[৬১৩] আল ই'তিসাম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৬-২২২ এবং শিফাউল গালীল- পৃষ্ঠা ১৪২।

[৬১৪] আল ই'তিসাম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৬-২২২ এবং শিফাউল গালীল পৃষ্ঠা ১৪২।

[৬১৫] আল কুরতুবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪।

www.pathagar.com

তারা কাউকেও যাদু শিক্ষা দিত না এ কথা না বলে : আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তোমরা কুফরী করো না[৬১৬]।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানীফাও একই মত প্রকাশ করেছেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবা ও তাবেঈনদের থেকে যাদুকরকে হত্যা করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। নবি সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, তরবারির আঘাতে তার শিরচ্ছেদ করা[৬১৭]।

শাফেয়ী রহ. থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ তাকে হত্যা করা যাবে না, তবে যদি সে তার যাদুর সাহায্যে কাউকে হত্যা করে এবং বলে; আমি জেনে বুঝে হত্যা করেছি, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে। আর যদি সে বলে আমি তাকে হত্যা করতে চাইনি, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না। এক্ষেত্রে তাকে দীয়াত বা রক্তপণ দিতে হবে। আর সে যদি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে, তাহলে ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেবে।

আর যিম্মী যাদুকরের ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. থেকে বিভিন্ন রকম বক্তব্য পাওয়া যায়। এক বক্তব্যে তিনি বলেছেন, তাকে হত্যা করা হবে। অন্য বক্তব্যে বলেছেন, হত্যা করা হবে না, তবে যদি তার যাদুর সাহায্যে কাউকে হত্যা করে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আবার অন্য এক বক্তব্যে বলেছেন, তাকে তওবা করতে বলা হবে এবং তার তওবাই ইসলাম। এ ছাড়া তিনি অন্য এক বক্তব্যে বলেছেন, সে ইসলাম গ্রহণ করলেও তাকে হত্যা করা হবে।

এ সমস্ত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো, যাদু ইসলামি শরীয়তে একটি পাপকাজ বলে গৃহীত। মুসলিম অথবা যিম্মী যখন এ পাপ করে এবং এর ফলে ক্ষতি হবে তখন তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তির তারতম্য হবে।

চতুর্থ পদ্ধতি : গুনাহকে হারাম করা এবং শরিয়াহর দণ্ডবিধি অনুযায়ী গুনাহকারীকে শাস্তি দেওয়া

আল্লাহ তায়ালা কবীরা ও সগীরা গুনাহ করতে নিষেধ করেছেন। কবীরা গুনাহের জন্য নির্ধারিত অথবা অনির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আর সীমা লঙ্ঘনকারীর

---

[৬১৬] সূরা আল বাকারাহ ১০২ আয়াত, আল কুরতুবী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭, ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন- খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬।

[৬১৭] তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

জন্য আখেরাতে কঠিন শাস্তির ওয়াদা করেছেন। দুনিয়াতে সে এ জন্য বাড়তি শাস্তি লাভ করবে।

অন্যান্য সমস্ত ইলাহী দ্বীনের মতো ইসলামও এসেছে নৈতিক গুণাবলীর প্রসার ও জনগণের হিদায়াতের জন্য। কাজেই কোন নিকৃষ্ট প্রবণতাকে সমৃদ্ধি লাভ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। অন্যদিকে সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকেও উন্মত্ত বিলাসী জীবন-যাপন করার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে ধ্বংস করার জন্য ছেড়ে দেয়াও ঠিক নয়। এ বিষয়টি ইসলামকে সব সময় অস্থির ও সক্রিয় রাখে। কারণ ইসলামের মৌল বিধানই হচ্ছে আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার– তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। কখনো ইসলামের এই সুমহান মৌল বিধানটি বিপর্যয়কে উৎখাত করার জন্য তরবারির সাহায্য গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে আমরা একথা বর্ণনা করেছি যে, এই মৌল বিধানটি উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। মুহাম্মদ সা.-এর উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তারা আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার'- এর পবিত্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আর দ্বীনের হেফাযতের পূর্ণতা আসে তখনই যখন মুমিনদের হৃদয় এমন সব পাপের কালিমা মুক্ত হয় যেগুলো সত্যিকার ইমানের নূর থেকে পাপীর অন্তরে আড়াল সৃষ্টি করে রাখে।

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা হক ও যথার্থ অধিকার ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম গণ্য করেছেন। যিনাকে হারাম করেছেন, মদপান হারাম করেছেন, সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা চারিত্রিক কলঙ্ক আরোপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। চৌর্যবৃত্তি হারাম করেছেন। এসব কাজের প্রত্যেকটির জন্য নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার নাফরমানী ও সূদ খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। জুয়া খেলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হারাম করেছেন। এ ছাড়াও এসব ধরনের গুনাহের নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যেসব কাজ মুনকার তথা অসৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলোকেও তিনি নিষিদ্ধ গণ্য করেছেন।

শরিয়াহর সংরক্ষণ ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তিনি শাসকদের উপর জনগণের বিষয়াদির দায়িত্ব অর্পন করেছেন। তারা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত সীমানা, তাঁর দ্বীনের বিধান, নীতি, নিয়ম ও মূল থেকে বের হয়ে আসাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য শাস্তির ধারা প্রবর্তন করেছেন।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কামূসুল মুহীত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৬ এবং আল মিসবাহুল মুনীর, ৯৮৩ পৃষ্ঠা।

২. আল গাজ্জালী রহ., শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৩, ডক্টর হাম্‌দ উবাইদ আল-কানাই-এর তথ্যানুসন্ধান। আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩, নিবরাসুল উকূল, ৩২৩-৩২৮ পৃষ্ঠা। আল উস্তায আশ শাইখ মুহাম্মদ আনিস ইবাদাহ, পৃষ্ঠা ৯।

৩. মুহাম্মদ মুস্তফা শিবলী, তালীকুল আহকাম, ২৮২-২৮৩ পৃষ্ঠা।

৪. শিকাউল সালীল, ১০৩ পৃষ্ঠা, আল-মাওয়াবিকাত, খণ্ড ২, ৮ পৃষ্ঠা।

৫. আল মাওয়াকিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯ ।

৬. সুরা আল ইসরা, ৩৩ আয়াত।

৭. সুরা আততাকভীর, ৮ - ৯ আয়াত।

৮. সুরা আল আনআম, ১১৯ আয়াত।

৯. আল মাওয়াকিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯।

১০. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০।

১১. সুরা আর্‌ফরিয়াত, ৫৬ আদয়াত।

১২. সুরা আল নাহল, ৩৬ আয়াত।

১৩. সুরা আল আম্বিয়া, ২৫ আয়াত।

১৪. সুরা আব্‌ যুবরাহবে, ৪৫ আয়াত।

১৫. ইবনুল কাইয়িম, মিফ্‌তাহু দারুস সা'আদাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৯, আতল নাওয়াকিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২০।

১৬. সুরা ফাতের ১৫ আয়াত।

১৭. আল উস্তাব শায়খ মুহাম্মদ আলিস উঠাদাহ, মাকাসিদুকা নগরীআহ, পৃষ্ঠা ৮-৯।

১৮. তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশূর। জামে আয্‌রাইতুমীয়ার শাইখ। তিউনিসের সমকালীম আলেমগণের অনেকেই ছিলেন তাঁর ছাত্র। তিনি মাকাসিদুশ শরীআতিল ইসলামিয়া নামে কিতাব রেখেন এবং তা তিউনিসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক, সূক আত্তরীলের মাকতাতুল ইসতিকামাহ।

১৯. সুরা আল ইস্‌রা, ১৮ আয়াত।

২০. সুরা আল ইসরা, ১৯ আয়াত।

২১. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৩ সহিহতে পত্রাশিত।

২২. সুরা আল আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত।

www.pathagar.com

২৩. সুরা আল আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত।

২৪. সুরা ইউনুস, ৫৭ আয়াত।

২৫. সুরা আমানিসা, ১৬৫ আয়াত।

২৬. সবা আল জাসিয়া ২০ আয়াত।

২৭. সুরা ইবরাহীম, ২৮ আয়াত।

২৮. সুরা তা-হা, ১২৩-১২৪ আয়াত।

২৯. সুরা আল নাহল, ৯০ আয়াত।

৩০. সুরা আননিসা, ৫০ আয়াত।

৩১. সুরা আল আনফাল, ২৪ আয়াত।

৩২. সুরা আল নাহল, ৯৭ আয়াত।

৩৩. সুরা আল বাকারাহ, ২০৪-২০৫ আয়াত।

৩৪. সুরা আল বাকারাহ, ১৮৫ আয়াত।

৩৫. সুরা আলমায়েদাহ, ৬ আয়াত।

৩৬. সুরা আল বাকারাহ, ১৭৯ আয়াত।

৩৭. সুরা আল বাকারাহ, ২১৯ আয়াত।

৩৮. সুরা আল নায়েদাহ, ৯১ আয়াত।

৩৯. সুনান আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

৪০. বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছো এবং এখানে শব্দগুলো উদ্ধৃত হয়েছে মুসলিম থেকে।

৪১. তাবারানী মু'জামে এবং আবু ইয়ালা তাঁর মুমাদে উদ্ধৃত করেছেন।

৪২. ইবনে মাজা, দারে কুত্‌নী এবং অন্যান্য গ্রন্থ। ইবনে আচীর, আল নেহায়াতু ফাগারীবিল হাদিস, আদ্‌ দারার ওয়াদ বিরার অর্থ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮১।

৪৩. ইবনে আবদুস সালাম, কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২-২৩।

৪৪. বুখারি আবু হুরাইযা রা. থেকে রেওয়ায়েত করেছে।

৪৫. সুরা আন-নিসা, ৩১ আয়াত।

৪৬. সুরা আন নাজম, ৩২ আয়াত।

৪৭. তাফসীর ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০৬-২০৯।

৪৮. ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫, কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, ১৭৮ পৃষ্ঠা ড. মুহাম্মদ সাঈদ, রামাদান আলবুতী, যাওয়াবিতুল মাসলিহাত, পৃষ্ঠা ৮১।

www.pathagar.com

৪৯. ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, ১১৫ পৃষ্ঠা এবং কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৮।

৫০. ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৫১. দাওবিতুল মাসলিহাত, পৃষ্ঠা ৮১ এবং কাওয়ায়েছুল আহকাম, খণ্ড ২, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৫২. ঐ।

৫৩. বুখারি।

৫৪. শিফাউল গালীল, ১০৩ পৃষ্ঠা।

৫৫. কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ২, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৫৬. আল মাওয়াফিকাত, ১২ পৃষ্ঠা।

৫৭. শায়খ ঈসা মানুফ, নিররাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ৩২৪, ৩২৬, ৩২৮, শাইখ মুহাম্মদ আনীস উবাদাহ, মাকাসিদুল শারীয়াহ, পৃষ্ঠা ১০ ।

৫৮. আল-মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২০।

৫৯. ঐ।

৬০. ঐ।

৬১. সুরা আল মুমিনূন, ৭১ আয়াত।

৬২. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, ১২২-১২৩ আয়াত।

৬৩. সুরা আল মুমিনূন, ১১৫ আয়াত।

৬৪. সুরা আদ্‌দুখান, ৩৮-৩৯ আয়াত।

৬৫. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, ১২৩ আয়াত।

৬৬. ঐ।

৬৭. ঐ।

৬৮. ঐ এবং জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৫১- ৫২ ।

৬৯. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৫১, ইলামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৩ এবং খণ্ড ২, ১২৩, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৪ ।

৭০. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৪ । কারাফী, আল ফুরুক, খণ্ড ২, ৩২ পৃষ্ঠা।

৭১. সুরা আননিসা, ১১৫ আয়াত।

৭২. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৪ ।

৭৩. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে ইমাম বুখারি হাদিসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

৭৪. বুখারি ও মুসলিমের রেওয়ায়েত এবং রেওয়ায়েতের শেষ অংশটুকু মুসলিমের।

www.pathagar.com

৭৫. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৫১-৫২ এবং ১০৩ ১১ পৃষ্ঠা, মুসলিমের উপর ইমাম নরবীর শারাহ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪।

৭৬. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২০ এবং জামেউল উতলূম ওয়ালহিকাম, পৃষ্ঠা ৫২।

৭৭. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ৫৪ পৃষ্ঠা মুসলিমের উপর ইমাম নববীর শারাহ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০, মিসরের আবহারে মুদ্রিত।

৭৮. ই'নাসুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪।

৭৯. ইমাম মুসলিম আবু হুরাইরা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, আত তাজুল জামে লিল উসূলে যতী আহাদীসির রসুল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭।

৮০. সুরা আর কাহাবে, ১১০ আয়াত।

৮১. সুরা আল বাইয়েনাহ, ৫ আয়াত।

৮২. একদল রাবী হাদিসটি রওয়ায়েত করেছেন। শওকাশীর নাইলুল আওরাবে এবং মুসলিমে এটিউদ্ধৃত হয়েছে এই শব্দাবলী সহকারে।

৮৩. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২৬ এবংউসূলুল কিদরী পৃষ্ঠা ২৩২।

৮৪. সুরা আল হাজ্জ, ১১ আয়াত।

৮৫. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৬-২৯৮, ইলামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৭ এবং জামেউল উলুম, পৃষ্ঠা ৫৩ ।

৮৬. আহমদ ফাহ্মী আবু সুন্না, আল ওয়াসীত ফীউসূলে ফিক্হিল হানাফীয়্যা, পৃষ্ঠা ২১৮, জামউল জাওয়ামে খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯৬ এবং উসূলু মুহাম্মদ খিদরী পৃষ্ঠা ১২১-১২২।

৮৭. সুরা আল ইস্‌রা, ৩২ পৃষ্ঠা।

৮৮. সুরা আল বাকারাহ, পৃষ্ঠা ১১৮৮।

৮৯. সুরা আল বাকারাহ, পৃষ্ঠা ২২২।

৯০. সুরা আল জুম্‌আ, ৯ আয়াত।

৯১. আল ইতিসাম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫২, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিশাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬- ১৩৭, ইবনে আত্তর মাকাসিদুশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ১২ এবং কারাফী, তালকীহুল ফস্‌ল, পৃষ্ঠা ১৯৭।

৯২. কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, পৃষ্ঠা ১২, জামউল জাওয়ামে' আত্তারের হাশিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০০, আমাদী, আল আহকাম, খণ্ড ৪, ৩২৫ পৃষ্ঠা, ইস্‌লুল খিদরী ৩৯৪ পৃষ্ঠা।

৯৩. জামউল জাওয়ামে' আত্তারের হাশিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৫, আত তুজ্জারিয়াল কুবরা ও শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১৫। ডক্টর হামদ উবাইদ আল কাইসীর তথ্যানুসন্ধান, উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৩৫৭ এবং তা-হা আবদুল্লাহ আদদাসুকী, উসূলুল ফিকাহ, পৃষ্ঠা ২৭৮।

www.pathagar.com

৯৪. আবহার সংকলিত আল বুরহা, ৯১৩ নম্বর, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারিয়া, পৃষ্ঠা ১২, শিবলী, তা'লীলুল আহ্কাম, পৃষ্ঠা ২৮৫।

৯৫. আল ই'তিসাম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০১ ও ২৫১, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীলা, পৃষ্ঠা ১৩, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২।

৯৬. ইলামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬-৯।

৯৭. আর 'রিসালাহ, পৃষ্ঠা ৩৯, আহমদ মুহাম্মদ শাকেরের তথ্যানুসন্ধান।

৯৮. আর রিসালাহ, আহমদ মুহাম্মদ শাকেরের তথ্যঅনুসন্ধান, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০।

৯৯. ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৫, আহমদ আবদুর রহীম দেহলবী শাযেহী (মৃত্যু : ১১৮০ হি.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃষ্ঠা ১৩৯।

১০০. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯০।

১০১. সুরা আল আনফাল, ৬ আয়াত।

১০২. সুরা আন নূর, ২০ আয়াত।

১০৩. সুরা আল আহযাব, ৫৩ আয়াত।

১০৪. সুরা আন নূর, ২৮ আয়াত।

১০৫. সুরা আন নূর, ৩১ আয়াত।

১০৬. সুরা আল আহযাব, ৩২ আয়াত।

১০৭. সুরা আল মায়েদাহ, ৯০-৯১ আয়াত।

১০৮. সুরা আল হাশ্র, ৭ আয়াত।

১০৯. উমদাতুল কারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০১, শওকানী, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৪।

১১০. আল ইলালুল বায়েছ আলাল আমরি বিত্ তাখ্ ফীক, যেমন আদ্ দুউফ ওয়াস সিকাম ওয়াল কিবার ওয়াল হাজাহ ওয়াল ইশ্তিসালু খাতেরুম আমিস সারিয়ু বিবুকায়িহ ওদয়া গায়রু মালিক।

১১১. ইমাম মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে।

১১২. বুখারি, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ এবং শওকালী, মাইলুল আওতার।

১১৩. নাইনুল আওতার, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২৬।

১১৪. কাওয়ায়েদুল হিকাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৯, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫।

১১৫. ইবনে মাজাহ ও আসহাবুস সুনান।

১১৬. ১১৫ ক. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫০, দারদীরী, আশ্ শারস্থল কবীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬০, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

www.pathagar.com

১১৭. আহমদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী, শারাউল মাগানিম, পৃষ্ঠা ১২, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৮।

১১৮. নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৯।

১১৯. নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৯।

১২০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫১, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৯, কাসাব্বী, আল ফুরুক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২।

১২১. আহমদ ও মুসলিম, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২১।

১২২. মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, পৃষ্ঠা ১৫-১৭।

১২৩. তাফসীর আল ফাসরুর রাহী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৮।

১২৪. বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে নাইলুল আওতারে বর্ণিত।

১২৫. নাইলুল আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৫, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৫৫, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, পৃষ্ঠা ১৬।

১২৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৯, আল মাওয়াফিকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১৩, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শারীয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

১২৭. ইলামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৬।

১২৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬।

১২৯. সুরা আল মায়েদাহ, ৩ আয়াত।

১৩০. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১২২ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৭।

১৩১. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১২২, কাযী আবদুল জাব্বার, আল মুগনী, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ২৯৬ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬।

১৩২. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১২২-১২৩।

১৩৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬-১৪১।

১৩৪. লিসানুল আরব, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৪৬৭, বাইরুত থেকে প্রকাশিত, তাজুল উরুস, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩২।

১৩৫. সাদউদ্দীন তাফতাযানী, শারহুল খাইসী আলাত তাহযীব, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাশিয়াতুস সিবাস আলা শারহিল মালবী আলাস সালাম পৃষ্ঠা ১৩৯।

১৩৬. মুহাম্মদ শিবলী, তা'লীলূল আহকাম, পৃষ্ঠা ৯৫।

১৩৭. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩।

১৩৮. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০, ডক্টর হামদ উবাইদ আল কাইসীর তথ্যানুসন্ধান, রিসালাত দাকতুরাহ।

www.pathagar.com

১৩৯. দাওয়াবিতুল মাসরালাহ, পৃষ্ঠা ৩৩০।

১৪০. আল মুসতাস্‌ফা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৫, ইসুলূর ফিক্‌হ, যাকিউদ্দীন শাবান, পৃষ্ঠা ১৪০।

১৪১. মাকতাবা আযহার সংকলিত ৯১৩ নম্বর আল বুরহান।

১৪২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ।

১৪৩. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮, আল ফিকরুরস সামী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২।

১৪৪. আরকাতুশ শাফেয়ীযা, গাবাকী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৪, ইরসুম খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬, শাহরিস্তালী, আল মিলাল ওয়াল নিহাল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৬, মুহাদারাহ, শায়খ আবদুল গনী আল দাউদ যাহেরী।

১৪৫. জামউল জাওয়ামে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২।

১৪৬. যাহ্‌রী, মীযানুল ই'তিদাল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮২, আল ইলাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৪।

১৪৭. ড. হামদ উবাইদ আল কাইসী, নাবাহিছুত আলীল, পৃষ্ঠা ৬।

১৪৮. দেখুন, আস ওয়াস সারাখ্‌সী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৮, দারুল কুতুব সংকলিত বাহরুল মুহীত, ৪৮৩ নম্বর, কাযী আবদুল জাব্বার, আল মুগানী, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ২৯২, ইবনুল হুসাইনী আল বাসারী, আল মু'তামাদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭২৪-৭২৫, ৭৪৫-৭৪৮।

১৪৯. আল মাহান্নী, আত্‌ তাহযীর, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩৩০৭, আসলুশ শীয়াহ ওয়া উসূলুহা, পৃষ্ঠা ১২০, আল মাবাদউল আম্মাহ লিল ফিকারিল জাফরী, পৃষ্ঠা ২৯০।

১৫০. তুগী, আল ইদ্দাহ, পৃষ্ঠা ৮৬, হাল্লী, আত্‌আহবীর, পৃষ্ঠা ৩০২।

১৫১. আসলুশ শীআহ ওয়া উসূলুহা, পৃষ্ঠা ১১৮।

১৫২. শাহারিস্‌তানী, আল মিলাল ওয়াল নিহাল এবং সাইস ও সাবাকী, তারীখুত তাশ্‌রী, পৃষ্ঠা ১৪৫।

১৫৩. আসলুশ শীয়াহ ওয়া উসূলুলহা, পৃষ্ঠা ১২০-১২১, ড. হামদ উবাইদ আল কাবিসী, মাবাহিসুত তা'লীল, খণ্ড ১, দিরাসাতুন আম্মাহ।

১৫৪. আসলুশ শীআহ, পৃষ্ঠা ১২১।

১৫৫. হাল্লী, আত্‌ তাহযীব, পৃষ্ঠা ১৭-১৮, তুসী, আল-ইদ্দাহ পৃষ্ঠা ১১৭, উস্তায শাইখ আবদুল গনীর উসূলে ফিক্‌হে ভালো ও মন্দের আলোচনা, পৃষ্ঠা ৬১-৬৫।

১৫৬. কাশফুল আসরার আলা উসূলিল বাযদাবী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৩, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৩, সদরুশ শারীয়াত ওয়াত তাফ্‌তাযানী, শারহুত তালবীহ আলাত তানকীহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪, ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০, তাকবীমুল আদিল্লাহ, পৃষ্ঠা ৬০০, আল বাইরুল মুহীত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪১, ইবনে ইসহাক, নুযহাতুল মুশ্‌তাক শারাহুল লাময়ে, পৃষ্ঠা ৭০৫।

১৫৭. কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬ এবং আত তাল্‌বীহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪।

www.pathagar.com

১৫৮. ঐ।

১৫৯. ঐ। খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৭।

১৬০. ইবনে হাযম, কিতাবুল আহকাম, পৃষ্ঠা ১১৩০, নুরহাতুল মুশতাক, পৃষ্ঠা ৭০৫।

১৬১. জামউল জাওয়ামে শারাহ সহকারে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২।

১৬২. আমাদী, আল আহকাম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৬।

১৬৩. তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ১৩, ড. হামদ উবাইদ আল কাবিসী।

১৬৪. ঐ এবং আল জামউল জাওয়ামে আত্তারের হাশিয়া সহকারে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮০।

১৬৫. জামউল জাওয়ামে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭২, আল মাহসূল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪১৩, মাকতবা আযহার সংকলিত ২১৪৭ নম্বর দলিল, আলআসনবী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৬।

১৬৬. কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪৪ এবং খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭১-১৭২।

১৬৭. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০২ এবং আলমসতাসফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৪।

১৬৮. শিফাউল সারলীবল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩।

১৬৯. ইয্ ইবনে আবদুস সালাম তাঁর উপাধি ছিল সুলতানুল আলিম নাম, আবু মুহাম্মদ ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম, আল মিস্রী আশ শাফেয়ী। ৬৬০ হিজরিসনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বিখ্যাত কিতাব কাওয়ায়েদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাস দুই খণ্ডে বিখক্ত।

১৭০. কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২।

১৭১. ঐ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪।

১৭২. ঐ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০।

১৭৩. ঐ।

১৭৪. দারুল কুতুব কর্তৃক কিতাবটি সংকলিত। সংকলন করেছেন সফিউদ্দনি আল হিন্দী। মৃত্যু ৭১৫ হিজরি। কাশফুয যুনুন গ্রন্থের লেখক অথবা ইমাম আহমদ ইবনে আলী ইবন সাআতী আল বাগদাদী এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

১৭৫. নাজমুদ্দীন আল তূফী। তিনি হচ্ছেন আবুর রবী সুলাইমান ইবনে আবদুল কাবী ইবনে আবদুল করিম ইবনে সাইদ। তুফ শহরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে তিনি হয়েছেন তূফী। তূফ হচ্ছে বাগদাদের মার্মার এলাকার একটি পল্লী। তিনি ইন্তিকাল করেন ৭১৬ হিজরিতে। হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে শিয়া মতবাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিলেন বলে কথিত আছে। উস্তাব মুস্তাফা যায়েদের আল মাসলিহাতু ফিত্ তাশরিয়ীল ইসলামি ও নাজমুদ্দীন তূফী, পৃষ্ঠা ৬৭ দেখুন।

১৭৬. রিসালাতুত তূফী, দারুল কুতুব সংকলিত রাসায়েল, দলিল নম্বর ৬১২, উসূল পৃষ্ঠা ৪৮, উস্তায মুস্তফা যায়েদ আল মাসলিহাত্ ফিশা শরীয়াতে ইসদলামীয়া, পৃষ্ঠা ৪৮।

www.pathagar.com

১৭৭. যেমন শায়খ মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশূর তার মাকাসিদুশ শারীয়াতিল ইলামিয়া কিতাবে লিখেছেন। এটি তিউনিস থেকে প্রকাশিত।

১৭৮. সুরা আল মুমিনূন, ৭১ আয়াত।

১৭৯. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৩।

১৮০. সুরা আল কাসাস।

১৮১. প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫।

১৮২. সুরা আল ইসরা, ৩১ আয়াত।

১৮৩. ঐ ৩৩ আয়াত।

১৮৪. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৪।

১৮৫. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১৩০।

১৮৬. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮।

১৮৭. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮।

১৮৮. ড. মুহাম্মদ সাঈদ রামাদান আলবুতী, দাওয়াবিতুল মাসলিহাহ, পৃষ্ঠা ৪৫১।

১৮৯. সুরা আল কাসাস, ৭৭ আয়াত।

১৯০. সুরা আল ইসরা, ১৯ আয়াত।

১৯১. সুরা আল আম্বিয়া, ৩৫ আয়াত।

১৯২. সুরা আল মুল্‌ক, ১-২ আয়াত।

১৯৩. রিসালাতুল মানফাআহ : জন ষ্টুয়ার্টের উক্তি, উস্তায শায়খ মুহাম্মদ আবু যোহরার কিতাব তানযীমুল ইসলাম লিল মুজতামা, পৃষ্ঠা ৫৬।

১৯৪. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১১ এবং দাওয়াবিতুল মাসলিহাত, পৃষ্ঠা ৫১।

১৯৫. দাওয়াবিতুল মাসলিহাহ, পৃষ্ঠা ৫৪।

১৯৬. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫।

১৯৭. দাইলামী এবং মানাবীও এর উল্লেখ করেছেন কানযুল হাকায়েক গ্রন্থে।

১৯৮. সুরা আশ শামস, ৯-১০ আয়াত।

১৯৯. সুরা আল আ'লা, ১৪-১৫ আয়াত।

২০০. সুরা আল বাকারা, ১৫১ আয়াত।

২০১. সুরা আল কাহাফ, ১১০ আয়াত।

২০২. সুরা আল কাসাস, ৫০ আয়াত।

২০৩. সুরা আন নিসা, ৫৯ আয়াত।

www.pathagar.com

২০৪. ইমাম তিরমিযী হাদিসটি রেওয়াতে করেছেন নিম্নোক্ত শব্দাবলী সহকারে। إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي হাদিসটির শেষ পর্যন্ত আত-তাজুল উসূল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯, এ ব্যাপারে আত তাজবল জামে লিল উসূল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭ দেখুন।

২০৫. সুরা আল নূর, ৪০ আয়াত।

২০৬. আবু হামেদ হচ্ছেন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল গাজ্জালী রহ. আত তূসী আশ শাফেয়ী। মৃত্যু ৫০৫ হিজরি। ইসলামের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের ওপর তিনি বহুবিধ মৌলিক গ্রন্থ প্রনয়ন করেছেন এবং এছাড়াও ইসলামের আরো বিভিন্ন বিষয়ে প্রণীত তাঁর বহু কিতাব মৌলিক চিন্তার প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলামের গগণ চুম্বী খ্যাতির অধিকারী আলেমগণের অন্যতম।

২০৭. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০২-১০৩ ও ১২০।

২০৮. আল মুসতাফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৪, মাকতাবা আযহার সংকলিত আলমাসখূল, পৃষ্ঠা ৭৭।

২০৯. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১৩২।

২১০. মাকতাবা আযহার সংকলিত আলমানখূল, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮।

২১১. তিনি হচ্ছেন, ইবরাহীম ইবনে মূসা ইবনে মুহাম্মদ, লাহাম গোত্রীয় মালেকী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। ৭৯০ হিজরিসনে তাঁর মৃত্যু হয়। উসূলে ফিকহে তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে আল মাওয়াফিকাত চার খণ্ডে বিভক্ত, দ্বিতীয় গ্রন্থ মাওয়াফিকাত। আল ইতিসাম তিন খণ্ডে বিভক্ত। দেখুন নাইলুল ইবতিহাজ বিতাত্‌রীযিদ দীবাজ, পৃষ্ঠা ৪৬-৫০ এবং আল ই'লাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭১।

২১২. আল ই'তিসাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৩-২৭৮ এবং আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯।

২১৩. জামউল জাওয়ামে ওয়া শারাহ্‌, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৬, তানকিহুল ফুসূল ফিল উসূল, পৃষ্ঠা ১৭০, নিব্‌রাসুল উকূল, ২৯৮ পৃষ্ঠা এবং শাল্‌বীর তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ২৮৫।

২১৪. মুহাম্মদ শাল্‌বী, তা'লীলূল আহকাম, পৃষ্ঠা ১৮১।

২১৫. ঐ পৃষ্ঠা ২৮২।

২১৬. আমাদী, আল আহকাম এবং শাল্‌বী, তা'লিলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ২৮৫, কারাফী, আল ফুরুক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২, শাত্‌বী, আল-মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯, আল উস্তায মরহুম আশ শাইখ তা-হা মাহমুদ আদদীনারী, মুযাক্‌কিরাতুন ফা উসূলিল ফিকহে, পৃষ্ঠা ১৫।

২১৭. মাকতাবা আযহারে রক্ষিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আল রহান ৯১৩ নম্বর।

২১৮. শিফাউল সাবলীল, ড. হামদ উবাইদ কাইসির তথ্যানুসনধান, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৮।

২১৯. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১১০।

www.pathagar.com

২২০. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪।

২২১. তানকীহুল ফুসূল ফিল উসূল, পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০।

২২২. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৪, নিবরাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ২৭৮, জামউল জাওয়ামে ওয়া শারহুহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২২ এবং শাইখ তা-হা আদদীনারীর মুযাক্কিরা, পৃষ্ঠা ১৬।

২২৩. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৩, নির রাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ২৮১, শাইখ তা-হা দীনারীর মুযাককিরা আমীদ কুল্লিয়াতিশ শরীয়া পৃষ্ঠা ১৮।

২২৪. আল বুরহান, মাকতাবা আযহারে রক্ষিত ৯১৩ নম্বর পাণ্ডুলিপি।

২২৫. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮।

২২৬. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৮, জামউল জাওয়ামে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৪, তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৭০, নিবরাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ২৯২, শালবী, তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ২৯৪, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪।

২২৭. শাইখ মরহুম তা-হা আদদীনরারীর আল মুনাসিবা বিষয়ে প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ২২।

২২৮. শিফউল গালীল, পৃষ্ঠা ১১০।

২২৯. শওকানী, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬।

২৩০. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫।

২৩১. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

২৩২. ঐ।

২৩৩. ঐ।

২৩৪. ঐ।

২৩৫. রাযী, আল মাহসুল, পৃষ্ঠা ১০৪, দাওয়াবিতুল মাসলিহাহ, পৃষ্ঠা ২৩, ড. ওযাহাবাত আয যুহাইলী, আদদারুরাহ, পৃষ্ঠা ৫৩।

২৩৬. ইবনে আশুর, মাকাসিদুশ শারীয়াহ, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০।

২৩৭. তাকভীমুল আদিল্লাহ, দারুল কুতুবে রক্ষিত ২৫৫ নম্বর পাণ্ডুলিপি, ইসূলুস সারাখসী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৪, উসূলুল বাযদাবী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৩, শাতবী, আল ইতিসাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩২, অথবা, পৃষ্ঠা ১৩৩, আল বুরহান, মাকতাবা আযহারে রক্ষিত ইমামুল হারামাইনের পাণ্ডুলিপি নম্বর ৯১৩। ইমাম শাফেয়ীর আর রিসালাহ, পৃষ্ঠা ৫১২ ও ৪৫৪ এবং শাত্বীর আল ই'তিসাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৬।

২৩৮. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০০ কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২ ও খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫।

২৩৯. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০০।

www.pathagar.com

২৪০. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৬।

২৪১. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৩, কারাফী, আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩, শাইখ মুহাম্মদ মুস্তফা আল মারাগী, বুহুসুন ফিত তাশরীয়িল ইসলামি পৃষ্ঠা ৩১, ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৪।

২৪২. আল উরফ ওয়াল আদাতু ফী রাইল ফুকাহা পৃষ্ঠা ৮৩।

২৪৩. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৪, আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৩।

২৪৪. আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪, সুয়ুতী, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪, মুস্তফা আযারকা, আলমাদখালু ফিল ফিক্‌হিল ইসলামি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৮৯।

২৪৫. আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫।

২৪৬. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৪, আল ফুরুক, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৩, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫।

২৪৭. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৪। আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫ এবং খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৩।

২৪৮. মুসলিম' কিতাবুল আদাহীতে এটি উদ্ধৃত করেছেন বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে।

২৪৯. ইবনে কাইয়িম, আত তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৬, আল ফিকরুস সামী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৪১, শালাবী, তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ৩০৭।

২৫০. কারাফী, আলফুরুক, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৩, মুহাম্মদ শালবী, তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ৩০৯।

২৫১. ইবনে কাইয়িম, আততুরুকুল হুকুমীয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৯-২২।

২৫২. ঐ।

২৫৩. মুহাম্মদ মুস্তফা শালাবী, তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ৬১০।

২৫৪. আল-ফুরুক, খণ্ড ৪, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

২৫৫. আয যারকানী আলাল মুযাত্তা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫।

২৫৬. তা'লীলুল আহকাম, পৃষ্ঠা ৩১১।

২৫৭. ইবনে কাইয়িম, আল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৬৭।

২৫৮. আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩।

২৫৯. আল ফুরুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮, ৪৪-৪৫ এবং ১১৭।

২৬০. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৫। আল উরফু ওয়াল আদাতু ফী রাইল ফুকাহা, পৃষ্ঠা ৮৯।

www.pathagar.com

২৬১. কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫।

২৬২. ঐ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯।

২৬৩. ঐ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২, ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবাতু ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৬৪।

২৬৪. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২।

২৬৫. সুরা আন নূর, ৩২ আয়াত।

২৬৬. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১০৪, ১৩৩।

২৬৭. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৮, দাওয়াবিতুল মাসলিহাহ, পৃষ্ঠা ২৪৯, কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৮, সুয়ুতী, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃষ্ঠা ৮৭, আত্ তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩১০, মিফতাহুস সাআদাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪, মিফতাহুস সাআদাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪, ইবনে তাইমিয়া, আল সিবাতু ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৬৪, দারুল কুতুব আল আরাবীয়া।

২৬৮. নবি সা. থেকে রেওয়াদেত করা হয়েছে। لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار فى الإسلام তথা ক্ষতি হচ্ছে লাভের বিপরীত। আর الضرر হচ্ছে ক্রিয়ার এক বচন এবং والضرار হচ্ছে ক্রিয়ার দ্বিবচন। আর مانضر به হচ্ছে ক্রিয়ার উদ্দেশ্য এবং ماحبك হচ্ছে তার বিধেয়। বলা হয়ে থাকে। تنفع به انت অর্থাৎ, مانضر به যার সাহায্যে তোমার সাথির ক্ষতি হয় এবং তুমি লাভবান হত। আর والضرر হচ্ছে, যা তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত কর এবং অন্যের লাভ হয়। আর বলা হয়ে থাকে, উভয়েই আসলে জোর দেবার অর্থে ব্যহৃত হয়। এজন্য দেখুন আন নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদিস লিইবনে আচীর, এ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১-৮২।

২৬৯. জামউল জাওয়ামে আত্তারের হাশিয়া সহকারে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩০।

২৭০. সুরা আল ইনসান, ৮ আয়াত।

২৭১. সুরা আল হাশর, ৯ আয়াত।

২৭২. সুরা আল আনআম, ১০৮ আয়াত।

২৭৩. আলউসউল ফিকহিল ইসলামি।

২৭৪. কারাফী, আল ফুরুক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২, কাওয়ায়েদুল আহকীম লিইবনে আবদুস সালাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩।

২৭৫. কারাফী, আল ফুরুক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২, ইয্ ইবনে আবদুস সালাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪।

২৭৬. আল ফুরুক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২, কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪।

২৭৭. সুরা আশ্শূরা : ৫২ আয়াত।

www.pathagar.com

২৭৮. সুরা আল কলম : ৪ আয়াত।

২৭৯. সুরা হুজুরাত : ১৬ আয়াত।

২৮০. লিসানুল আরব। খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৭, আল নিহায়াহ। লিইবনে আসীর ফী সারিবিল হাদিস : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬১। (আল কামূসুল মুহীত : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৪, আল-মিসবাহুল মুনী : পৃষ্ঠা ৩৭৩, আলমুফরাছাতফী সারীবিল কুরআন ২৫৯ পৃষ্ঠা।

২৮১. সুরা আলমায়েদাহ : ৪৮ আয়াত।

২৮২. সুরা আলজাছিয়া : ১৮ আয়াত।

২৮৩. তাফসীর আত্তাবারী : খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ৮৮, হাশিয়াতুল জামাল : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৬, আল কুরতুবী : খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১৬৩। ফখরুর রাযী : খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৩২, আল আলস্ : পৃষ্ঠা ৬, পৃষ্ঠা ২৩৫।

২৮৪. আল নিহায়া, ইবনুল আছীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬১।

২৮৫. তারীখুত তাশরীইল ইসলামি, শায়খ আবদুর রহমান তাজ ও শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্ সাইস, পৃষ্ঠা ৮-৯। তাফসীর আল মানার, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪১৪। তারিখ আত্তাশরী আলইসলামি, উস্তায আশাহাবী, পৃষ্ঠা ৬।

২৮৬. সুরা আশ্শূরা, ১৩ আয়াত।

২৮৭. তাফসীর আবিস সাউদ হামিশ আলফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৮।

২৮৮. আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃষ্ঠা ২৫৯।

২৮৯. সুরা আহযাব, ৩৩ আয়াত।

২৯০. তারিখ আত্তাশরী আল ইসলামি, শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, পৃষ্ঠা ১৭৯। তারীখ আত্তাশরী আল ইসলামি, শায়খ আবদুর রহমান তাজ ও শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্সাইস, পৃষ্ঠা ৮-৯। তারিখ আত্তাশরী, আলউস্তায আশশিহাবী, পৃষ্ঠা ৬।

২৯১. আশ্ শূরা, ১৩ আয়াত।

২৯২. সুরা আল আনআম, ৯০ আয়াত।

২৯৩. সুরা আল মায়েদাহ, ৪৮ আয়াত।

২৯৪. সুরা আল জাসিয়া, ১৮ আয়াত।

২৯৫. আল কুরতুবী, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১০-১১।

২৯৬. আল কুরতুবী, ১৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১ এবং হাশিয়াতুল জামাল আলাল জালালাইন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৫।

২৯৭. কুরতুবী, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১১ এবং হাশিয়াতুল জামাল, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৫।

২৯৮. তাফসীর আল ফখরুর রাযী, ৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৮।

www.pathagar.com

২৯৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫।

৩০০. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব শীদ আযযারয়ী আদ্ দামে কী, পরিচিতি লাভ করেছেন ইবনে কাইয়িম জওযী বা ইবনে কাইয়েন নামে। দামেশ্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৭৫১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। বিভিন্ন বিষযে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৩০১. মিফতাহ্ দারুস সাআদাহ, ইবনে কাইয়িম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২।

৩০২. জামউল জাওয়ামে গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যা ও ফুটনোট, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৫। তানকীহুল ফুসুল, কারাফী, পৃষ্ঠা ৩১। আল মারআতুফিল উসূল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮৮। আল আস্‌নবী আলা মানহাজিল বাইদাবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২।

৩০৩. তানকীহুল ফুসুল, কারাফী, ৩৩ পৃষ্ঠা এবং উসুল, মুহাম্মদ আল খিদরী, ৫৯ পৃষ্ঠা।

৩০৪. তাঁর মূল নাম হচ্ছে, শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবুল আলা আইরিস ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আস্‌সান্‌হাজী আল বাহনাসী আলমিসরী আলকারাফী, মৃত্যু ৬৮৪ হিজরি। তিনি ছিলেন মালেকী মযহাবের অনুসারী। শায়খ ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম ছিলেন তার শিক্ষক। কারাফীর আল আহকাম ফী তামীযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম ওয়া তাসার্‌রুফাতুল কাযী ওয়াল ইমাম গ্রন্থের মাহমুদ আরসের লিখিত ভূমিকা দেখুন।

৩০৫. তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ৩৩।

৩০৬. উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৫৯।

৩০৭. উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪।

৩০৮. আল আহকাম, আল আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬, রওদাতুন নাজের, পৃষ্ঠা ৩০। মুসতাস্‌ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩। ইবনুল হাজেব আলাল আছাদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭।

৩০৯. আল আহকাম, আল আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬, রাওদাতুন নাযের, পৃষ্ঠা ৩০ এবং আল মুস্‌তাস্‌ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩।

৩১০. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ৩৫৮।

৩১১. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ৩৫৯, মুস্‌তাসফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩ এবং রওদাতুন নাযের, পৃষ্ঠা ৩০।

৩১২. তানকীহুল ফুসুল, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০।

৩১৩. দেখুন আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৭। আল মুস্‌তাশ্‌ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৫, জাম্‌উল জাওয়ামে, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৭, তানকীহুল, ফুসুল, পৃষ্ঠা ৩৬ উসুল মুহাম্মাদ আল খিদরী, পৃষ্ঠা ৮০।

৩১৪. রাজেউল মুস্‌তাস্‌ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৫। আল আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৭। তানকীহুল ফুসল পৃষ্ঠা ৩৬। জামউল জাওয়ামে, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৭। আল আসনবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২।

www.pathagar.com

৩১৫. আল আযীমাত শারহুল আছাদ আলা ইবনিল হাজেব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮। মুসতাস্ফা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৮। আল মাআদী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৮।

৩১৬. আল মুস্তাস্ফা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৮।

৩১৭. উসূল মুহাম্মদ আল খিদরী, পৃষ্ঠা ৭১-৭২।

৩১৮. আল মুসতাশ্ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৯। আল আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৯। রওদাতুন নাযের, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩। তানকীহুল ফুসুল, পৃষ্ঠা ৪১। শারহুল আছাদ আলী ইবনিল হাজেব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮।

৩১৯. সুরা আল বাকারা, ১৩২ আয়াত।

৩২০. শাতবী তাঁর আল মাওয়াফিকাত গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬।

৩২১. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

৩২২. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৭।

৩২৩. শাত্বী তাঁর মাওয়াফিকাত গ্রন্থে এবং বুখারি ও তিরমিযীর হাদিসে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিবেশির সঙ্গে) হাদীরা পাঠাও। কারণ হাদীরা মনের ময়লা দূর কের/কোনো প্রতিবেশি যেন তার প্রতিবেশিকে তাচ্ছিল্য না করে। ছাগলের পায়ের একটা হাড্ডি হলেও তার কাছে পাঠাও।

৩২৪. ঐ।

৩২৫. সূরা আন নাহল, ৭ আয়াত।

৩২৬. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৫।

৩২৭. বুখারি, রিকাক অধ্যায়।

৩২৮. আল বাকারা : ২৮৬ আয়াত।

৩২৯. আল বাকারা : ১৮৫ আয়াত।

৩৩০. আল হাজ্জ : ৭৮ আয়াত।

৩৩১. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭ ।

৩৩২. ঐ।

৩৩৩. ঐ।

৩৩৪. আল জাছিয়া, ২৩ আয়াত।

৩৩৫. আন নজম, ২৩ আয়াত।

৩৩৬. মুহাম্মাদ, ১৪ আয়াত।

৩৩৭. আল মাওয়াফিকাতা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬-১০৯ এবং আল সারআতহাশিয়াতিল আযমিরী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৪।

৩৩৮. আল আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১, জাম্উল জাওয়ামে শারবিনীর হাশিয়াসহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩ এবং উসুলুদল খিদ্বরী, পৃষ্ঠা ২১।

www.pathagar.com

৩৩৯. উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ২১-৪২।

৩৪০. আল মুগানী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১ এবং শারহে উসূলিল খাম্সা, পৃষ্ঠা ৭১।

৩৪১. আল সুনতাহা, ইবনে হাজেব, পৃষ্ঠা ২১।

৩৪২. জামউল জাওয়ামে শারবিমীর হাশিয়াসহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৯, উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ২৩ এবং আলমারআতু আযমিরীর হাশিয়াসহ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮২।

৩৪৩. উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৯১-৯২।

৩৪৪. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৪ এবং উসূলূল খিদরী, পৃষ্ঠা ৮২।

৩৪৫. সুরা আসসাবা, ২৮ আয়াত।

৩৪৬. সুরা আল আরাফ, ১৫৮ আয়াত।

৩৪৭. বুখারি, মুসলিম ও নাসায়ী তিরমিযী।

৩৪৮. সুরা আল মায়েদা, ৬৭ আয়াত।

৩৪৯. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৬ এবং ইলামুল মুওয়াককিয়ীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৫।

৩৫০. তার পুরা নাম হচ্ছে : আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আল জাওয়াইমী আবুল মাআলী। তিনি শাফেয়ী মযহাবের পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠতম ইমাম। নিশাপুরের উপকণ্ঠে জাওরায়ীনে তাঁর জন্ম হয়। সেখান থেকে তিনি বাগদাদে চলে আসেন এবং তারপর সেখান থেকে মক্কায় এবং তারপর মদিনায়। তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ফাতোয়া দেবার দায়িত্বও পালন করেন। তারপর নিশাপুরে ফিরে আসেন। প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুল্ক তাঁর জন্য তৈরি করেন মাদ্রাসা নিযামিয়া। ৪৭৮ হিজরিতে নিশাপুরের তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্রষ্টব্য ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৭।

৩৫১. দ্রষ্টব্য জামে আযহার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত দলিল পত্রাদি, ৯১৩ নম্বর দলিল।

৩৫২. সুরা আল আহযাব, ৩৭ আয়াত।

৩৫৩. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭।

৩৫৪. ঐ পৃষ্ঠা ২৪৭।

৩৫৫. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৮।

৩৫৬. ইগাছাতুল লাহফাম নাকল্লান আন তালীলিল আহকাম, মুহাম্মদ শালবী, পৃষ্ঠা ৩১৯-৩২০।

৩৫৭. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৫।

৩৫৮. সুরা আল কাসাস, ৭৭ আয়াত।

৩৫৯. তাফসীর আলকুরতুবী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ২১৪।

৩৬০. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৪-৩৬৭।

৩৬১. নাসের, ইনসাইক্লোপিডিয়া, ইসলামি ফিক্হ সংক্রান্ত।

৩৬২. বেশি বুদ্ধিদীপ্ত অথবা বেশি সুস্পষ্ট।

www.pathagar.com

৩৬৩. উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একদল বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেছেন, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৮৮।

৩৬৪. সুরা আল হিজর, ৯ আয়াত।

৩৬৫. সুরা হুদ, ১ আয়াত।

৩৬৬. সুরা ফুসসিলাত, ৪২ আয়াত।

৩৬৭. সুরা আলহাজ্জ, ৫২ আয়াত।

৩৬৮. সুরা আল মায়েদা, ৩ আয়াত।

৩৬৯. সুরা আল মায়েদা, ৪৪ আয়াত।

৩৭০. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯, কুরতুবী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৬০৫ এবং হাশিয়াতুল জামাল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬০৬।

৩৭১. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৯; মুস্তফা সাব্বাযী লিখিত আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী, পৃষ্ঠা ৮৯।

৩৭২. ইবনে খালদুন, আলল মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ৩৭৯-৩৮০।

৩৭৩. কারাফী, তানকীহুল ফুসুল আলালউসূল, পৃষ্ঠা ১৯৮।

৩৭৪. আল মার্আতু ওয়া শারহুহা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩।

৩৭৫. তিনি হচ্ছেন : আলী ইবনে মুহাম্মদ আবুল হাসান ফখরুল ইসলাম আল বাযদাবী। ফিক্হ, উসূল ও তাফসীর শাস্ত্রে হানাফীয়াদের প্রধান বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। সমর কন্দের বাসিন্দা। বয্দ একটি দুর্গের নাম এবং এর সাথেই তিনি সম্পর্কিত। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে কানযুল উসূল ইলা মারিফাতিল উসূল গ্রন্থটি উসূলুল বাযদাবী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জুরজানের নিকটবর্তী কাশ শহরে ৪৮২ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্রষ্টব্য আল ইলাম, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৪৮ ও আল জাওয়াহিরুল মাগশিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭২।

৩৭৬. আলমিরাআতু-এর উপর লিখিত আযমিরীর ফুটনোট দেখুন।

৩৭৭. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬।

৩৭৮. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬।

৩৭৯. আল মিরআহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮২ এবং আলমাওয়াফিকাত খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬।

৩৮০. আল মিসবাহুল মুনীর, পৃষ্ঠা ৩০৬।

৩৮১. সুরা আন নাহল, ৪৪ আয়াত।

৩৮২. সুরা আলবাকারা, ২৭৫ আয়াত।

৩৮৩. সুরা আল বাকারা, ১৮৮ আয়াত।

৩৮৪. ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজা এটি বর্ণনা করেছেন, এছাড়া আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৯০।

www.pathagar.com

৩৮৫. ঐ। খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯ ও ১৪ দেখুন।

৩৮৬. নাফহুত তীব এ লেখক আহমদ আল মুকরীর কিতাব ইদাআতুদ দাজিনাহ থেকে।

৩৮৭. জামউল জাওয়ামে এবং তার ব্যাখ্যাসমূহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯০, আল মিখতুফিল উসূল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৬।

৩৮৮. আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আয যারাক্শী, মৃত্যু ৭৯৪ হিজরি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৭।

৩৮৯. পূর্বোক্ত আল বুরহান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৭, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪৪, শায়খ মুহাম্মদ আস-সাইস লিখিত তারিখ আত্ তাশ্রী, পৃষ্ঠা ১৬ এবং শায়খ মুহাম্মদ আবু যোহরা লিখিত কিতাবুল মিলকিয়া ওয়া নায্‌রীয়াতুল আকদ, পৃষ্ঠা ৩-৪।

৩৯০. মুসলিম বর্ণিত।

৩৯১. নিহায়াতুস সাউল ফী শারহি মিনহাজিল উসূল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬১৯ এবং ইরশাদুল ফুহুল, পৃষ্ঠা ৩১।

৩৯২. বুখারি ও মুসলিম থেকে বর্ণিত।

৩৯৩. আদ্‌দার কুতনী হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৯৪. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮। হাদিসটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী ও এটি রেওয়ায়েত করেছেন।

৩৯৫. মুস্তফা সাবায়ী, আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকামাতুহা ফীত্ তাশরী' পৃষ্ঠা ৫৩।

৩৯৬. সূরা আন-নজম, ৩-৪ আয়াত।

৩৯৭. সূরা আল হাশ্‌র, ৭ আয়াত।

৩৯৮. সূরা আল আহযাব, ২১ আয়াত।

৩৯৯. ইবনুল হুমাম, তাইসীরুর তাহরীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২, আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৮, মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা ৩৮০, সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত্ তাশ্‌রী, পৃষ্ঠা ৫৫ এবং আল ফিকরুস্ সামী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯।

৪০০. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুয়াকিয়ীম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮।

৪০১. জামে বায়ানুল ইলম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮০।

৪০২. আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯ এবং আল ফিকরুস সামী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯০।

৪০৩. মাকানাতুস সুন্নাহ : আল মাওয়াফিকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯ ও আল ফিকরুস সামী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯। মুস্তফা সাব্বায়ী লিখিত আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্‌তাশরী, পৃষ্ঠা ৩৪৩ এবং আবদুল ওহ্‌হাব মল্লাফ লিখিত উসুলুল ফিক্‌হ, পৃষ্ঠা ২২-২৩।

৪০৪. সূরা আন নাহল, ৪৪ আয়াত।

www.pathagar.com

৪০৫. কারাফী, তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৩৬, তাইসীরুত তাহরীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬১, আল ফিকরুস সামী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯।

৪০৬. ভূমিকা অধ্যায়ে প্রথম আলোচ্য বিষয় দেখুন।

৪০৭. কারাফী, তানকীহুল ফুসুল, পৃষ্ঠা ১৪০, মুস্‌তাসফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৩, ইবনুল হাজেব লিখিত আল মুন্‌তাহা, পৃষ্ঠা ৩৭, আমাদী লিখিত আল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০১।

৪০৮. মাকতাবা আযহার সংকলিত আল বুরহান, ৯১৩ নম্বর পাণ্ডুলিপি।

৪০৯. তানকীহুল ফুসুল, পৃষ্ঠা ১৪১।

৪১০. তানকীহুল ফুসুল।

৪১১. মাকতাবা আল আযহার প্রণীত আল বুরহান, ৯১৩ নম্বর পাণ্ডুলিপি।

৪১২. ঐ।

৪১৩. ইমাম আহমদ ইবনে হামবল আবু আবদুল্লাহ আশ্ শাইবানী। হাম্‌বলী মযহাবের ইমাম। অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সরকারি। ১৬৪ হিজরিতে বাসদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরিতে সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

৪১৪. উসূলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪।

৪১৫. মাকতাবা আল আযহার প্রণীত আল বুরহান, ৯১৩ নম্বর পাণ্ডুলিপি দেখুন।

৪১৬. সুরা আল ইমরান, ১১০ আয়াত।

৪১৭. সুরা আল বাকারা, ১৪৩ আয়াত।

৪১৮. সুরা আলে ইমরান, ১০৩ আয়াত।

৪১৯. সুরা আন নিসা, ১১৫ আয়াত।

৪২০. আল মুস্‌তাস্‌ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৫, আল হুজ্‌জীয়াতুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩, রওদাতুন নাযের, পৃষ্ঠা ৬৭, আলী ইবনুল হাজেব লিখিত শারহুল আদুদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১, আত্ তালবীহ্ এর ওপর লিখিত আলগুনীর হাশিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৯, তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৪১ এবং তাফসীর ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১৩।

৪২১. ইবনু মাজা ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন।

৪২২. আল মুস্‌তাস্‌ফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৫।

৪২৩. উসুলুল খিদরী, পৃষ্ঠা ৩১৬।

৪২৪. আলী ইবনুল হাজেব, শারহুল আদুদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯ এবং আল আমাদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৪।

৪২৫. তালবীহ এর উপর লিখিত আল ফানরীর হাশীয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৮।

৪২৬. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১১-১২। আল মুস্‌তাস্‌ফা, তারীফুল কিয়াস, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৮। জামউল জাওয়ামে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৮, আল মু'তামিদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৯৭।

www.pathagar.com

আল আহ্কাম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬১। ইবনুল হাজেব, শারাহ মুখতাসার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫০। বাযদাবী, কাশফুল আসরার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬৮। কারাফী, তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৬৫। রওদাতুন নাযের, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৬। শারাহ মুসাল্লামুস সুবুত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৬। নিবরাসুল উকূল, পৃষ্ঠা ৯-৪৬। আল মিরাআতু ফিল উসূল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৫।

৪২৭. কারাফী, তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৬৮। জামউল জাওয়ামে আত্তারের হাশিয়াসহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২ আল মিরআতু ফিল উসূল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮২। শায়খ আবদুল ওহ্হাব খাল্লাফ, মাসাদিরুত তাশ্‌রী' ফীমা লা নাস্‌সা ফীহ, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

৪২৮. ঐ।

৪২৯. ইবনে হাযম ছিলেন আন্দালুসিয়ার ফকীহ। তিনি কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে সাঈদ ইবনে হাযম। ৪৫৬ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। যরকালী লিখিখ আল আ'লাম গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৫৪-৫৯ এবং শায়খ আবু যোহরা লিখিত ইবনে হায়ম গ্রন্থটি দেখুন।

৪৩০. আত্তারের হাশিয়াসহ জামউল জাওয়ামে খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪২ এবং আলমিরআহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮২।

৪৩১. সূরা আলহাশ্‌র, ২য় আয়াত। আলমিরআতু, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৮। তানকীহুল ফুসূল, পৃষ্ঠা ১৬৬। উসূলুস সারাখসী।

৪৩২. সূরা আননিসা, ৫৯ আয়াত। তাফসীর ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪১-২২।

৪৩৩. তানকীহুল ফূসুল, পৃষ্ঠা ১৬৬।

৪৩৪. মিরআতুল উসূল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮২।

৪৩৫. তাফসির আল মামার থেকে স্বতন্ত্রভাবে উসূল আত্ তাশরীইল আম, পৃষ্ঠা ৬৭ দেখুন।

৪৩৬. উসূলুল বাযদবী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬৮।

৪৩৭. আল ইমামুশ শাফেয়ী মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনে উসমান আল হাশেমী আল মুত্তালিবী। ১৫০ হিজরিতে গাযায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্তিকাল করেন কায়রোয় ২০৪ হিজরি সনে। তিনিই প্রথম উসূলুল ফিক্হ রচনা করেন। তাঁর আর রিসালা নামক কিতাবটিকে সবচেয়ে পুরাতন কিতাব বিবেচনা করা হয় বরং ইসলামি ফিকহের উসূল সংক্রান্ত কিতাবাদির মধ্যে এটিকে সর্বপ্রথম কিতাব বলা হয়। তারিখে বাগদাদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬, হুলিয়াতুল আউলিয়া খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৩, তাবকাতুশ শাফেয়ীয়া খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৫, ইবনে আবী হাতেমের আদাবুশ শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু, উস্তায শায়খ আবদুল গনী আবদুল খালেকের গবেষণা এবং রাযীর মানাকিবুশ শাফেয়ী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৪৩৮. আল কামূসুল মুহীত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৫, আল মিসবাহুল মুনীর, পৃষ্ঠা ৩১৫, আল নিহায়া ফী গারীবিল হাদিস, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৮।

৪৩৯. আল নিহায়া ফী গারীবিল হাদিস লি ইবনিল আছমীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৮ এবং তামুল হাদিসে ফীহা ওয়া আমেলা লিমা বাদাল মওত।

www.pathagar.com

৪৪০. নিহায়া ফী গারীবিল হাদিস, খণ্ড ২, ১৪৮, ১৪৯ ও ১৫০ পৃষ্ঠা।

৪৪১. আল মিরআতু ফিল উসূল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১, ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দারায, কিতাব আদ দ্বীন, পৃষ্ঠা ৯।

৪৪২. সুরা আলে ইমরান, ৮৫ আয়াত।

৪৪৩. সুলা আল বাকারাহ, ২৫৬ আয়াত।

৪৪৪. সুরা তওবা, ৭৩ আয়াত।

৪৪৫. তাফসীর, আল কুরতুবী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮০-২৮১।

৪৪৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দারায, কিতাব আদদীন, পৃষ্ঠা ৪৪।

৪৪৭. সুরা আর রাআদ, ১৫ আয়াত।

৪৪৮. সুরা ইউসুফ, ১৭ আয়াত।

৪৪৯. এহ্ইয়াউ উলুমিদদীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩ এবং দায়েরাতুল মায়ারিফ আল ইসলামিয়া শায়খ মুস্তফা আবদুর রায্যাকের আলোচনা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৪।

৪৫০. সুরা আয যরিয়াত, ৩৫-৩৬ আয়াত।

৪৫১. সুরা ইউনুস, ৮৪ আয়াত।

৪৫২. সুরা আল হুজুরাত, ১৪ আয়াত।

৪৫৩. এহ্ইউ উলমিদ দ্বীন, খণ্ড ১, ১০৩ আয়াত, উমদাতুল কারী আলা শারহিল বুখারি, খণ্ড ১, ১২৮ আয়াত।

৪৫৪. ঐ।

৪৫৫. আল এহ্ইয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩, শারহুল নববী আলাল মুসলিম খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৪।

৪৫৬. ইরশাদুস সারী আলা শারহিল বুখারি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫।

৪৫৭. বুখারি ও মুসলিম, আল এহ্ইয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৪, আল কাশশাফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮।

৪৫৮. আল এহ্ইয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৪, আল কাশশাফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮।

৪৫৯. আল কাশশাফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৫।

৪৬০. উমদাতুল কারী আলা শারহিল বুখারি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৯।

৪৬১. সুরা আল ইমরান, ২০ আয়াত।

৪৬২. সুরা আলে ইমরান, ৮৩ আয়াত।

৪৬৩. সুরা আল মায়েদাহ, ৩ আয়াত।

৪৬৪. উস্তায মুহাম্মদ মুবারক আবদুল কাদেরের আলোচনা, মওসূআতু হিনাসের লিল ফিকাইল ইসলামি।

৪৬৫. আল কালামুঈর হাশিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৬, উমাদতুলকারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮, শারহুন নববী আলামা মুসলিম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৪, ইরশাদুস স্বারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৫।

www.pathagar.com

৪৬৬. সুরা আল ইমরান, ১৯ আয়াত।

৪৬৭. সুরা আল ইমরান, ৮৫ আয়াত।

৪৬৮. নাইলুল আওতাব, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৭৮।

৪৬৯. সুরা আন নিসা, ১৩৫ আয়াত।

৪৭০. সুরা তা-হা, ৭২-৭৩ আয়াত।

৪৭১. সুরা আলআহয়াব ২২ - ২৩ আয়াত।

৪৭২. সুরা আল ইমরান, ১৭৩ আয়াত।

৪৭৩. সুরা আল বাকরাহ, ১৫৫ আয়াত।

৪৭৪. আল কুতুবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৩।

৪৭৫. বুখারি ও মুসলিম।

৪৭৬. আল কুরতুবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৩।

৪৭৭. সুরা আলে ইমরান, ১৮৬ আয়াত।

৪৭৮. তাফসীর ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৩।

৪৭৯. সুরা আনকাবুত, ২-৩ আয়াত।

৪৮০. মাসিক রিসালাতুল ইসলাম, উস্তাদ আহমদ আমীনের প্রবন্ধ, প্রথম সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, পৃষ্ঠা ২৮।

৪৮১. পরলোকগত বৃটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি।

৪৮২. কিতাব আততাজারুব, আর্নাল্ড টয়েনবি, সহীফাতুল আইয়াম আসসুদানীয়া থেকে উদ্ধৃত, ৫৬১ ও সংখ্যা, ১৯৬৯ সাল, এর আরবি অনুবাদক হচ্ছেন, আবদুল্লাহ রজব।

৪৮৩. আখবারুল ইয়াউম, আসসাহীফাতুল মিসরিয়্যাহ, ১২৯৫ সংখ্যা ১৯৬৯ সাল।

৪৮৪. সুরা আন নূর, ৩৯ আয়াত।

৪৮৫. সুরা আল ফুরকান, ২৩ আয়াত।

৪৮৬. সুরা ইবরাহীম, ১৮ আয়াত।

৪৮৭. তাফসীর, ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৫।

৪৮৮. ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবাতু ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৮৬ এবং ৪ ও ৫। শায়খ সাইস, সাবাকী ও বারবারী, তারিখ আত তাশ্রী, পৃষ্ঠা ৮ ও ১০।

৪৮৯. মিফতাহুস সাআদাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২।

৪৯০. কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯।

৪৯১. উসূলুস সারাখসী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯০।

৪৯২. মুহাম্মদ মুবারক আবদুল কাদের, আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু।

৪৯৩. সুরা আল হিজর, ১৯-২০ আয়াত।

www.pathagar.com

৪৯৪. সুরা তা-হা, ৫৩-৫৪ আয়াত।

৪৯৫. সুরা আন নাহল, ১৪ আয়াত।

৪৯৬. সুরা আল বাকারাহ, ১৬৪ আয়াত।

৪৯৭. সুরা আল বাকরাহ, ১৬৩ আয়াত।

৪৯৮. সুরা ইয়াসীন ৩৭ ও তার পরবর্তী আয়াত।

৪৯৯. সুরা আন নাহল, ১২ আয়াত।

৫০০. সুরা আন নাহল, ১৫ ও তার পরবর্তী আয়াত।

৫০১. সুরা আল ইনফিতার, ৬ ও তার পরবর্তী আয়াত।

৫০২. সুরা আত্ তারেক, ৫ ও ৬ তার পরবর্তী আয়াত।

৫০৩. সুরা আল কিয়ামাহ, ৩৬ - ৩৭ আয়াত।

৫০৪. সুরা আল মুমিনূন, ১২ আয়াত।

৫০৫. সুরা আল ওয়াকিয়া, ৫৮ - ৫৯ আয়াত।

৫০৬. সুরা আল আনআম, ৭৫ আয়াত।

৫০৭. সুরা আবাসা, ২৪-২৫ আয়াত।

৫০৮. সুরা আবাসা, ৩২ আয়াত।

৫০৯. সুরা আন নাহল, ৫ ও তার পরবর্তী আয়াত।

৫১০. সুরা আস সাজদাহ, ২৭ আয়াত।

৫১১. সুরা আবাসা, ২৪ আয়াত।

৫১২. সুরা আর রুম, ৮ আয়াত।

৫১৩. সুরা আন নাহল, ১১ আয়াত।

৫১৪. সুরা আর রা'আদ, ৪ আয়াত।

৫১৫. সুরা আয যারিয়াত, ২০-২৩ আয়াত।

৫১৬. কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ২১।

৫১৭. আল কুরতুবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৫, তাফসীরুল মানার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭। আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু, পৃষ্ঠা ১৯০।

৫১৮. সুরা তা-হা, ১৩-১৪ আয়াত।

৫১৯. সুরা মারয়াম, ৩৬ আয়াত।

৫২০. সুরা আল ইসরা, ২২ - ২৩ আয়াত।

৫২১. আল কুরতুবী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২৩৮।

৫২২. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৩১ তাফসীর আল মানার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮।

www.pathagar.com

৫২৩. সুরা আশশূরা, ১৩ আয়াত।

৫২৪. আল কুরতুবী, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১১।

৫২৫. আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু, পৃষ্ঠা ১৯৪।

৫২৬. আল কুরতুবী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২০৫, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩২ এবং আল আকীদাতু ওয়াল ইবাদাতু, পৃষ্ঠা ১৯১।

৫২৭. সুরা আত তওবা, ২৪ আয়াত।

৫২৮. সুরা আল আনকাবুত, ৪৫ আয়াত।

৫২৯. নাইলুল আওতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪০।

৫৩০. বুখারি, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ এবং নাইলুল আওতার খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪০।

৫৩১. নাইলুল আওতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৬ এবং বুখারি ও মুসলিম।

৫৩২. বুখারি এবং নাইলুল আওতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৬।

৫৩৩. নাইলুল আওতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৭।

৫৩৪. সুরা আত তওবা, ৫ আয়াত।

৫৩৫. নাসাঈ ও নাইলুল আওতার।

৫৩৬. বুখারি ও মুসলিম এবং নাইলুল আওতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৬।

৫৩৭. নাইলুল আওতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪১।

৫৩৮. বুখারি ও নাসাঈ ছাড়া একদল মুহাদ্দিস তাদের গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

৫৩৯. সিহাহ সিত্তার একজন ছাড়া পাঁচজনই এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং নাইলুল আওতার খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

৫৪০. তাবারানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

৫৪১. বুখারি ও মুসলিম।

৫৪২. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ১০৬।

৫৪৩. সুরা আন নাহল, ১০৬ আয়াত।

৫৪৪. শওকাতনী, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৫।

৫৪৫. উসূলুস সারাখসী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯১।

৫৪৬. কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯।

৫৪৭. শওকানী, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৪।

৫৪৮. উসূলুস সারাখসী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯১।

৫৪৯. সুরা আল বাকারাহ, ১৮৩ আয়াত।

৫৫০. সারাখসী, উসূলুল ফিক্‌হে, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯১।

www.pathagar.com

৫৫১. সুরা আলে ইমরান, ৯৭ আয়াত।

৫৫২. নাইনুল আওতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২২।

৫৫৩. বুখারি ও মুসলিম।

৫৫৪. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ৩৯।

৫৫৫. ঐ।

৫৫৬. মুসলিম, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা ২৪।

৫৫৭. সিহাহ সিত্তার মধ্য থেকে পাঁচটি হাদিসের কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং নাইলুল আওতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৫।

৫৫৮. সুরা আল আরাফ, ১৫৮ আয়াত।

৫৫৯. সুরা সাবা, ২৮ আয়াত।

৫৬০. কিতাবের শুরুতে ভূমিকার আওতায় ইসলামি শরিয়াহর সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন। প্রথম হাদিসিট উল্লেখিত হয়েছে সুয়ূতির জামেউস সগীর কিতাবে এবং দ্বিতীয়টি রেওয়ায়েত করেছেন মুসলিম, দারামী ও আহমদ।

৫৬১. সুরা আলে ইমরান, ১১০ আয়াত।

৫৬২. তাফসীর, ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭, আল মাবসূত সারাখসী, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২।

৫৬৩. মুআত্তার উপর যারকানীর শারাহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২।

৫৬৪. সুরা আন নাহল, ১২৫ আয়াত।

৫৬৫. সুরা আল আ'রাফ, ১৯৯ আয়াত।

৫৬৬. সুরা আল বাকারাহ, ২১৬ আয়াত।

৫৬৭. সুরা আত্তওবা, ৫ আয়াত।

৫৬৮. সুরা আত্তওবা, ১ আয়াত।

৫৬৯. আল মুদাওয়ামাতুল কুবরা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২, আল উম্ম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৫, আলমাবসূত, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩, বিদায়াতুল মুজ্তাহিদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯১ এবং ফতহুল কাদীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭৮।

৫৭০. সুরা আন নিসা, ৯৫ আয়াত।

৫৭১. আল মাবসূত, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩।

৫৭২. ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল কিতাল, পৃষ্ঠা ১১৭।

৫৭৩. ঐ।

৫৭৪. সুরা আল বাকারা, ১৯০ আয়াত।

৫৭৫. সুরা আর বাকারা, ১৯৪ আয়াত।

৫৭৬. সুরা আল বাকারা ১৯৩ আয়াত।

www.pathagar.com

৫৭৭. সুরা আল বাকারা, ১৯১ আয়াত।

৫৭৮. ইবনে তাইমিময়া, রিসালাতুল কিতাল।

৫৭৯. সুরা আন নিসা, ৭৫ আয়াত।

৫৮০. সুরা আল হাজ্জ, ৩৯ আয়াত।

৫৮১. তাফসির আল ফখরুর রাযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬১ ও ২৮৩।

৫৮২. আবু দাউদ হাদিসটি উদ্ধৃত্ত করেছেন এবং বিদায়াতুল মুজতাহিদ-এও এটি বর্ণিত হয়েছে।

৫৮৩. নাইলুল আওতার, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৬০।

৫৮৪. আল মুআত্তা, যুরকানীর শারাহ সহকারে, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০, আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬-৭।

৫৮৫. ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল কিতাল, পৃষ্ঠা ১১৬, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৫।

৫৮৬. আহমদ ও ইবনে মাজাহ।

৫৮৭. বুখারি ও মুসলিম।

৫৮৮. আল উম্ম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫।

৫৮৯. নাইলুল আওতার, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬০।

৫৯০. মুহাদ্দিসদের একটি দল এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং নাইলুল আওতারেও খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২১২৬ বর্ণিত হয়েছে।

৫৯১. নাইলুল আওতার, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২২৭।

৫৯২. আহমদ ও নাসাঈ এবং নাইলুল আওতার খণ্ড ৭, ২২৭ পৃষ্ঠা।

৫৯৩. নাইলুল আওতার, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২২৭।

৫৯৪. মুল কিতাবের পৃষ্ঠা ৬৯।

৫৯৫. সুরা আল মায়েদা, ৫৮ আয়াত।

৫৯৬. সুরা আল বাকারা, ২১৭ আয়াত।

৫৯৭. সুরা আল কাহাফ, ৬৪ আয়াত।

৫৯৮. সুরা আল মায়েদাহ, ২১ আয়াত।

৫৯৯. নাইলূল আওতার, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০১।

৬০০. আশশারহুল কবীর, দারদীরী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০১ এবং দাআয়েমুল ইসলাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৭।

৬০১. ফাতহুল কাদীর ও হেদায়া, ২৮৬ পৃষ্ঠা এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫২।

www.pathagar.com

৬০২. ফাতহুল কাদীর ও হেদায়া, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৮৬, কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৭৯।

৬০৩. দাআয়েমুল ইসলাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৮।

৬০৪. ঐ।

৬০৫. মুসলিম ছাড়া সিহাসিতত্তার বাকি পাঁচজন ও নাইলুল আওতার বর্ণনা করেছেন, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০১।

৬০৬. নাইলুল আওতার এবং হাফেয বলেন এর সনদ হাসান, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০৪।

৬০৭. ইমাম শাফেয়ী রেওয়ায়েত করেছেন এবং নাইলুল আওতারেও উদ্ধৃত হয়েছে। খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২০২।

৬০৮. সুরা আলে ইমরান, ৭২ আয়াত।

৬০৯. আল উম্ম, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬, দারদীরী, আশশারহুল কবীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০৬, আল ইশরাফ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৩, আল মুহায্যাব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৯, আল ওজীয, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৬, হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৮, আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১৭৯।

৬১০. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১৪০।

৬১১. বুখারি ও মুসলিম উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন যখন তাঁকে নবি সা. একদল লোকের কাছে পাঠিয়েছিলেন, ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজেও ১৭৫ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত হয়েছে।

৬১২. শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১৪১।

৬১৩. দাআয়েমূল ইসলাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮০।

৬১৪. আল মিসবাহুল মুনীর, পৃষ্ঠা ১৩ এবং আল কামূসুল মুহীত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৩।

৬১৫. আল ই'তিসাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০।

৬১৬. ঐ পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

৬১৭. ঐ পৃষ্ঠা ৩১।

৬১৮. ঐ। পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

৬১৯. কাওয়ায়েদুল আহকাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৪।

৬২০. আল ই'তিসাম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১।

৬২১. ঐ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৬-২২২ এবং শিফাউল গালীল, পৃষ্ঠা ১৪২।

৬২২. ঐ।

৬২৩. আল কুরতুবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪।

৬২৪. সুরা আল বাকারা, ১০২ আয়াত, আল কুরতুবী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭, ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬।

৬২৫. তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা (পার্ট - ৪)

ছ. নারী বিষয়ক

বি. আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ৫০/-

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড ২৫০/-

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ২য় খণ্ড (সাদা ২৫০) অফসেট ⇨ ৩০০/-

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৩য় খণ্ড ২০০/-

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৪র্থ খণ্ড (সাদা ২৫০) অফসেট ⇨ ৩০০/-

জামাল আল বাদাবী *পিএইচডি*

ইসলামে পোশাকের বিধান ২০/-

জ. আইন ও আইনশাস্ত্র

জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি

সুন্নাহ্‌র আইনগত মর্যাদা ১০০/-

ঝ. ধর্মতত্ত্ব

জামাল আল বাদাবী *পিএইচডি*

ইসলামি শিক্ষা সিরিজ (একত্রে ৩ খণ্ড) ৩০০/-

ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী *পিএইচডি*

উসূলুল ফিক্‌হ ১২০/-

কুরআন ও সুন্নাহ : স্থান-কাল-প্রেক্ষিত ৫০/-

ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি ১২০/-

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী *পিএইচডি*

আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য ২০০/-

প্রফেসর রশীদ আহমদ জালন্ধরী *পিএইচডি*

তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক ১০০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

জ্ঞানের ইসলামায়ন ৩০/-

ইসলামের দন্ডবিধি ২০/-

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী *পিএইচডি*

ইসলামে দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট ২০০/-

জ্ঞান ইসলামীকরণ : স্বরূপ ও প্রয়োগ, প্রফেসর ৩০/-

প্রফেসর ইয়াসার কানদেমীর *পিএইচডি*

শিশুতোষ ৪০ হাদিস ১২০/-

প্রফেসর বেলাল হোসেন *পিএইচডি*

তাইসীরুত তাফসীর (সুরাহ্ আল-হুজরাত) ২৫০/-

www.pathagar.com

জেফরি লাং

আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব ২৪০/-

ড. জামাল বাদি এবং ড. মুস্তাফা তাজদিন

সৃজনশীল চিন্তা : ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত ২৩০/-

ইব্রাহিম আহমদ উমর ***পিএইচডি***

জ্ঞান ও ইমান ৮০/-

Professor Md. Athar Ali ***PhD***

Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid ২৫০/-

M. Zohurul Islam *FCA* Edited

Interfaith Relation : National & Regional Perspective ১০০/-

Editorial Board

Selections From Akram Khan's Tafsirul Qur'an ১৭৫/-

Prof. Muin-ud-Din Ahmad Khan

Islamic Revivalism ২৫০/-

Edited by : Abdun Noor & Mamtaj Uddin Ahmed

Classification and Integration of Knowledge in Islamic Epistemology ৩০০/-

Professor Israr Ahmad Khan ***PhD***

Qur'anic and Hadith : Studies Critical Reflection on Some Issues ২৩০/-

U.A.B Razia Akter Banu ***PhD***

Islam in Bangladesh ৩০০/-

ঞ. Journals (Half yearly)

Bangladesh Journal of Islamic Thought (BJIT)

$ 20.00 Individual $ 30.00 Institution, Tk. ১৫০/-

International Journal of Islamic Thought (IJITs) ২০০/-

$ 35 Individual $ 50 Institution

Textbooks

☐ **Business Studies Series**

Financial Accounting : Conventional and Islamic Approach 400/-
By Prof. Dr. Md. Jahirul Hoque, Prof. Dr. Begum Ismat Ara Huq & Afzal Ahmad

Principles of Accounting : Conventional and Islamic Approach 300/-
By Md. Zohurul Islam, *FCA*

Fundamental of Finance : Conventional and Islamic Approach 300/-
By Prof. Dr. H. M. Mosarof Hossain, Kazi Md. Tarique, & Md. Mahfujur Rahman

Financial Markets and Institutions : Conventional and Islamic ... 350/-
By Prof. Dr. H. M. Mosarof Hossain & Humaira Parveen Runi

www.pathagar.com

Principles of Marketing : Conventional and Islamic Approach 350/-
By Prof. Dr. Syed Rashidul Hasan, Md. Shariful Haque, Md. Mahabub Alom & Mohsina Fatema

Total Quality Management : Conventional and Islamic Approach 300/-
By Afroza Bulbul, Farhana Ferdousi & Prof. Dr. Md. Ataur Rahman

☐ Human Science Series

Reading Shakespeare from Islamic Perspective 150/-
By Prof. Dr. Sadruddin Ahmed, Ali Azgor Talukder, Mohammad Kaosar Ahmed, K. Ahmed Alam & Muhammad Tofazzel Hossain

History of Islam : Prophet Muhammad (SAAS) and Khulafae ... 250/-
By Muhammad Omor Faruq & Dr. Mahfuzur Rahman Akhanda

Development of Muslim Art and Architecture in Bangladesh 350/-
By Muhammad Ashraful Islam & Prof. Dr. M. Nurul Islam Manjur

Family Institution Social Welfare and Welfare Society 200/-
By Dr. Md. Yousuf Ali, Dr. Meer Monjur Mahmood & Md. Ayub Hossain

Communicative Arabic 200/-
By Prof. Dr. Mahfuzur Rahman, Dr. Obayedul Islam, Dr. Anwarul Kabir & Md. Kamrul Hasan

☐ Social Science Series

Fundamentals of Public Administration 250/-
By Prof. Dr. Begum Rokshana Mili & Dr. Amir Mohammad Nasrullah

Bengal from Partition to Partition, 1905 – 1947 250/-
By Prof. Dr. K M Mohsin

☐ Education Series

Introduction to Value Education 200/-
By Rowshan Zannat, Mohammad Alamgheer & Prof. Dr. Md. Abdul Awal Khan

Research Methodology 250/-
By Dr. Md. Amran Hossain, Rowshan Zannat & M Abdul Aziz

☐ Law Series

Introduction to Legal Theories 700/-
By Prof. Dr. Md. Maimul Ahsan Khan

Application of Ethics in Morals, Manners and Laws 250/-
By Prof. Dr. ABM. Mahbubul Islam & Md. Shahadat Hossain

www.pathagar.com

প্রকাশের অপেক্ষায়

সম্পাদনা : মোহাম্মদ মুকিম
গবেষণা পদ্ধতি : ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত

ড. এম. উমর ছাপড়া
মুসলিম সভ্যতা : অবক্ষয়ের কারণ ও সংস্কারের আবশ্যকতা

হিসাম আল তালিব, আব্দুল হামিদ আবুসুলায়মান এবং ওমর আল তালিব
পিতামাতা-সন্তান সম্পর্ক

আহমদ আল-রাইসুনি
ইমাম শাতিবীর মাকাসীদ আল-শরীয়াহ তত্ত্ব (ইসলামি আইনের উচ্চতর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় তত্ত্ব)

ইউসুফ আল কারাযাবী
সুন্নাহর সান্নিধ্যে

আকবার এস. আহমেদ
ইসলামি নৃবিজ্ঞানের পথে সংজ্ঞা, মতবাদ ও নির্দেশনা

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী *পিএইচডি*
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

মুহাম্মদ রুহুল আমিন
ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স

প্রফেসর ত্বাহা জাবির আলওয়ানী *পিএইচডি* **এবং জামাল আল বাদাবী** *পিএইচডি*
জ্ঞানের ইসলামিকরণ

প্রফেসর ত্বাহা জাবির আলাওয়ানী *পিএইচডি*
সমকালীন ইসলামি চিন্তা-দর্শনের বিবেচ্য বিষয়

ইউসুফ আল-কারদাভী *পিএইচডি*
ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতিপয় ধারা

মুহাম্মদ আল-উকাইলী
প্রাধান্য দর্শন নীতিমালা পর্যালোচনা

শাইখ মুহাম্মদ আল-ফাদিল বিন আশুর
ইসলামি সভ্যতার প্রাণ

মহীউদ্দীন আতিয়্যাহ
অর্থনীতি বিষয়ক আয়াতকোষ : (২য় অংশ ঝা (ژ) থেকে ইয়া (ي) পর্যনন্ত)

মুহাম্মদ আবু ইউসুফ *পিএইচডি*
ফাতওয়ার অপব্যবহারের নেপথ্যে

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার
বিচারিক মন ও মনন

www.pathagar.com

গ্রন্থ পরিচিতি

ইসলামি শরিয়াহ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটির মধ্যে এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যা ইতোপূর্বে ফকীহ ও উসূলবিদগণের আলোচনায় আসেনি। অথচ বর্তমান অবস্থায় এগুলোর প্রয়োজন অনেক বেশি। যেমন - শরিয়াহ ইলম লিপিবদ্ধ ও বিন্যস্ত করার সময় কিছু ইলমকে প্রযুক্তিগত এবং কিছুকে বুদ্ধিগত পর্যায়ে বিভক্ত করা। জাতিকে তার মূল ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে, আলেম সমাজকে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর চিন্তা-বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করতে, শরিয়াহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে, ইসলামি শরিয়াহর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে, সৃষ্টির কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ রোধে অন্যান্য বিধানের তুলনায় ইসলামি বিধানের অধিকতর কার্যকর হওয়া এবং আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করেননি এবং মানুষকে একাকী ছেড়ে দেননি-এ শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে শরিয়াহর প্রত্যেকটি হুকুমের মধ্যে নিহিত কার্যকারণ, প্রজ্ঞা ও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক পরিচিতি

ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম (১৯৩৭-১৯৮৮) মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদের একজন স্নাতক। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে ইসলামি আইনশাস্ত্রের উপরে পিএইচ-ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. আলিম সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ওমডুরমান ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক শিক্ষা অনুষদের ডীনও ছিলেন। পশ্চিম সুদানে ইসলামিক শিক্ষা ও দাওয়ার প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান উল্লেখ করার মতো। তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহের মধ্যে The Wisdom of Islamic Legislation in the Prohibition of Usury and the General Objectives of Islamic Law উল্লেখযোগ্য। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ-ডি সম্পন্ন করে সুদানে ফেরার পরে তাঁর এ রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ISBN : 978-984-8471-34-0

www.pathagar.com